
মুহম্মদ আবদুল হাই
বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন

বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন

মুহম্মদ আবদুল হাই

স্টুডেন্ট ওয়েজ
বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশনার ছয় দশকে
স্টুডেন্ট ওয়েজ
....


প্রকাশক
মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ
স্টুডেন্ট ওয়েজ
৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
দূরাভাষ : ৭১২ ১৫ ৬৮
ই-মেইল: studentways@hotmail.com
ওয়েব : www.studentways.info

এস.ওয়েজ দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরি

প্রচ্ছদ
কাইয়ূম চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
হৃদয় কম্পিউটার
নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা

মুদ্রণে
সালমানী প্রিন্টার্স
নয়াবাজার, ঢাকা ১১০০

পরিবেশক
তন্ময় প্রকাশনী

মূল্য : একশত পঁচিশ টাকা

ISBN 984 406 410 4

....

BELATE SARE SATSHO DIN : A Travelogue By Muhammad Abdul Hai Published by Mohammad Liaquatullah of Student Ways. 9 Bangla Bazar, Dhaka 1100. Secend Edition : April Two Thousand Eight. Price Taka One hundred Twenty Five.

ভূমিকা

'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন' গত শতকের মাঝামাঝিতে রচিত। মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত এ বইটি অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫০ সালের দিকে বহির্বিশ্বের ছবি বা কাহিনী বাংলাভাষায় খুব কমই বই হিসেবে মানুষের হাতে এসেছে। মিলেনিয়াম যুগের সাথে সে যুগের আকাশ পাতাল পার্থক্য। আজ অর্থ থাকলেই পুরো বিশ্ব ঘুরে দেখা যায়। ঘরে বসেও বিশ্বকে জানা যাচ্ছে। সে সময় এত সহজভাবে তা সম্ভব ছিল না। বিলেত, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি বহির্বিশ্বে যেতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে মানুষকে। উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য অনেক চেষ্টা করে বিদেশে যেতে হতো। আমার পিতা মুহম্মদ আবদুল হাই উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য লন্ডন গিয়েছিলেন এবং তাঁর অধ্যবসায় ও মেধার জোরে ডিষ্টিংশনসহ উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে তৎকালীন বাংলাভাষায় ধ্বনিবিজ্ঞানকে রাজ-আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ ভাবে জ্ঞান মার্গের এক নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের দ্বার স্বচেষ্টায় উন্মোচন করেছিলেন তিনি।

ধ্বনিবিদ মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর দীর্ঘ প্রবাস জীবনকে যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করেছিলেন, তেমনি তৎকালীন বৃটিশ সভ্যতাকেও উপলব্ধি করেছিলেন নিগূঢ় তাৎপর্যে। লন্ডনের প্রকৃতি, মাটির রূপরসগন্ধ, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও দৈনন্দিন জীবনের মাঝে লুকিয়ে থাকা বহমান সভ্যতা, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানা বিষয়কে তিনি লেখনীর মাধ্যমে ছবির মত ফুটিয়ে তুলেছেন এই গ্রন্থে।

আগেই বলেছি বইটি অর্ধশতাব্দী পূর্বে রচিত। কতখানি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও গতিশীল মনের অধিকার জন্মালে এবং মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে সংবেদনশীল হলে এমন লেখা সম্ভব হয়, গ্রন্থটি তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইংল্যান্ডে লেখকের অবস্থানকালে সেখানকার সামাজিক রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গিটি তিনি লক্ষ্য করেছেন একজন সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে। স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশের হিত চিন্তা তাঁর মধ্যে ছিল বলেই তৎকালীন বাংলাদেশের সাথে (সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তান) তুলনা করে উন্নত বিশ্ব থেকে পিছিয়ে থাকা আমাদের দেশ ও জাতির দুর্বলতাকে তুলে ধরেছেন লেখক। মনে হয় উন্নত সভ্যতার আলো আমাদের দেশে তথা সমাজে এসে প্রবেশ করুক তাই তিনি চেয়েছিলেন।

বইটিতে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ আছে। তৎকালীন সময়ের লন্ডনের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ভাষায় লিখে গেছেন লেখক।

বইটি দীর্ঘদিন পর পুনঃ মুদ্রণের উদ্দেশ্য হল লেখকের এমন একটি চমৎকার প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা ভ্রমণকাহিনী বর্তমান প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়া ও সেই সাথে অর্ধশতাব্দী পূর্বের ইংরেজ সমাজের চিত্র, এবং ইতিহাসের সাথে এখনকার পাঠকদের পরিচয় ব্যাপক ও গভীর করতে সাহায্য করা।

আজকের নতুন প্রজন্ম এ গ্রন্থখানি পাঠ করে লন্ডন তথা বিলেত ও বিলেতবাসী ইংরেজদের তৎকালীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সর্ম্পকে একটি সুস্পষ্ট সুন্দর ও আনন্দময় ধারণা গ্রহণ করে নিজেদের চিত্ত ও চিন্তার সমৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হবে এ প্রত্যাশা রাখি।

নীপবন শিশু বিদ্যালয়
দক্ষিণ ক্যাম্পাস,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
২৬ নভেম্বর ২০০১

হাসিন জাহান

পুনশ্চ : বর্তমান সংস্করণে অল্প কিছু স্থানে দু' একটি শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। যথা,– ৩০ ডিগ্রী ফাঃ কে ৩২ ডিগ্রী ফাঃ করা হয়েছে (পৃ. ১৮)। 'হালাল' স্থলে ' জবাই' (পৃ. ২৩) বলা হয়েছে। ১০৩ পৃষ্ঠায় 'আগ্নেয়াস্ত্র' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে। হ্যামস্টেড স্টেশন (পৃ. ৫৫) আঠারো তলা বলা আছে। স্বচ্ছতার জন্য বন্ধনীতে সঠিক তথ্য ১৯০ ফুট উল্লেখিত হলো, যা আসলে আঠারো তলার সমউচ্চ বোঝায়। অন্যান্য সামান্য সংযোজন Text-এর মধ্যেই সম্পাদকীয়তার খাতিরে যুক্ত করা হয়েছে।

হা. জা.

উৎসর্গ

আমার পুত্র ও কন্যাদের হাতে

এক

১৮ই সেপ্টেম্বর। ১৯৫০ সাল।

পাখীর মতো ডানা মেলে দিয়ে জীবনের প্রথম আজ নিজের দেশের আকাশে উড়ছি। নিজের দেশের শ্যামশোভা এমন ক'রে দেখার সুযোগ হয়নি কোনদিনও। নীচে ফসলের মাঠ আর তরুলতার সবুজ। ওপরে নীল শূন্য আকাশ। সাদা-কালো রঙ-বেরঙের মেঘমালার ছোঁয়া লাগছে শরীরে ও মনে। ওপর থেকে মাঠঘাট দেখে মনে হচ্ছে কে যেন পাশার ছক পেতে রেখেছে। মানুষ ও মানুষের ঘরবাড়ীগুলো দেখে গালিভারের লিলিপুটের কথা মনে পড়ছে। অনন্তকাল-স্রোতের মধ্যে বুদ্বুদের মতো মানুষের জীবন—অবিরত ফুটছে ও ঝরছে। দুনিয়ার খেলাঘরে কয়টি মুহূর্ত কাটিয়ে দেবার জন্যে তার কত আয়োজন—আর নিজের শক্তির পরিচয়ে কি তার আনন্দ! কিন্তু ওপর থেকে এমন নির্লিপ্তভাবে দেখলে মানুষের ক্ষুদ্রতার কথা আশ্চর্যভাবে মনে প'ড়ে যায়। কি অদ্ভুত ছোট ছোট দেখাচ্ছে সব কিছু। ঘরবাড়ী লাগছে শিশুদের খেলাঘরের মতো। বাস-ট্যাক্সী-ট্রেনগুলোকে মনে হচ্ছে যেন তাদের খেলনা। পদ্মাকে মনে হচ্ছে যেন খেয়ালী মেয়ের হাত থেকে খ'সে পড়া এক টুকরো রূপালী ফিতা।

কিন্তু শোভা দেখলাম পূর্ব বাংলার মাটির আর আকাশের। সবুজে সবুজ আর নীলিমায় নীল সারা পূর্ব বাংলা। আদিকাল থেকেই প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্যের জন্যে বাংলা দেশের খ্যাতি, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ মতে পূর্ব বাংলার সবটাতেই পাই তার ছাপ। মেঘের এমন সমারোহ, আকাশের বুকে মেঘরাজ্যের এমন খেলা, মুহর্মুহু মেঘমালার এত বিচিত্র রূপবদল, ধীরভাবে মুগ্ধ দৃষ্টিতে না দেখলে তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না। সাদা, কালো, আসমানি, ফিরোজা, সবুজ, নীল, ধূপছায়া, বেগুনি, লালচে ও লাল, ফিকে ও গাঢ় কত রঙের মেঘের কি সুন্দর কৌতুক লীলা। দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেলো। নিজের দেশকে এমনভাবে দেখবো একথা কোনদিন ভাবিনি। মনে পড়ছে ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত। আজ থেকে ছ'শ বছর আগে তিনিও দেখেছিলেন পূর্ব বাংলার এ সবুজ রূপ অনাস্বাদিতপূর্ব পিপাসা নিয়ে। মরুদেশের মানুষ তিনি। পূর্ব বাংলার স্নিগ্ধ সবুজরূপ সে দিন তাঁর চোখে মায়ার পরশ বুলিয়েছিলো! পূর্ব বাংলায় প্রবেশ ক'রে পৃথিবী তার কটিদেশে সবুজ মেখলা জড়িয়েছে। তার সেই সবুজ স্রস্ত বসনাঞ্চল বার্মা-মালয় হয়ে লুটিয়ে পড়েছে ইন্দোনেশিয়ার দিকে। সবুজের সবটুকু গাঢ়তা অকৃপণভাবে উপচে পড়েছে পূর্ব বাংলায়। সিলেট এবং চাটগাঁ থেকে আরম্ভ ক'রে ঢাকার রমনা হয়ে আকাশের পথে উত্তর-পশ্চিমে

যতই বিচরণ করা যায়, প্রকৃতির সবুজের প্রবাহ ততই কমে আসতে থাকে। পশ্চিম বাংলার বর্ধমান বিভাগে প্রবেশ করলেই দেখা যায় সবুজ ফিকে হয়ে পেছনে স'রে পড়েছে।

কলকাতাও ছাড়লাম। উড়ছি ভারতের উপর দিয়ে। তখ্‌তে সোলায়মানে ব'সে ভারতবর্ষ পরিক্রমণ করছি। 'নদ-নদী-নগরী বাহিয়া' উড়ে যাচ্ছে সোলায়মানের হাওয়াই সিংহাসন। মানুষ আর প্রকৃতির গড়া নিদর্শনগুলো একে একে আমাদের চোখের সামনে থেকে দ্রুত অপসৃত হয়ে যাচ্ছে। এলাম নয়াদিল্লী। ওপর থেকে ছবির মতো লাগছে। দিল্লীর পালাম বিমান বন্দর ছাড়লাম। করাচীর দিকে উড়ে চলেছি। রাত্রি তখন গোটা দশেক হবে। কারাচী বিমান বন্দরের আলো চোখে পড়লো। প্রাচ্যে প্রবেশ করার রাজতোরণ এই করাচী। বিমান বন্দরটি প্রকাণ্ড। তেজগাঁ থেকে লণ্ডন পর্যন্ত যতগুলো বিমানবন্দর রয়েছে, একমাত্র আমষ্টার্ডম ছাড়া অন্যান্যগুলোর তুলনায় করাচীর বিরাটত্ব ও গাম্ভীর্য লক্ষ্য করার মতো। প্রাচ্যের তোরণ হিসেবে আর দুনিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের বিমান বন্দর হিসেবে করাচী তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। নিজের দেশ পাকিস্তানের তদানীন্তন রাজধানী করাচী দেখে নিলাম। করাচীর প্রধান যে জিনিস পূর্ব পাকিস্তানীদের চোখে পড়ে, তা তার প্রচুর চওড়া পথ আর উটের গাড়ী। কদাকার প্রাণী উটের প্রয়োজন ও উপযোগিতার শুরু ভারতের যুক্তপ্রদেশ থেকে। উটকে বলা হয় 'মরুজাহাজ'। শুকনো মাটির দেশ আর মরুভূমিতে উটের মতো উপকারী প্রাণী খুব কমই আছে। পানি-কাদার দেশ আমাদের পূর্ব পাকিস্তান। গরু-মোষই আমাদের যানবাহনোপযোগী প্রধান জন্তু। বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে বিহার পেরিয়ে যতই উত্তর-পশ্চিমে এগুনো যায় উটের প্রয়োজনীয়তার কথা ততই মনে পড়ে। করাচীতে দেখলাম উট বোঝা বয়, গাড়ী টানে, লাঙ্গলও বয়, তাছাড়া মানুষের খাদ্যের একটা মোটা উপকরণও বটে।

করাচীতে চোখে পড়লো সেখানকার ফল। পথে পথে ফলের দোকান। ফলও অত্যন্ত সস্তা। যেখানে যা নেই, কথা আছে, সেখানে তার কদর বেশী। পশ্চিম পাকিস্তানে আনারস আর পান নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের আমীর লোকদের জন্যে অনেক সময়ে তাই হাওয়াই জাহাজে আসে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আনারস আর পান। আমাদের এগুলো প্রচুর, তাই এসবের প্রয়োজন বুঝলেও কদর আমরা তেমন বুঝি না। আঙুর, বেদানা, সেব ইত্যাদির জন্যে আমরা জিভের পানি ফেলি। আমাদের ওখানে এ সবের যা সের দর তাতে মধ্যবিত্তরা এ সব ফল খাওয়া বিলাস ব'লে মনে করে। আঙুর, বেদানা ও সেবের কথা মনে হ'লে ইচ্ছে করে রোগী হয়ে থাকতে। বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও কাশ্মীরে এ সব ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তাই করাচীতে এগুলোরই প্রাচুর্য।

১৯শে সেপ্টেম্বর। করাচীর ঈদগাহ্ ময়দানে গেলাম। নীল স্বচ্ছ আকাশ, চারিদিকে ধূ ধূ করছে শুকনো রোদ। জাতির পিতা কায়েদে আযমকে দেখলাম অনন্ত বিশ্রাম-রত। জীবনে বিশ্রাম নেবার সুযোগ তাঁর ঘটেনি। জাতিকে গড়তে গিয়ে তিলে তিলে নিজের জীবন ক্ষয় ক'রে পাকিস্তানী জাতির চলার পথ তৈরী ক'রে দিয়ে তবেই তাঁর শোবার সময় এলো। যেখানে তাঁর মাজার সে জায়গাটি বেশ উঁচু এবং খুব চওড়া। চারিদিকের মাটি ও কাঁকর পাথরের মত শক্ত। তারই ওপরে রচনা করা হচ্ছে কায়েদের স্মৃতিসৌধ। জীবনে

তাঁর জাতিকে উঁচু ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্য তিনি তাঁর মাথা যেমন কারও কাছে নীচু করেন নি, তেমনি তাঁর হাতে গড়া জাতি মৃত্যুতেও তাঁকে উঁচু ক'রে তুলে ধরবার জন্যে উঁচু জায়গাতেই তাঁকে শুইয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে। মানীর মান খোদা কিভাবে রক্ষা করেন, তার অপূর্ব সমন্বয় দেখলাম কায়েদে আযমের মাজারে। বহুদূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, ঐ ওখানে শুয়ে থেকে হযরত ওমরের মতো, খালেদের মতো তাঁর জাতিকে এগিয়ে যাবার কি অপূর্ব প্রেরণা তিনি যোগাচ্ছেন। কবরের শিরানায় পাথর ফলকে কোরানের আয়াত লেখা রয়েছে। তার বাম দিকে মেয়েদের ও ডানদিকে পুরুষদের যিয়ারতের ব্যবস্থা। দুপাশেই কোরান শরীফ রয়েছে। ইচ্ছা করলেই যে কেউ সেখানে কোরান তেলাওয়াত ক'রে তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্যে বখশে দিতে পারে। কায়েদে আযমের সৌভাগ্যে মন ভ'রে উঠলো। তাঁর জন্যে শুধু পাকিস্তানেই নয়, সারা মুসলিম জাহানে যতো কোরান-খতম হয়েছে, ইসলামের শুরু থেকে আজ অবধি কারুর একার জন্যে এতোবার কোরান খতম হয়েছে কি-না সন্দেহ। মাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম ঘিরে যে স্মৃতিসৌধ গ'ড়ে উঠবে, তার চিহ্ন আঁকা হয়েছে দেখলাম। করাচীর প্রান্তভাগে এই ঈদগাহ্ ময়দান। দূর সমুদ্র থেকে হু হু ক'রে বাতাস বয়ে এসে কায়েদে আযমের মাজার চুমে যাচ্ছে।

আরব সাগরের কূলে—করাচীর সুবিখ্যাত ক্লিফটন বীচ। নগরবাসীদের সমুদ্র-স্নানের ও যুগল মিলনের এমন উপযুক্ত জায়গা সারা পাকিস্তানে আর দ্বিতীয়টি নেই। করাচীর এক ধনী পারসীর টাকায় গ'ড়ে উঠেছে এই বীচটি। বলতে গেলে একেবারে সমুদ্র থেকে একটু একটু ক'রে বেঁধে তোলা হয়েছে এই বীচের রাজপথ। ট্যাক্সি নিয়ে কি পায় হেঁটে পাড় থেকে সামনে যাতে পানির ধার পর্যন্ত নেমে যাওয়া যায় তার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। পাথর বাঁধানো পথ পাড়ের ওপর থেকে নীচে নেমে গেছে। পথের ওপরেই রোদ থেকে বাঁচবার আশ্রয় বিশ্রাম শিবির। আর মাঝে মাঝে রচা সুন্দর কৃত্রিম অথচ মনোহর তরুলতা ও ফলের বাগান। মরুভূমির বালির উপর কচি ঘাসের চোখ জুড়ানো সবুজ ছোঁয়া। পায়ে হেঁটে পথ বেয়ে নেমে গেলাম একেবারে পানির ধারে। জোয়ার ভাটায় বালির বহুল আমদানীতে পথ মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়; সেজন্যে বালি সরিয়ে দেবার যথারীতি ব্যবস্থাও দেখলাম। ক্লিফটন বীচ থেকে অনতিদূরেই দেখা যায় আরব সাগরের বুক ভেদ ক'রে স্ফিংসের মতো পাহাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। তার চারপাশে এসে দিগন্ত জোড়া অথৈ পানির কলোচ্ছ্বাস ও অনন্ত গর্জন আছাড় খেয়ে ভেঙে পড়ছে, তবু সেই পর্বত চূড়া উন্নত মহিমায় আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলাম অভিসারকামী যুগলের দল। সাগরের অনন্ত মত্ততার আভাসে দুরন্ত প্রাণ-বন্যায় তারাও তরঙ্গিত হচ্ছে। দু'হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করলাম। মনে মনে বললাম, আমার দেশের এ অনন্ত যৌবন অক্ষয় হোক। যে দেশের যুবকেরা এমনি ক'রে জীবন উপভোগ করতে পারে তারাই হাসতে হাসতে দেশের জন্যে প্রাণও দিতে পারে। যুবতীরা দেয় প্রেরণা; যুবকেরা দেয় প্রাণ। যে দেশে অক্ষয় যৌবনের দুর্বার অভিযান আধুনিক জগতে সে দেশের উন্নতিই অবশ্যম্ভাবী; ইউরোপ তার সাক্ষ্য।

* * *

ভাবতে ভাবতে শূন্য আকাশের বুকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। উড়ন্ত বিমান হঠাৎ 'বাম্প্' করলো। তবু রক্ষা। আকাশ থেকে মাটিতে নামবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভোর

ছ'টা। বাগদাদে নামলাম। রাত্রির অন্ধকারে আর জড়িমাজড়িত মনের ভাবে আমি বেঁচেছিলাম কি না জানিনা। কখন আফগানিস্তান ও ইরান পার হয়ে এসেছি টের পাইনি।

মুসলিম-সভ্যতার গৌরব নিকেতন খলিফা হারুনর রশীদের দেশ ইরাকের রাজধানী এই বাগদাদ। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ ফল খুরমা ও খেজুর দেখলাম। মধ্য এশিয়া সম্পর্কে আমাদের দেশে যে ধারণা তা মোটেই মধুর নয়। মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোতে আজও যে নেই তা নয়। তবু এরা এগুচ্ছে বর্তমান যুগের বিজ্ঞান-শাসিত সভ্য ইউরোপকে অনুসরণ ক'রে। মানুষের প্রকৃতিতে দেশের মাটির ছাপ থাকে সুস্পষ্ট। বাগদাদ বিমানঘাঁটি দেখলাম। বড়ো নোংরা লাগলো। সেই থুথু। সেই চেঁচামেচি। বাংলা দেশের স্টীমার কি রেল স্টেশনের মতো মনে হলো। অন্যান্য বিমানঘাঁটির মতো বাগদাদ বিমান ঘাঁটি শহর থেকে তেমন দূরে নয়। বিমান ঘাঁটির পাশ দিয়ে রাস্তা শহরের দিকে চলে গেছে। দু'পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে গাছপালা। আমাদের দেশের মতো এত সবুজ নয়, সরসও নয়। একটা রুক্ষতার ছাপ প্রকৃতির যুতটুকু চোখে পড়ল তাতে আর মানুষগুলোর চেহারায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ভাঙা আরবীতে এখানকার দু'চার জনের সঙ্গে কথা বললাম। পাকিস্তান থেকে আসছি শুনে খুব খুশী হলো ওরা। পাকিস্তানের বাইরে মুসলিম দেশগুলোতে পাকিস্তানের জন্যে দরদ দেখে বুক ভ'রে উঠলো। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখলাম। আরবী সাহিত্যের বিস্মৃতপ্রায় রহস্যময় চরিত্র বদিউজ্জামান হামদানী ৷ 'আবুল ফাত্হল্ এস্কান্দরী'র কথা মনে হ'লো। আমরা কৈশোর জীবনের পরিচিত সেই চরিত্রকে বাগদাদে এসে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখবো একথা ঘুণাক্ষরেও কোনদিন ভাবিনি। আমার কাছে সে হ'লো হঠাৎ আবির্ভূত। জোব্বাজোব্বি পরিহিত ভদ্রলোক অনর্গল আরবীতে কি বকছে। বক্তৃতা শুনবার জন্যে কাছে গেলাম। আমাদের মতো নতুন মুখ দেখে আরবী বুঝবো না মনে ক'রে ফারসী ভাষা বলতে লাগলো। দুই-ই হ'লো আমাদের কাছে সমান দুর্বোধ্য। অঙ্গভঙ্গী থেকে যতটুকু বুঝলাম তাতে মনে হ'লো বেচারা ভুগছে কোনো অসুখে। যে কারণেই হোক তার অর্থের প্রয়োজন। আমার কল্পনা আর বাস্তবের এস্কান্দারীর মধ্যে তফাৎ দেখে মনটা ভারী হয়ে উঠলো। এমন সময়ে কালো পোশাক পরিহিত দৈর্ঘপ্রস্থে সমান টানা বাগদাদী পুলিশের হ'লো অতর্কিত আবির্ভাব। বেচারাকে চেঁচানোর আর সুযোগ দিল না। দিল বিমানঘাঁটির বাইরে বের ক'রে। আমাদের দিকে চেয়ে ওর অতি বড়ো আশা বোধ হয় শূন্যে মিলিয়ে গেল।

বাগদাদ ছাড়লাম। জেগে-উঠা ভোরের আলোয় বিমানের সব শুদ্ধ পঞ্চাশ জন লোক আকাশ-বিহার করছি, এবারেই তা প্রথম বুঝলাম। নানা দেশের নানা রকমের নরনারী মূল থেকে উৎপাটিত হয়ে আকাশের বুকে এমন সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হবো তা কি কখনও ভেবেছিলাম ? আশে-পাশে যে মুখগুলো দেখছি সবই যেন সুন্দর মনে হচ্ছে। আমাদের পাশের সিটে দেখলাম একটি যুগলকে। পরিচয়ে জানতে পারলাম তারা আসছে শ্যামদেশ থেকে। একজন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানীর অধ্যাপক, আর একজন তারই বান্ধবী। বয়সে দু'জনেই তরুণ। তার সঙ্গিনীর নাম জিজ্ঞাসা করলাম। মেয়েটি ইংরেজী ভালো বুঝে না, কিন্তু যুতটুকু বুঝলো তাতেই অত্যন্ত মিষ্টি ক'রে তার নামটি উচ্চারণ

করলো 'পা-নি'। 'প' এর পরের আকারের দীর্ঘতা তার বলার ভঙ্গী থেকে অত্যন্ত মধুর হয়ে বাজলো আমার কানে। বর্মী, মালয়ান, শ্যামদেশী, জাপানী আর চৈনিক মেয়েদের মুখের গড়ন কিছুটা চেপ্টা। আমাদের দেশের সৌন্দর্য-বিচারে অভ্যস্ত আমাদের চোখ এদের কোনদিনই ভালো চোখে গ্রহণ করেনি। কিন্তু এ মেয়েটির চেহারায় স্নিগ্ধ সারল্যের ছোঁয়া স্পষ্ট অনুভব করলাম। মাধুর্যের উপকরণ যে দুনিয়ার সব দেশেই আছে, একে দেখে বার বার সে কথাই মনে হচ্ছিল।

একটি সুন্দর কচি মেয়েকে দেখলাম। তার পাশের সিটে ছিল ষাটের অধিক বয়স্ক এক বুড়ো। দু'জনের চেহারায় কোন সামঞ্জস্য নেই। তবু তাকে বুড়োরই মেয়ে ঠাওরালাম। পরে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, বুড়ো তার কেউ নয়। সে বাগদাদের এক শ্রেষ্ঠীর মেয়ে। বিলেতে যাচ্ছে পড়তে। বয়স তার বছর এগার হবে। নাম লায়লা। তার কচি মুখের ওপর জ্যোৎস্না-নম্র রূপের স্নিগ্ধ চমক মন ভ'রে দেবার মতো। বাগদাদের মুসলমান ঘরের ঐ ছোট্ট কচি মেয়েটি কি অপূর্ব মনোবল নিয়ে একা চলেছে বিলেতে! ঐ বয়সের আমাদের দেশে ছোট্ট ছেলেমেয়ের কথা না-ই বললাম। প্রৌঢ় আমাদেরকে নিয়েই একা চলার সমস্যায় আমরা কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি তা ভেবে কিছুটা যে লজ্জা না পেলাম তা নয়। এয়ার হোস্টেস প্রতি দুঘণ্টা অন্তর খাওয়াচ্ছেন। এটা সেটা হরদম খেয়ে মনে হচ্ছে যেন খাওয়ার ওপরেই আছি। আমরা মদ খাইনা দেখে বুড়োটির বিস্ময়ের শেষ নেই। খোঁজ নিয়ে বুঝলাম সেও মুসলমান। জীবনের কোন বন্ধন নেই তার। বয়স ভাঁটার টানে গড়াচ্ছে, পয়সা আছে প্রচুর। বয়সে বুড়ো হলেও তাই মন বুড়ো হয়নি। সে প্যারিস যাচ্ছে, জীবন উপভোগ করতে। বাগদাদের এ বুঝি আর এক রূপ।

আমরা উড়ছি সিরিয়ার মরুভূমির উপর দিয়ে। এর যেন আর শেষ নেই। যেদিকে তাকাই শুধু ধু ধু প্রান্তর। বালির তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তার ছোঁয়ায় রোদও শুকিয়ে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। যতই চলছি মনে হচ্ছে মহাপিপাসার রঙ্গভূমি প'ড়ে প'ড়ে ধু'কছে। পৃথিবীর অবয়ব যে কতো আশ্চর্য উপাদানে গড়া এমন ক'রে পৃথিবী পরিক্রমণ না করলে তা বোঝা যায় না।

বেলা তখন দশটা। কায়রোর ফারুক এয়ারপোর্টে নামলাম। ইরাক, সিরিয়া, মিশর এই তিনটি দেশের বুকের উপর দিয়ে উড়ে মধ্য এশিয়া সংক্রান্ত ছেলেবেলার ভূগোলের জ্ঞান ঝালিয়ে নেবার সুযোগ হ'লো। দেশগুলো যে শুক্‌নো, আমাদের দেশের মত এমন ভিজা নয়, বীজ ফেললেই এমন সোনার ফসল ফলে না, তা বেশ বুঝতে পারলাম। এখন বুঝি যুগে যুগে এ জন্যেই ভারত বিশেষ ক'রে বাংলাদেশকে বলা হয়েছে ঐশ্বর্যের লীলাভূমি। মধ্য এশিয়ার শুকনো দেশগুলোর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনা করলে এর সত্যতা ভালো ক'রে উপলব্ধি করা যায়। দিগন্ত জোড়া মরুভূমির মধ্যে ফারুক এয়ারপোর্ট। ইসরাইলের সঙ্গে মিশর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তার বিমান বন্দরের চারিদিকে অসংখ্য বিমান ডানা-ভাঙ্গা অবস্থায় প'ড়ে থাকতে দেখলাম। শুকনো ঠনঠনে কাঁকরের মতো মাটি। উপরে উড়ছে মিশরের আলহেলালী ঝাণ্ডা। মিশরের মাটিতে পা দিয়ে অজ্ঞাত আত্মীয়তার সুরের আভাস পেলাম। বাগদাদের মতো এখানকার মানুষগুলোকে তেমন

শুকনো মনে হ'লো না। এদের কথা আরবী শুনতে ভাল লাগলো। কথ্য আর লেখ্য ভাষায় তফাৎ যে কতোখানি, আমরা যারা বিদেশী ভাষায় লেখ্যরূপ শিখি তার কথ্যরূপ না শুনলে তা যথাযথ বুঝতে পারি না। আমাদের জ্ঞান ক্লাসিকাল আরবীতে– তা অপরিবর্তনীয়; বর্তমান কালে আরবী ভাষা পরিবর্তনের স্রোতে কোথায় ভেসে এসেছে, মিশরে এসে তার টের পেলাম। মনে হচ্ছে যেন ফারসী ভাষা শুনছি। মা আর মাতৃভাষা প্রত্যেকেরই অতি আপনার, সে জন্যেই মিষ্টি। বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও তমদ্দুনিক সংযোগের জন্যে এদের ভাষার মিষ্টতা আমার হৃদয় স্পর্শ করলো।

* * *

মধ্য এশিয়া ছেড়ে যাচ্ছি। ভূমধ্যসাগরের উপরে আমরা উড়ছি– তিরিশ হাজার ফিট উঁচু দিয়ে। নীচ থেকে বহু উপর দিয়ে পাখী উড়তে দেখে কতোদিন কতো কথাই তো মনে করেছি, আজ আকাশের বুকে এমন ভাবে উড়তে গিয়ে সুদে আসলে তার সব শোধ ক'রে নিচ্ছি। পৃথিবীর অগণিত বৈচিত্র্য প্রতিভাত হচ্ছে আমার চোখে। সবটা মিলিয়ে কিসের যেন মোহ জাগছে।

ছেড়ে গেলাম ক্রীট। ছাড়লাম আদ্রিয়তিক সাগর। সামনে দেখা যাচ্ছে আল্পস্ পর্বতমালা। অষ্ট্রিয়া, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রান্তদেশ জুড়ে প'ড়ে আছে ইউরোপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলানিকেতন আল্পস্ পর্বতমালা। আমাদের বিমান ক্রমেই উঠে যাচ্ছে উঁচুতে আরও উঁচুতে। মনে হচ্ছে নমরুদী সিংহাসন মাংস-লুব্ধ শকুনির সাহায্যে খোদার খোদকারী ধূলিসাৎ করবার জন্যে অভিযানে বেরিয়েছে। তাই সে যেন আর নীচুতে নামতে চায় না। ভাবছি রক্ষা পেলে হয়। আল্পসের মেঘমালার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আমরা এগুচ্ছি। আর কিছু দেখা যায় না। মেঘরাজ্যে হারিয়ে গেলাম। ভয়ে আতঙ্কে প্রাণ শিউরে উঠছে। মনে হচ্ছে এ দুর্জয় প্রকৃতির অপরিসীম রহস্যের মধ্যে তলিয়ে গেলাম। এখান থেকে বেরুনোর আর কোন আশা নেই। জীবনের বৃন্তটুকু হ'তে প্রকৃতির গভীর অন্ধকারে খ'সে যাচ্ছি। পিছনে প'ড়ে রইলো জীবনের সুখ দুঃখের স্মৃতি। আর কোনদিন সেখানে ফিরবার অবসর হবে না। কি গভীর মেঘান্ধকারে এতগুলো প্রাণী মরণের অভিসারে চলেছি ভাবতে পারছি না। সকলের মুখেই গভীর আতঙ্কের ছাপ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে। হঠাৎ তারি আলোর ঝলকানিতে অমানিশার চেয়েও থমথমে গাঢ় কালো মেঘের রূপ চোখে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। কি ভীষণ সুন্দর! কি মৌন মহিমা তার! অনন্ত-জোড়া কালো মেঘ পাহাড়ের গায়ে গায়ে কি জমাটবাঁধা ভীষণতা ধারণ করছে। ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের অতলে ডুবে গেলাম। ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছে এর হাত থেকে মুক্তি পাবো কি ?

বহুক্ষণ কেটে গেলো। চোখ মেলে চাইতেই দেখি এবারে সঘন সাদা মেঘমালার প্রণয়াভিসার। এক একটি মেঘপিণ্ড কি সতেজ, সুডৌল, সুঠাম! পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে মানুষের লোকালয় থেকে বহু দূরে জীবনের মৌন আকুতি বিবশ আলিঙ্গনে নিবেদন ক'রে চলেছে। তাদের আনন্দের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত উল্লাসিত ক'রে তুলেছে। তুষার ধবল বরফের রাজ্য। একটার পর একটা। একের গায়ে আর একটা। সে কত! যতদূর চোখ যায় দেখা যায় শুধু বিরাট বরফের পর্বতখণ্ড। মনে হচ্ছে "ন তত্র

চন্দ্রোভাতি ন সূর্য তারকা।" আলোর গায়ে আলো ঠিকরে পড়ছে। বজ্রের আলোর চেয়ে সাদা। মৃত্যুর অনুভূতির চেয়ে হিম স্নিগ্ধ। বরফ-হিম-আলোর হাসি যেন থৈ থৈ করছে। বহু নীচে প'ড়ে রয়েছে আল্পস্। মাথায় দুর্গম প্রকৃতির দুর্ভেদ্য রহস্য। তারই ওপর দিয়ে ভেসে চলেছি আমরা। পাশাপাশি কালো ও আলোর একি সমারোহ! নির্বাক বিস্ময়ে চোখ মেলে চাইছি! দেখে দেখে জীবনের অনুভূতি যেন স্তব্ধ হয়ে আসছে। এ দৃশ্য সত্যি দুর্লভ। ইউরোপের পথে বেরিয়ে এ জীবনে প্রকৃতির যে মনোরম শোভা দেখে নিলাম তার কোনো মূল্যই দেওয়া যায় না। সৌন্দর্য-পাগল মানুষেরা এর অতটুকু ছোঁয়া পাওয়ার জন্যে কেন যে জীবন দান করতেও কণ্ঠিত হয় না আজ তা বুঝি!

পূর্ব-পাকিস্তান ছাড়ার পর মেঘের শোভা আর চোখে পড়েনি। আল্পসে্ এসে মেঘরাজ্যের ভিতরে প'ড়ে প্রাণ হারাতে ব'সে দেখলাম মেঘের অনুপম কান্তি। তার নিরুপম ভীষণতা। তার জমাট বাঁধা নিরাভরণ রূপ। সে কী আশ্চর্য সুন্দর!

কায়রো থেকে দীর্ঘ সাত ঘণ্টা আকাশ বিহার করলাম। আকাশের বুকে মহাশূন্যতায় এক নাগাড়ে সাত ঘণ্টা ঝুলবো এ কি কোনদিন ভেবেছিলাম! সুদূর পশ্চিম দিগন্তে দেখতে পাচ্ছি ইটালীর নীল স্বচ্ছ আকাশ; সামনে জার্মানী। মিউনিকে আসা গেলো। মাটির মানুষ মাটিতে পা দিতে পারবো এ আশায় মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। মিউনিকের আকাশ ও মাটিতে সবুজের সুস্পষ্ট শোভা দেখা যাচ্ছে। চোখে লাগছে অনেকটা পূর্ব বাংলার নেশা। গোধূলি লগ্নে ইউরোপের মাটিতে পা দিতে হালকা সবুজের সঙ্গে মিউনিকেই প্রথম বারের জন্য চোখের মালা বদল হ'লো। মিউনিক অনেকটা আমাদের রমনার প্রান্তদেশের মতো। সেই বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঝে মাঝে সেই রকম ঘরবাড়ী। পার্থক্যের মধ্যে, যেন বরফ না জমে সে জন্যে ছাদগুলো তৈরী হয়েছে আমাদের টিনের দোচালার মতো।

মানুষগুলো দেখে মনে হ'লোনা যুদ্ধের যাঁতা এদের বুক পিষে দিয়ে গেছে। স্বাস্থ্য দেখলাম অটুট। প্রাণে তেমনি চাঞ্চল্য। দুর্বার যৌবনের স্থায়ী স্বাক্ষর আজও বহন করছে এরা। অনন্ত যৌবনের পূজারী জার্মানী। যুগে যুগে নিঃক্ষত্রিয় হয়েও পুনঃ পুনঃ যৌবনের চর্চা করে। তাই ম'রেও এরা আবার বেঁচে উঠে। মিউনিকের নরনারী দেখে মনে হ'লোনা এদের সেই তেজ, সেই যৌবন যুদ্ধে হেরে কোনো রকমে স্তিমিত হয়েছে।

আমষ্টার্ডামে যখন পৌঁছলাম রাত্রি তখন দশটা। হল্যাণ্ডের তুলনায় তার রাজধানীর বিমান বন্দরটি খুব জাঁকালো ব'লে মনে হ'লো। আজও বাইরে বেরোলেই বুঝা যায় পাসপোর্ট নামক জীবন-পত্রটি কত মূল্যবান। জীবন ওতে বন্দী হয়ে থাকে। ও হারালে বেশ কিছুদিনের জন্য জীবন হারাবারও স্বাদ পাওয়া যায়। কেন বুঝলাম না, জীবনের সেই ছাড়পত্র নিয়ে এরা বেশ কড়াকড়ি করলো। মুক্তি পেলাম, কিন্তু দুর্যোগের জন্য সময় মতো লণ্ডনের পথে রওয়ানা হওয়া গেলো না। শুনতে পাচ্ছি এখানকার আকাশেও আমাদের দেশের আষাঢ়ের মেঘমন্দ্র রব। ভয়ঙ্কর নয়, মিষ্টি। বেশ এক ঝলক বৃষ্টি হয়ে গেলো। মুষলধারে কিংবা প্রবল নয়; মৃদু। নতুন দেশে নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। এই সুযোগে বিমান কোম্পানী লণ্ডন যাত্রীদের এখানেই খাইয়ে নিলেন। খাবার ঘরে গিয়ে দেখি বিরাট

আয়োজন। মিউনিকও এখানকার আসবাব ও উপকরণে হার মেনে গেলো। ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়লো আমাদের আগের দেখা সেই শ্যামদেশী যুগলের অসহায় তরুণীটিকে। সেবারে সঙ্গে ছিল তার বন্ধু, ভাঙা ইংরেজীতে কোনো রকমে জবাব দেওয়া তাই সহজ হয়েছিলো। এবারে বন্ধুহীন প্রবাসে বেচারী কোনো জবাব দিতে পারলো না। দিল একটি স্মিত স্নিগ্ধ হাসি। সহায়হীন অবস্থায় ওকে বড়ো ভালো দেখাচ্ছিল। লাগছিল অনেকটা ভীরু হরিণ-শিশুর মতো। পথের বন্ধু পথ শেষ হবার সঙ্গেই কোথায় গেলো হারিয়ে। শুধু জেগে রইলো প্রভাতী তারার মতো আজো তার স্মিত হাসিটি!

* * *

রাত্রি তখন গোটা দুই। ইংলণ্ডের আকাশে এসে পৌঁছলাম। দূরে দেখতে পাচ্ছি আলোর মালা। অথৈ আলোর সমুদ্রে সাঁতার কাটছে সারা লণ্ডন। সারি সারি কত বিচিত্র আলোর তরঙ্গ; তরঙ্গের দোলায় দোল খেয়ে ঝলমল করছে লণ্ডন। নিদ্রিতা সুন্দরী লণ্ডনের শিথিল রূপ এমন ক'রে চোখে পড়বে তা ছিল আমার আশার অতীত। ওপর থেকেও বহু বিচিত্র আলোর সারির অন্ত পাচ্ছিনে। মনে হচ্ছে পৃথিবী মন্থন ক'রে ইংরেজ লণ্ডনকে মায়াস্বর্গের রূপ দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। গভীর নিশীথে দীর্ঘক্ষণ ধরে লণ্ডনের যৌবন-জোয়ারের লাবণ্য দূর আকাশ থেকে ধীরে ধীরে হৃদয়ে গেঁথে নিলাম। বিমান থেকে নেমে লণ্ডনের মাটিতে পা দিতেই সংশয়ানন্দের শরীর শিউরে উঠলো। শহরে প্রবেশ করলাম। মুগ্ধ বিবশ চোখ দুপাশে মেলে ধ'রে এগুতে লাগলাম। যার জন্যে জীবনের এতগুলো দিনকে সযত্নে গুছিয়ে তুলেছি, গভীর রাতে তার স্তব্ধ মধুর রূপ দেখেও তার মুখের আবরণ সম্পূর্ণ অপসারণ করবার সাহস হ'লো না।

দুই

লণ্ড শীতের দেশ। এখানে ঋতুর হেরফের যে হয় না তা নয়। গ্রীষ্মকাল এখানকার অস্থায়ী। তাই এখানকার লোকেরা গরমের জন্যে সূতী কাপড় তৈরী করে না, দেখতে থতে মাস দুই সময় কেটে যায়। শীতকালের চিরাচরিত গরম কাপড় পরেই এরা মকাল কাটায়। বছরের আর বাকী সময় সবই ঠাণ্ডায় ঘেরা থাকে। আমরা গরম দেশের ক। শীত যে কি এবং কতটা ভয়াবহ তা মোটেই বুঝি না। তবু অগ্রহায়ণ, পৌষ এবং মাঘের শীত সম্বন্ধে আমাদের দেশে নানা গালগল্প, ছড়া ও প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। ভচন্দ্রের একটা লাইন 'বাঘের বিক্রম-সম মাঘের শিশির' আমাদের দেশের শীতের ।তা কিছুটা ফুটিয়ে তোলে। গ্রাম্য ছড়ায় ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি 'মাঘমাসের ড়, মোষের শিং নড়ে'। পানি-কাদার প্রাণী বেচারা মোষ গরমের সময় রোদে বাতাসে ষ্ঠ হয়ে ওঠে, শীত তার কাম্য হ'লেও মাঘ মাসে আমাদের দেশে সেও শীতে কাঁপতে । এখানে এসে দেখছি আমাদের দেশের পৌষ-মাঘ মাসের শীত নিতান্ত গরমের মাস

দুই বাদ দিয়ে সব সময়েই থাকে। দেশে থাকতে এখানকার শীতের কথা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যে না শুনেছি তা নয়। ভাবতাম ও একটা কথার কথা। যেমন শীত আছে তেমন শীত নিবারণের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু এখানকার শীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যে পরিচয় হ'লো তা যে কি ভয়াবহ সে কথাই লিখছি।

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২১ তারিখের রাত্রে এখানে এসে পৌছি। তখনও গাছপালায় বেশ পাতা ছিল। সবুজের সঙ্গে চোখের কিছুটা ভাব বিনিময় হ'লো। সঙ্গে যে সব গরম কাপড় ছিল সেগুলোতে চললো কিছুদিন। বন্ধুরা এখানকার শীতোপযোগী কাপড়-চোপড় তাড়াতাড়ি কিনে দিলেন। অক্টোবরটা কোন রকমে গেলো। নভেম্বর শুরু হ'তে না হ'তে হু হু করে বাতাস বইতে আরম্ভ করলো। এক এক দিন মনে হ'তো বাতাস নয় যেন ঝড়। পথে বেরুলে ঠাণ্ডা বাতাস তীরের ফলার মতো একেবারে হাড়ে গিয়ে বিঁধে। সে কি তীব্র! ঠাণ্ডা। হ'লেও এখানকার ছেলেমেয়েদের তাতেই কি আনন্দ। মনে হ'তো বিদেশী আমরা–আমাদেরকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। এর ওপরে আবার সারাদিন আকাশের মুখ ভার। দিনের পর দিন সূর্যের আলোর কোন দেখা নেই। এক নাগাড়ে দিন পনের কেটে গেলো। আকশের অবস্থা একই রকম। রাত্রির বেলা পথ, ঘরবাড়ী ও দোকানের আলোতে তবু লণ্ডন শহরের সে ধোঁয়াটে ভাব ততটা চোখে পড়ে না। কোনো রকমে বিদ্যুতের আলোতে পথ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকতে পারলে দিন-রাত্রির ভেদ ঘুচে যায়। মুস্কিল হয় দিনের বেলায়। পরিচ্ছন্ন আকাশের দেশের লোক আমি। আলো আঁধারের তফাৎ আর দিন-রাত্রির পরিষ্কার সীমারেখা দেখে দেখে এত বছরের অভ্যস্ত চোখ দিনের বেলায় পথে বেরিয়ে দেশের সেই স্বচ্ছ নীল আকাশ আর সাদা রোদ দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে; কিন্তু আকাশের সেই আবছা অবস্থা আর কাটে না–রোদের দেখা মেলা তো দূরের কথা। এর ওপর আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। সে যে কি বিশ্রী, ভুক্তভোগীরাই জানে। এ দেশের লোকের ওটাও গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওতেই ওরা বের হয়, ওতেই ওরা ছোটে। দৈনন্দিন জীবনের কোনো কাজই প'ড়ে থাকে না। জীবন ওদের ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বাঁধা। আবহাওয়ার উপর নির্ভর ক'রে এরা চলে না। আবহাওয়া যেমনই হোক ওদের জীবনের গতির সঙ্গে ভালোমন্দ সকল অবস্থায় ওকে ওদের দাস হয়ে চলতে হয়।

বাংলা দেশে মাঘ মাসের তীব্রতর শীতে তাপমাত্রা নামে বড়ো জোর পঞ্চাশ না হয় পয়তাল্লিশ ডিগ্রি। উত্তর ভারত কি পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা তবু কিছু শীত দেখেছে। সে সব জায়গায় তাপ বহু নীচে নেমে যায়। কিন্তু বাংলা দেশের সর্বত্র এর নীচে নামে না। মনে আছে একবার মাঘ মাসে কৃষ্ণনগরে ক'দিনের জন্য টেম্পারেচার ৪৪° ডিগ্রি হয়ে গিয়েছিল। তাতে সারারাত্রি লেপতোষকের মধ্যেও শরীর গরম হতো না। বিছানার ভিতর যেখানকার পা সেখান থেকে এক আধটু নাড়লে চাড়লে মনে হতো পায়ে যেন হঠাৎ কে পানি ঢেলে দিয়েছে! সকালে দেখতাম শিশিরের সঙ্গে তুষার জমে আছে। আর একবার জুন কি জুলাই মাসে দার্জ্জিলিং-এ ছিলাম। টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখে ফেরার সময় ঘুমের নিকটবর্তী এক ডেইরী ফার্ম দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে মাটির নীচের ছোট্ট

একটা ঘরের টেম্পারেচার ফ্রিজিং পয়েন্টের নীচে বারো ডিগ্রি ক'রে রাখা হয়েছিল। সে ঘরে দুধ পেস্টোরাইজ ক'রে রাখা হতো এবং ওখান থেকে দার্জিলিং-এর সর্বত্র সেই দুধ চালান করা হতো। সে ঘরে ঢুকেছিলাম। মিনিট খানেক যেতে না যেতেই দেখলাম ঠাণ্ডায় আমার কোমর পর্যন্ত জমে আসছে, তাই দ্রুত লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিলো।

ডিসেম্বর মাসে সারা ইংলণ্ডে এমনি ধরনের শীত গেলো। টেম্পারেচার বত্রিশ ডিগ্রী ফা: হ'লে তার নাম হয় ফ্রিজিং পয়েন্ট। এবারে ডিসেম্বর মাস ধরে ইংলণ্ডের সর্বত্র টেম্পারেচার ফ্রিজিং পয়েন্টের বারো চৌদ্দ ডিগ্রি নীচে নেমে রইলো। ষোল, আঠারো, বিশ—উর্ধ্বতম তাপের মান ছিল এই। লেকের পানি জমে গিয়েছিলো। আকাশের দিকে চাইতে পারতাম না। মনে হতো সূর্য, সেও শীতের ভয়ে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। শীতের প্রচণ্ডতায় রোদহারা আবছা ধূসর আকাশ কেমন এক রকম ধূ ধূ করতো। ঠাণ্ডায় সমস্ত আকশের বুক চড় চড় ক'রে ফেটে পড়ায় সেখান থেকে অনবরত ঝরতো তুষারকণিকা। যখন তুষার বৃষ্টি হতো তখন অবশ্য খুব ভালো লাগতো। আমরা আমাদের দেশে বৃষ্টিই দেখেছি, কিন্তু এখানে এসে দেখলাম বরফের বৃষ্টি। আমাদের দেশে যেমন শিলা পড়ে এ তেমন নয়। মনে হচ্ছে এদেশের লোকগুলোর সঙ্গে কৌতুক করার জন্য কে যেন মহাশূন্যে ব'সে থেকে দেশ জুড়ে পাউডার ছড়াচ্ছে। ভারী সুন্দর সে দৃশ্য! ঘণ্টা দু'তিন ধরে এক সঙ্গে এমন তুষার বৃষ্টি হয়ে বাড়ীঘর, গাছপালা, পথঘাট সব কিছু সাদা ধবধব করতে থাকে। সব চেয়ে ভালো লাগে গাছগুলো। একটিতেও পাতা থাকে না। প্রচণ্ড শীতে সব পাতা খ'সে নেড়া হয়ে যায়। নেড়া ডালপালায় তুষারকণা বেধে বেধে সেগুলোকে যখন সাদা ক'রে তোলে তখন মনে হয় তারা যেন মাথায় বরফ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানকার বাড়ীঘরগুলোর ছাদও আমাদের দোচালার মত! যাতে বরফ জমতে না পারে সে জন্যেই অমন ক'রে তৈরী করা হয়েছে। তবু বরফ বৃষ্টির পরে বাড়ীগুলো যখন সাদা হয়ে ওঠে তখন সূর্যের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হিম শীতল সাদা আলোতে বেঁচে থাকার অনুভূতিও যেন ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চায়।

এ তুষার বৃষ্টির আবার প্রকার ভেদ আছে! ঝড়ের সঙ্গে তুষার বৃষ্টি হ'তে থাকে তখন আর তুষারের কণিকায় হয় না। ও রকম ঝড়ের নাম হলো ব্লিজার্ড আর তার সঙ্গে আমাদের দেশের শিলার মতো ভাঙা টুকরোর মতো যে বৃষ্টি হ'তে থাকে তাকে বলে শ্লিট। শ্লিট হলো বরফের টুকরো। ব্লিজার্ড এবং শ্লিট যে কি ভীষণ, ওর মধ্যে পড়লে অবশ্য তার ভীষণতা উপলব্ধি করা যায়। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করেও এখানকার লোক বেঁচে আছে। এরা প্রকৃতির দুর্যোগের ভীষণতাও উপভোগ করে। খাস বাংলাদেশের মানুষ আমি শীতেই হলাম সাপের মত আড়ষ্ট। এর ভীষণতা চোখেই দেখলাম, এবারের মতো আর উপলব্ধি করতে পারলাম না।

এ শীতের মধ্যে বাইরে বেরুনোর জন্য সব আয়োজন ক'রে রেখেছিলাম। কোমর থেকে পা পর্যন্ত উলের আণ্ডার ওয়্যার। তার ওপরে গরম প্যাণ্ট। শরীরে দেশী গেঞ্জীর

মতই উলের ভেষ্ট, তার উপরে সার্ট, তার উপরে উলের সোয়েটার। তার ওপরে সব চেয়ে গরম হ্যারিস টুইডের কোট এবং গলার স্কার্ফ। তার উপরে লম্বা ওভারকোট, হাতে গ্লাভস। আধ কি এক সাইজ বড়ো জুতা কিনে ভেড়ার লোমওয়ালা সুখতলার ওপরে দু'সেট ক'রে গরম মোজা পরা পা দু'খানিকে সযত্নে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এহেন অবস্থায়ও যখন বাইরে বেরোই তখনও কিছুক্ষণ বাইরে চলার পর মনে হয়, দাস্তানার ভেতর থেকে হাতের আঙ্গুলগুলো ঠাণ্ডায় ফেটে যেতে চাচ্ছে। পায়ের আঙ্গুলগুলোর রক্ত চলাচলও বুঝি বন্ধ হয়ে এলো। কোন দুটো আছে কি নেই কিছু বোঝা যায় না। নাকটা স্পর্শ করলে ওটা যে আমারই তা ঠাওর করতে পারি না। কি রকম একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে জমিয়ে দিয়ে যায়। তবু চলতে হয়, ছুটতে হয়, দৌড়তে হয়। এ দ্রুত চলার মধ্যে শরীরের রক্ত চলাচল করে। শীতকালে এখানকার নর-নারী, ছেলে-বুড়ো প্রায় ছুটেই চলে। কেন যে ছুটে চলে তা এখন ভালই বুঝি।

এ কারণেই এখানকার মানুষের জীবন আমাদের দেশের মতো আলস্যের বেড়া দিয়ে ঘেরা নয়। রাস্তা দিয়ে এজন্যেই এরা হেলে দুলে ধীরে মন্থর গতিতে চলে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দু-দণ্ড আলাপ করে না। নিতান্ত আপনার লোকের মতো ছেলেমেয়ে থেকে আরম্ভ ক'রে কি চাকুরি করি; কত মাইনে পাই এ সব খোঁজ করার সুযোগ পায় না। দেশের মাটি ও প্রকৃতি প্রত্যেক দেশের মানুষের ওপর এমনি অদ্ভুত ছায়া ফেলে। প্রকৃতিই মানুষের জীবনকে পার্থক্যের বেড়া দিয়ে তৈরী ক'রে তোলে। এরা তাই পথে বেড়িয়ে ছোটে, ঘরে গিয়ে হয় কাজ করে, না হয় নেয় শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম। বাইরে যেমন শীতের এই উগ্রতা, ঘরের ভেতরে বিশেষভাবে অফিস আদালতে, স্কুল কলেজে, দোকানপাটে, সাধারণ বাড়ীঘরে তেমনি শীত থেকে বাঁচার জন্যে আগুনের বন্দোবস্ত। হয় বিদ্যুতের সাহায্যে সেন্ট্রাল হিটিং ক'রে সমগ্র ঘরটিকেই গা সওয়া গরম ক'রে রাখার, না হয় সাধারণ বিদ্যুৎ কি গ্যাসের আগুনের বন্দোবস্ত এখানকার প্রতি ঘরেই রয়েছে। আমাদের দেশে গরমের সময় বাইরে থেকে এসে যেমন আমরা পাখা হাতে নিই এখানে তেমন বাইরে থেকে এসে এরা নেয় আগুনের গোড়ায় আশ্রয়। আগে এদের সেন্ট্রাল হিটিং অথবা বিদ্যুৎ সাহায্যে আগুন পোওয়াবার ব্যবস্থা ছিল না। ছিল ঘরের মধ্যে দেওয়ালের সঙ্গে কয়লা জ্বালানোর ব্যবস্থা। সে জায়গাটুকুকে বলা হতো ফায়ার প্লেস। ফায়ার প্লেসের আগুনে ধোঁয়া হয় ব'লে দেওয়ালের ভেতর দিয়ে ধোঁয়া বের হওয়ার পথও আগেকার তৈরী অধিকাংশ ঘরেই রয়ে গেছে। ছোটদের ইংরেজী বই-এ মাঝে মাঝে যে চিলেকোঠার ছবি দেখতে পাওয়া যায় সেটাই ধোঁয়া নির্গমের পথ।

দিনের বেলা তো কাটে লাইব্রেরীতে না হয় স্কুলে। সেগুলো সেন্ট্রাল হিটেড। যতোক্ষণ ওখানে থাকি ততক্ষণ শীত কি বুঝি না। ওখান থেকে বেরোবার আগে শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করবার কথা আবার ভেবে নিতে হয়। আটঘাট বেঁধে পথে বেরিয়ে হয় টিউব রেলওয়ে দিয়ে না হয় বাস ধ'রে ফিরি। স্কুল থেকে যখন বেরোই তখন এখানে গভীর রাত। আমাদের দেশেই শীতকালে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় সন্ধ্যা হয়, এখানে যে আরও

আগে সাঁঝ লাগবে তা সহজেই বুঝতে পারি। এখানে তিনটা সাড়ে তিনটায় সূর্য ডুবে যায়। সুতরাং রাত্রের অনেকটা এরা কাজে লাগায়। বাতি জ্বালিয়ে স্কুলে ক্লাশ বসেছে। অফিসে কাজ চলেছে। দোকানে সওদাপাট হচ্ছে। লাইব্রেরীতে ছেলেমেয়েরা পড়ছে।

শীত যে নির্মম ওর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয় ঘুমোবার সময়ে। শীত থেকে বাঁচবার জন্য মানুষ নেয় বিছানায় আশ্রয়। এখানে তার জন্যে প্রচুর আয়োজনও ক'রে রাখা হয়েছে। গদি আঁটা বিছানা। একবার ওর মধ্যে পড়লে মনে হয় বিছানায় ডুবে গেলাম। এহেন আরামের বিছানাও একেবারে হিম হয়ে থাকে। সারাদিনের আপিসী কাপড় চোপড়ের উষ্ণ সুখস্পর্শ থেকে শরীরকে এই প্রথম বারের মতো বিচ্ছিন্ন ক'রে বরফ দেওয়া এক কলস পানি শরীরে ঢেলে দিয়ে গেলো। এতে বড়ো শত্রুও কি মানুষের আর কেউ আছে ? এ থেকে বাঁচবার জন্যে বার বার ব্যাগে গরম পানি পুরে বিছানার অন্ততঃ কিছুটা শরীরের সঙ্গে মিতালি পাতানোর উপযোগী ক'রে নিই। কিন্তু সমস্ত বিছানার তুলনায় সে আর কতটুকু! ও খোদা! বিছানায় যাবার কথা মনে হ'লে বুকের ভিতরটা ঢপ্ ঢপ্ ক'রে উঠে।

* * *

এখানকার শীত যে কতো ভীষণ এবং সে জন্যই আমাদের কাছে কতো হিংস্র হ'তে পারে এ সম্পর্কে অনেক ইংরেজের সঙ্গে আলাপ করেছি। তারা বলেছে, এবারের মতো শীত নাকি গত কয়েক বছরে পড়েনি। অনেক বুড়ো বুড়ি এমনকি ছোটরাও নাকি শীতের প্রকোপে মারা পড়েছে। আমার মতো শীত-ভীতু লোক কি ক'রে এই শীত থেকে উদ্ধার পেলাম সেটা আমার নিজের কাছেই একটা বিস্ময়।

ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান মস্কো জয় করার জন্যে রাশিয়া আক্রমণ করেছিলেন। ইউরোপ মহাদেশে সবচেয়ে বেশী শীত পড়ে রাশিয়ায়। যুদ্ধ যেমনই হোক না কেন, রাশিয়ানরা শত্রুপক্ষকে কোন রকমে ঠেকিয়ে যদি শীত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে তা হ'লে তাদের দেশের শীতই শত্রুপক্ষের জন্যে মারাত্মক অস্ত্র হয়ে ওঠে। রাশিয়ার সাইবেরিয়ার সমতল ভূমি থেকে তুষার-হিম হাড় ভেদ করা বাতাস প্রবল বেগে বইতে থাকে। উপর থেকে পড়তে থাকে বরফের টুকরো–বৃষ্টির মতো। কুয়াশায় চারদিক হয়ে যায় অন্ধকার। এদেশী যারা তারা তো অভ্যস্ত ব'লে কোন রকমে সহ্য ক'রে যায় কিন্তু বিদেশীদের পক্ষে শীতের এ প্রকোপ হয়ে ওঠে এ যুগের এটম বোমার মতো মারাত্মক। যুদ্ধের সেনাপতির ইংরেজী উপাধি জেনেরাল। রুশরা তাদের দেশী শীতের আলঙ্কারিক নাম রেখেছে 'জেনেরাল উইন্টার'। জেনেরাল উইন্টারকে কোনো শত্রুর পক্ষে হারানো বড্ড শক্ত। নেপোলিয়ান মস্কোর জেনেরাল উইন্টারের কাছে হার মেনে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারকেও নাজেহাল হ'তে হয় মস্কোর এই নিদারুণ সেনাপতি জেনেরাল উইন্টারের কাছে।

গ্রীনল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল বছরের অধিকাংশ সময়েই বরফে ঢাকা থাকে। এ সব অঞ্চলে মানুষের বাস খুব অল্প। কিন্তু যারা থাকে তারা বরফের উপরে ঘর বেঁধে বাস করে। মানুষ প্রকৃতিকে কি ভাবে জয় করেছে তাই ভাবি। ফিনল্যাণ্ডের একটি ছেলের সঙ্গে এক রেস্তোঁরায় ব'সে ওদের দেশের শীতের সম্বন্ধে আলাপ করছিলাম। বরফের ওপর দিয়ে

কি ভাবে ওরা শ্লেজগাড়ী চালায়, স্কেটিং করে, বরফ দিয়ে কিভাবে গেণ্ডুয়া খেলে তার গল্প শুনে তাক লেগে যায়; প্রকৃতিকে মানুষ যে কি ভাবে দাসে পরিণত করেছে তার ছবি দেখে আশ্চর্য হ'তে হয়। ওদের দেশের শীত ও বরফের কথা শুনে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস না হবারই কথা। ওরাও আমাদের রৌদ্রের তাপ ও গরমের কথা শুনে কি ভাবে বিস্মিত হয় তা বলছি। ছেলেটি তেমন লেখাপড়া জানে না। বয়স আঠারো কি বিশ বছর হবে। তার বোন লণ্ডনে রেস্তোঁরা চালায়। বোনের সংসারে দিনাতিপাত করছে, অবশ্য বিনাখরচে নয়–তার রেস্তোঁরায় খেটে। সে আমাকে বললে, তোমাদের দেশের রান্নার জন্যে নাকি আগুনের দরকার হয় না, পাত্রের রান্নার জিনিসপত্র রেখে সেটা বাইরে রোদে রেখে দিলেই নাকি সিদ্ধ হয়ে আসে ? অজানা জিনিসের গায়ে আমরা এ ভাবেই কল্পনার রং চাড়াই, এ কথা ভেবে আমি মনে মনে না হেসে পারলাম না।

যে দেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া যেমন সে দেশের মানুষও তেমনি হয় কর্মঠ না হয় অলস। আমাদের দেশ গরম ব'লে মানুষগুলোর কি দশা দেখি ? তেমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। যতটুকু খাটে পান্তাভাত খেয়ে তারও চেয়ে বেশী জিরিয়ে নিতে চায়। ইংলণ্ড একে তো সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট একটুখানি দ্বীপ তাতে বছরের ন'মাসই শীতার্ত। সুতরাং এখানকার নরনারীকে বেঁচে থাকার জন্যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়। প্রকৃতিই ওদের শ্রমের মূল্য শিখিয়েছে। প্রকৃতি এদের বিরূপ ব'লে হাত পা ছেড়ে এরা ঘরের কোণে ব'সে থাকে না। আনন্দের সময় এরা পরিপূর্ণ আনন্দ ভোগ করে কিন্তু কাজের সময় বোঝে শুধু কাজ। শীতকালে রাস্তাপথে গাদাখানিক কাপড়ের বোঝার মধ্যে নিজেদের দেহটাকে কোনোরকমে লুকিয়ে যখন নরনারীদের ছুটতে দেখতাম তখন এদের পোশাক-আবৃত দেহের সৌন্দর্য কি স্বাস্থ্য কিছু চোখে পড়ত না। মুখ দেখতাম বটে, তাতে শ্রীর চিহ্ন তেমন স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠতো না। বরফ-হিম ঠাণ্ডা পানিতে হাত দিলে হাত যেমন জমে যায়, সারা শীতকালময় প্রকৃতি থেকে ইংলণ্ডের ক্ষুদ্রতম প্রাণীটাও তেমনি নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

তার বড় নিদর্শন দেখি এখানকার গাছপালায়। শীতকালে আমাদের দেশের তরুলতা থেকেও পাতা ঝরে কিন্তু সারাদেশ তাই ব'লে একেবারে নিষ্পত্র হয় না। এখানে দেশময় অসংখ্য গাছ মাথা মুড়িয়ে শুক্‌নো দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও একটু পাতা কি কুঁড়ি পর্যন্ত দেখা যায় না। নেড়া মাথার এমন সমারোহ যদি কেউ কোথাও দেখতে চায় তাহলে একবার তাকে আসতে হবে ইংলণ্ডে। ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ধ'রে যখন তুষার বৃষ্টি হতো তখন গাছের নেড়া ডালপালার বরফকণা জমে কি সুন্দর সাদা হয়ে থাকতো; শীতে মরলে কি হবে, তারও যে একটা সৌন্দর্য আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মৃত্যু-হিম ঠাণ্ডার মধ্যে বরফ ছুঁড়ে খেলার দৃশ্য উপভোগ করতাম আর প্রকৃতির সেই তুষার-শুভ্র স্নিগ্ধতায় মন ভ'রে আসতো। এদেশের লোকের যে তাতে কি আনন্দ, তা দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

তিন

আজ ১লা এপ্রিল। রবিবার। এ দিনটি এ দেশের লঘু হাসি-পরিহাসের দিন। দুনিয়াতে ইংরেজ জাত যেমন চুপ থাকতে জানে, তেমনি হাসতেও জানে। পথে, ঘাটে, স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে, দোকানপাটে কিংবা টিউব বাস-ট্রেনে যেখানেই দেখিনা কেন এরা আপন মনে যে যার কাজ ক'রে যাচ্ছে। মনে হয় বিনা প্রয়োজনে এদের কথা বেরোয় না, নিতান্ত জরুরী কথাটা ছাড়া অকারণ বেশী কথা ইচ্ছা করলেও বলতে পারে না।

প্রায় সাত মাস হলো এখানে এসেছি। সাত মাসে দিন গুণে দিন কুড়ির বেশী সূর্যের আলো দেখেছি ব'লে মনে হয় না। সকাল বেলায় যদিও সূর্য ওঠে, কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বাতাসের বেগ প্রবল হয়, ঠাণ্ডার প্রকোপ বাড়তে থাকে। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াতে বেড়াতে জমাট বাঁধে। আকাশ আঁধার হয়ে আসে; ধোঁয়ায় কুয়াশায় আর মেঘের অন্ধকারে সারা লণ্ডন দিনের বেলাটায় ধোঁয়াটে অন্ধকার হয়ে যায়। আমি যে পরিষ্কার সূর্যের দেশের লোক, আমার দেশে সকালে সূর্য উঠে, সারাদিন প্রখর কিরণ ছড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়-পরিষ্কার আলোকিত দিনে মন যে সেখানে প্রফুল্ল থাকে, এই সাত মাস ইংলণ্ডে বাস ক'রে সে কথা ভুলেই যেতে বসেছি।

এই মেঘ, এই ধোঁয়া, এই বৃষ্টি, এই বাতাস, এই কনকনে হাড় ভেদকরা শীত–সবই এদেশের মানুষের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই দিনের বেলাকার গোড়ার দিকে হঠাৎ যখন এরা সূর্যের মুখ দেখে, স্নিগ্ধ রোদে চারিদিক যখন ঝলমল ক'রে ওঠে, তখন এদের চোখে মুখে আনন্দের জ্যোতি উপচে পড়ে। পরিচিতে পরিচিতে তো কথাই নেই–অপরিচিতও অপরিচিতকে পথ চলতে গিয়ে মনের আনন্দের ভাগ দেওয়া নেওয়ার জন্য ডেকে বলে–কেমন সুন্দর দিনটা, না? 'হাউ লাভলী'। তার অনুগামী কি সহগামী তার আনন্দ ভাগ ক'রে ভোগ করবার জন্যে ঠিক তেমনি ভাষায় সাড়া দেয়। কিন্তু আলাপ এদেশের বেশী জমে না। 'ওয়েদারই' এদের আলাপের পুঁজি। সুতরাং পুঁজি ফুরুলে চুপ ক'রে যায়।

এরা যেমন চুপ ক'রে থাকতে, আপনার মধ্যে ডুব মেরে থাকতে ভালোবাসে তেমনি সামান্য কিছু একটা অবলম্বন পেলে প্রাণ খুলে হাসতেও জানে। যে হাসতে জানে, দেখা যায় সে বাঁচতেও জানে। হাসির লহরীতে সব ধুয়ে মুছে যায়। ইংরেজের জাতীয় চরিত্র বড়্ডো পাক-খাওয়া, কূটবুদ্ধির জন্যে এদের নাম আছে। আর ডিপ্লোমেসীর জোরেই এদের মত একটা সংখ্যালঘু জাতও এতকাল ধ'রে দুনিয়াতে প্রভুত্ব ক'রে এলো। কিন্তু এখানে এসে দেখছি ইংরেজ বড়ো কষ্টসহিষ্ণু জাতও। চারিদিকের সাগরের মধ্যে অবস্থিত ইংলণ্ড একটি দ্বীপবিশেষ। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের মতো উঁচু আর তার পরেই সমতল ভূমির মতো নীচু।

এদের দেশে খাদ্যশস্য বড়ো বেশী ফলে না, যা ফলে তাতে এদের কুলোয় না, তাই বিদেশের দিকে সব কিছুর জন্যেই এদের চেয়ে থাকতে হয়। কিছুদিন থেকে দেখছি গোশ্‌ত একেবারে উধাও হয়ে গেছে। আরজেনটিনা, অস্ট্রেলিয়া থেকে এরা মাংস আমদানী করে।

আমাদের মতো টাট্‌কা মাংস এরা খেতে পায় না কি ? বিদেশ থেকে তিন চার মাস আগের হালাল (জবাই) করা গরু, ভেড়া, শূয়োর, খরগোস জাহাজ বোঝাই ক'রে এদেশে আসে। এরা অতি আদরে সেগুলো দোকানে দোকানে ঝুলিয়ে রাখে। আর মাথাপিছু র‍্যাশনে সামান্য একটু যা পায় তাই নিয়ে অতি আনন্দে খায়। দুধ ও দুধজাত জিনিস আসে নিউজিল্যাণ্ড থেকে। ভিন্ন দেশের জিনিসপত্র না হ'লে এদের আদৌ চলে না। তাই ব'লে কি এরা এদের দেশকে কম ভালবাসে ? কত কবি যে এদের আপন দেশের প্রশংসায় মুখর হলেন তা ব'লে শেষ করা যায় না। এদের দেশ সত্যি ভারি সুন্দর। পৃথিবীর সেরা বৃহত্তম নগরী তাও এদেরই দেশ। বৃহত্তম নগরী লণ্ডন আর অসংখ্য সুন্দর সাজানো ছোট গ্রাম আর উঁচুনীচু দিগন্তবিস্তৃত মাঠ নিয়ে সাগরের মাঝখানে গ'ড়ে উঠেছে ইংলণ্ড দ্বীপ। শেক্সপীয়ার তার দেশকে তাই বলেছেন–A precious gem set in the silver sea রূপালী সমুদ্রের মাঝখানে যেন অমূল্য মণির মতো বসানো রয়েছে এই দেশ ইংলণ্ড।

এদের প্রকৃতির এই রুদ্র-কঠোরতার কথা যত ভাবি ততই মনে হয় এ জাতটা বড়্‌ডো কষ্ট সহিষ্ণু আর তেমনি সংগ্রামশীল। রুদ্র প্রকৃতি ও পরিবেশের সংগে সংগ্রাম ক'রে এদেরকে বাঁচতে হয়। তাই মনে হয় কাজের চাপে এরা যেমন অকারণ কথা ব'লে দু'দণ্ড সময় নষ্ট করার সুযোগ পায় না, আলাপ জমানোটা এরা যেমন ভুলেই গেছে, তেমনি কাজের বোঝা হাল্‌কা ক'রে নেবার জন্যে এরা মুখ-খুলে হাসতেও শিখেছে। হাসতে পরো যে কতো বড়ো কলা তা বোঝা যায় এদের দৈনন্দিন ব্যবহারের খুঁটিনাটিতে। এদের আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলায়, সিনেমা-থিয়েটারে, প্যাণ্টোমাইম কি ব্যালেতে যতো না দেখি গম্ভীর ভাবে জীবনকে গ'ড়ে তোলার তাগিদ, তার বেশী দেখা যায় হাসির মারপ্যাঁচ। ঘর ভরা লোক কথায় কথায় হেসে যাচ্ছে। কোন গোলমাল নেই–হৈ চৈ নেই। বিরাট জনতার প্রাণখোলা হাসির হররায় সমস্তটা ঘর যেনো গমগম করছে। দোকানপাটে যাও–বিশেষ করে ছেলেপুলেদের বিভাগে গেলে দেখা যাবে ছেলেমেয়েদের হাসানোর জন্য কত রকমের খেলনার আয়োজন ক'রে রাখা হয়েছে। এমনভাবে এ্যালিস ইন্‌দি ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড, হামটি ডামটি, পিটার পাণ্ডা, হিফটি টিফটি প্রভৃতির গল্প বা ছড়াকে আকার দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দোকানে ঢুকলেই মনে হয় যেন আপনা থেকে কাতুকুতু লাগছে। হাসির আবহাওয়াটাই ছোঁয়াচে।

এই জাতেরই তো পয়লা এপ্রিল। এদের আমোদের দিন। লোককে ঠকিয়ে এমন কি কষ্ট দিয়েও কিভাবে নির্দোষ আমোদ পাওয়া যায় পয়লা এপ্রিল তার প্রতীক। এজন্যে এরা এদিনটাকে বলে 'অল্‌ ফুল্‌স ডে'–বোকা বানাবার দিন। ঠাট্টা ক'রে যাতে আমোদ উপভোগ করা যায় সে জন্য একটা দিন এরা আলাদা ক'রে রেখেছে। তাদের জাতীয় চরিত্রে সহজ আনন্দ পাবার আয়োজনের কথা ভাবলে এটাকে তেমন খাপছাড়া ব'লে মনে হয় না। এ দিনে নানা ভঙ্গীতে এরা রসিকতা করে। যেমন–বন্ধু বন্ধুকে খেতে ডেকে খাওয়ার টেবিলে শুধু হয়তো সুন্দর ক'রে থালাই সাজিয়ে রাখলো। কোন বন্ধুকে হয়তো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করতে ব'লে হয়রান করা হলো। কাউকে সম্মান ক'রে বসাতে

গিয়ে পিছন দিক থেকে তাকে না দেখিয়ে চেয়ার টেনে নেওয়া হলো। এ ধরনের আরো কত কি! এসব দেখে শুনে মনে হয় এরা শুধু হালকা আমোদপ্রিয়ই নয়, রহস্যপ্রিয়ও বটে। এদের আমোদে বুদ্ধির খেলা আছে। শাণিত বুদ্ধির দীপ্তি নিয়ে এদের সঙ্গে তেমনি ভাবে মিশতে পারলে এরা কম খুশী হয় না।

নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসের মতো এখন তিনটা সাড়ে তিনটায় সন্ধ্যা হয় না। সূর্য থাক বা না থাক, সাড়ে সাতটা পর্যন্ত দিনের রেশ থাকে। এমন সময়ে সূর্যের একফালি আলো যখন ঘরে এসে পড়ে তখন আর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় বাইরে বেরিয়ে পথে ঘুরে এই সন্ধ্যা বেলাটা সূর্যের আলোতে আমার দেশের ছোঁয়া নিয়ে আসি। কিন্তু পথে বেরুলেই কি লণ্ডনের কোন কুল পাওয়া যাবে? যত বছর এখানে থাকবো, তার প্রতিটি দিন লন্ডনের একটা করে পথ যদি ঘুরে আসি, তবু এর শেষ হবে না, এর পথঘাটও সব চেনা যাবে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সেরা শহর ছিল কলকাতা। এমন গোটা কয়েক কলকাতা লণ্ডনের পেটে হজম হযে যাবে। আকাশ পথে উড়ে লণ্ডন আসার সময় কোনো এক দেশে পাহাড়-পর্বত মরুভূমি কি মহাসাগর যখন যেটা চোখে পড়ছিল মনে হচ্ছিল তার শেষ নেই। লণ্ডনে এসে সে কথাই বার বার মনে পড়েছে। লণ্ডন যেন প্রাসাদের একটা মহাসমুদ্র। কোথায় যে এর আরম্ভ আর কোথায় যে এর শেষ ম্যাপে দেখা গেলেও লণ্ডনের আমরণ অধিবাসীরাও তা ঠিক ক'রে বলতে পারে না জানেও না। অন্ধকারে হাতড়ে চলার জন্যে মানুষ যেমন দু'একটা আন্দাজ করা চিহ্ন ঠিক ক'রে রাখে আমিও তেমনি মোটামুটি দু'একটা জায়গা মনে মনে ঠিক ক'রে রেখে আর বাকিটা চিনতে পারবো না বলেই এক রকম নিশ্চিত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি। এতে আমার লজ্জার কোন বালাই নেই। খাস লণ্ডনবাসীদেরও ত ঐ দশা।

লণ্ডনের বিরাটত্বই মনকে ঘাবড়ে দেয়। পথে বেরোলে মনে হয় যেন নিজকে হারিয়ে ফেলছি। ফুটপাথে অগণিত জনতার ভিড় আর পথ দিয়ে পিঁপড়ের সারির মতো যানবাহন–সেই কোচ, ট্রাক, টিউব-বাস-ট্যাক্সী। তবু ভাগ্য ভালো–যানবাহনের ধাক্কায় জনস্রোত চাপা পড়ে না। তাদের পথ সুনির্দিষ্ট। শৃঙ্খলা প্রশংসাতীত ভাবে সুন্দর। একটা পথের কিছু দূর যেতে না যেতেই জনতা যেনো ডান বামের পথে কেটে পড়তে পারে তার সুবন্দোবস্ত আছে। মোড় ঘুরবার সময় তো বটেই, তার আগেই গাড়ীগুলো চলতে চলতে পথের মাঝে প্রয়োজন মতো যেনো হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় আর স্তব্ধ গতি গাড়ীর সামনে দিয়ে অপেক্ষমান জনতা যেনো মোড় ঘুরে যায়, সেজন্য রাস্তার মাঝে মাঝে যেমন ষ্ট্যাণ্ড থেকে প্রতি দু'মিনিট অন্তর লাল হলুদ ও সবুজবাতি জ্ব'লে উঠছে, তেমনি পথের বুকে খাঁজ-কাটা জায়গা দিয়েই যেন তারা একপথ ডিঙ্গিয়ে আর একপথে যেতে পারে তার সুন্দর নিদর্শনও আছে।

লালবাতি জ্ব'লে উঠলে গাড়ীগুলোকে সেখানে অবশ্যিই দাঁড়াতে হয়। সবুজ বাতি জ্বললে তারা চলার নির্দেশ পায়। লাল ও সবুজের মধ্যে রং বদলানোর জন্য হলুদবাতি ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে। এদের শৃঙ্খলা যেমন পথে পথে, তেমনি বাড়ীঘরে আর সবার ওপরে পথচারী মানুষের মধ্যে। ছককাটা স্কোয়ারের মধ্যে বাড়ীঘর আর তার চারপাশ দিয়ে

রাস্তা। সবই ছবির মতন। এক রকমের পথ। পথের ধারে এক রকমেরই বাড়ী-দালানের পর দালান একই সঙ্গে এটেন্‌সনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লণ্ডন অতি প্রাচীন শহর। পুরানো ইতিহাসের বয়সের চিহ্ন গায়ে মেখে আর ফ্যাক্টরীর ধোঁয়ায় লণ্ডনের বাড়ীঘরগুলোর রং কালো হয়ে গেছে।

শীতের দেশ। এ কারণে এদের বাড়ীঘরগুলোতে বারান্দা নেই, ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে খোলা হাওয়া উপভোগ ক'রে আমাদের দেশের মতো ঘুমে ঢ'লে পড়বার কোনো আয়োজনও নেই। ঘরের কোনো সৌন্দর্য আছে কি না বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই। আয়োজন ও সাজসজ্জা সবই ঘরের ভেতরে। এদের রুচি কতো মার্জিত এবং শীত থেকে বাঁচবার জন্যে এদের দরিদ্রতম মানুষও প্রয়োজনের তাড়নায় কিভাবে যে ঘর সাজায় তা এখানে এসে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। ঘরের ভেতরের দেওয়ালগুলো সুন্দর মসৃণ ওয়াল পেপার দিয়ে মোড়া। মেঝেতে অবস্থা ও রুচিভেদে দামি কার্পেট পাতা।

ঘরের জানালাগুলো কাঁচের। সে কাঁচও পুরু এবং খুব বড়ো। শীতের ভয়ে জানলা কালেভদ্রে খোলা হয়। খুললেও মানুষ যখন ঘরে না থাকে তখনই জানালা খোলা হয় অক্সিজেন নেবার জন্যে। কাঁচের জানালার সঙ্গে রুচিমতো পর্দা দেখা যাবে সব বাড়ীতেই ঝুলছে।

লণ্ডনের বাড়ী-ঘরের সব চাইতে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো তার মাটির নীচেকার ঘর। লণ্ডনের প্রতি বিন্দু মাটিকে এখানকার লোকেরা কাজে লাগিয়েছে। সব কিছুতেই মাপজোখ করা পরিকল্পনার ছাপ দেখা যায়।

সমস্ত লণ্ডন শহরের মাটির নীচে আছে আর একটি জগৎ। সে জগৎ তার টিউবরেলের জগৎ। সেটা যেমন তার মায়াপুরী তেমনি লণ্ডনের অধিকাংশ বাড়ীর নীচে আছে দু'এক তলা ঘর। মাটির নীচে ঘর নেই এমন বাড়ী তো আজও চোখে পড়লো না। এ জন্যেই মাটির সঙ্গে লাগানো তলাটিকে এরা ফার্ষ্ট ফ্লোর বলে না–বলে গ্রাউণ্ড ফ্লোর। আমাদের যেটা দোতলা সেটা এদের ভাষায় ফার্ষ্ট ফ্লোর। মাটির নীচে বেজমেণ্টে কম পক্ষে একটা তলা এদের থাকেই। ল্যাণ্ডলেডীরা সাধারণতঃ বেজমেণ্টে বাস করে। বেজমেণ্টের ঘর থেকে যেমন সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ঘর গুলোয় আসা যায়, তেমনি বাড়ীর বাইরেও বের হওয়া যায়। বাইরে জগতের সঙ্গে বাড়ীওয়ালাদের দৈনিক জীবনের কারবার হয় এ পথে। আমাদের দেশের লোক হঠাৎ এসে যদি বেজমেণ্টের ঘরেরই প্রথম সাক্ষাৎ পায় তা হ'লে তার মনে প্রশ্ন জাগবে মাটির নীচে মানুষ কি ক'রে জীবন কাটায়। এতদিন পরেও আমি মাঝে মাঝে বিস্মিত হই, মুক্ত বাতাস থেকে এ জাতটি নিজেদেরকে কি ভাবে আড়াল ক'রে রেখেছে। হলোই না হয় শীতের দেশ।

এদের বাড়ীঘর রাস্তাঘাট তৈরীর মধ্যে যেমন একটা পরিণত পরিকল্পনার ছাপ আছে, তেমনি সময় মতো মুক্ত হাওয়া খেয়ে আসার জন্যও শহরের মাঝে মাঝে এরা পার্ক তৈরী ক'রে রেখেছে। পার্কগুলো শহরের প্রাসাদ সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট সবুজ সুন্দর দ্বীপের মতো। বদ্ধঘর ও কর্মশালা থেকে বেরিয়ে সারাটা ইংরেজ জাত এই পার্কগুলোতে প্রাণ

ভ'রে মুক্তি ও আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করে। এজন্যেই শহরের মহল্লার মাঝে মাঝে এমনি ভাবে এত পার্ক লণ্ডনের বুকের মাঝে সবুজের মোহ ছড়িয়ে নগরবাসীদের হাতছানি দিচ্ছে।

লণ্ডন শহরকে নানা অংশে ভাগ করা হয়েছে। এক একটা অংশকে বোরো* বলা হয়। আমাদের যেমন মিউনিসিপ্যালিটি এখানে তেমনি বোরো। প্রত্যেকটি বোরোতেই অনেক পার্ক আছে। পার্কে দেখা যায় নানা রকমের গাছ, ফুলের বাগান, আর সবুজ ঘাস। এ সবের পেছনে প্রচুর খরচ করতে হয়। পার্কের কোন অংশ যেন কেউ নষ্ট না করে কিংবা ঘাসের ওপর দিয়ে যেন না হাঁটে সে জন্যে আইনের সাবধানবাণী ছাপানো রয়েছে। লণ্ডনের সব চেয়ে বড় পার্ক হাইডপার্ক, আর সেন্ট জেমস্ পার্ক। এগুলো এত বড়ো যে, এদের মাঝখানে এসে পৌছলে কর্মমুখর কোলাহল রত লণ্ডন শহরের আওয়াজও কানে এসে পৌছয় না। পার্কগুলোর বাইরে কাজের চাপে সারা লণ্ডন গতিভারে ভেঙে পড়েছে অথচ এদের ভেতরে বিরাজ করছে অনাবিল শান্তি। বাঁধনের মাঝে মুক্তি পাবার অনুরূপ আয়োজন বটে।

শীতে সারা লণ্ডনের গাছপালা নেড়া হয়ে গিয়েছিল। পাতা নেই অথচ ডালপালা মাথায় ক'রে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে, এ যেমন দেখতেও ইচ্ছে করে না, তেমনি অদ্ভূত লাগে। বসন্তকালে এ সব নেড়া গাছে পাতা বেরিয়ে সবুজে সবুজে নাকি কোলাকুলি করবে। হয়তো বা হতেও পারে। তার প্রস্তুতি চলছে এখন থেকে। সেই প্রতীক্ষায় আমি চেয়ে থাকলাম।

চার

বিলেতে এসে দেখলাম এখানকার বড়োদিন; আর দেখলাম পুরাতন বছরকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে বরণ ক'রে নেবার উৎসব। বড়োদিন অর্থাৎ 'Christmas Day'— আমাদের হযরত ঈসা (আঃ)-র জন্মদিন ২৪শে ডিসেম্বর গত হয়ে রাত্রি ১২ টার সময়, তার মানে যে মুহূর্তে ২৫শে ডিসেম্বরের শুভ সূচনা ঠিক সে সময়ে। মানুষের উপকার করতে এসে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে জীবন দান ক'রে গেছেন। তাই বিশেষ ক'রে খৃষ্টান জগৎ আজও তাঁকে স্মরণ ক'রে আসছে। তিনি মানুষের মঙ্গল করতে দুনিয়াতে এসেছিলেন, তাই তাঁর অনুবর্তীরা তাঁর জন্মদিনে উৎসব করে, প্রার্থনা করে তাঁকে স্মরণ করে।

বড়োদিনের বেশ ক'দিন আগে ও পরে ইংরেজ ছেলেমেয়েরা পথে পথে গান গেয়ে বেড়ায়। এ গানকে ইংরেজীতে বলে 'Carol'। এতে পুরুষদের চেয়ে মেয়ে ও শিশুদের উৎসাহ বেশী। মেয়েদের কণ্ঠনিঃসৃত এ গানের সুর ভারী অদ্ভুত। ওদের গানের সুর মোহ জাগায়। সকল দেশের নারীকণ্ঠের কাকলীই কি এক ? আমাদের দেশে গ্রাম অঞ্চলে বিয়ের কনের হলুদ মাখা উপলক্ষে ক'নের বাড়ীতে মেয়েরা দল বেঁধে গান গায়। আর ধান ভানার

* (borough (<ME. burgh <OE. burg) [সংযোজন]

সময়ে তাদের পাদপদ্ম যখন ঢেঁকির পিঠে পড়ে সে সময়ে ঢেঁকির উঠানামার তালে তালে তাদের গলার চিকন সুন্দর তানলয়ও ওঠানামা করে। আত্মীয়হীন প্রবাসে 'Community Carol' এর বিচিত্র সুর শুনতে শুনতে মনে প'ড়ে যায় আমাদের দেশের মেয়েদের সমবেত কণ্ঠের সেই গানের কথা।

২৪শে তারিখে প্রত্যেক অঞ্চলের স্থান বিশেষে এতো হাসি আর এতো গান সবই আনন্দের সাগর-সঙ্গমে মিলে যায়। লণ্ডনের সে রকম স্থান ট্রাফালগার স্কোয়ার। ২৪শে তারিখে সন্ধ্যার পর থেকেই ট্রাফালগার স্কোয়ারে নেলসনের কলামের নীচে এসে অগণিত ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী পুরুষ যীশুর উদ্দেশ্যে গান গায় আর আমোদ করে। একটা গোটা জাত যীশুর নামে কিভাবে সহজ আনন্দে ভেসে যায়, ২৪শে ডিসেম্বরের রাত্রে ইংরেজ নরনারীর এই উদ্দাম নাচ গান না দেখলে বুঝা যায় না। এদের এই হাসি, এই গান, আনন্দের বন্যা, একি ধর্মের জন্যে ? ধর্মের স্রষ্টা আত্মদান ক'রে পৃথিবীতে এক একটা বিরাট জাতির সৃষ্টি ক'রে গেছেন। সে জাতি তাঁর জন্মদিন স্মরণ ক'রে নিজের বেঁচে থাকার আনন্দ ঘোষণা করছে জাতীয় জীবনের উৎসব লহরীর ভেতর দিয়ে। মনে হচ্ছে ইংরেজ জাত ধর্মকে উৎসবে পরিণত করেছে। ইংরেজ নরনারীর সমবেত ক্যারলের সুর শীতার্ত ট্রাফালগার স্কোয়ারের বুক ভেদ ক'রে সমগ্র ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছে। শব্দ শুনলাম, স্বরও শুনলাম। সবটা বুঝলাম না। গানের কলির ধুয়াটুকু বারে বারে কানের কাছে ফিরে ফিরে এলো—
'Oh, Come, let us adore Him, Christ the Lord!'

বড়োদিন এদের উৎসবের দিন। আমাদের ঈদের দিনের মতো আনন্দের দিন। এ দিনটিতে হোটেল, রেস্তোঁরা প্রায়ই বন্ধ তাকে। আর এ দিনেই বাড়ীতে বাড়ীতে খানার আয়োজন হয়। সতর্ক না হ'লে বা এদেশের নিয়মকানুন জানা না থাকলে এ দিনটিতে খাবার উৎসবানন্দের মধ্যেও খাবারের দোকানপাট বন্ধ থাকে ব'লে শেষটায় উপোস ক'রে কাটাতে হয়। লণ্ডনে নবাগতদের প্রথম ক্রিস্‌মাস যদি কারও উপোসে কাটে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

এদিনের ভোজ উপলক্ষে বাড়ীর ভেতরটা নানা রঙিন কাগজের কারুকাজে সাজানো হয়। আসল বা নকল এটা 'ক্রিস্‌মাস ট্রি' বাড়ীতে দিন কতকের জন্যে ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে আনা হয়। ঘরের ভেতরের ছাদে ও আশে-পাশে ঝুলে মিসিল্‌টো গাছের লতা। এ লতা যেমন শোভা বাড়ায় তেমনি মধুরেণ সমাপয়েতের ইঙ্গিত বহন করে। মিসিল্‌টো লতা নিয়ে নরনারীর কৌতুকানন্দ ওদের এ উৎসবের অঙ্গীভূত 'fun'। হিন্দুরা যেমন পূজোমণ্ডপে কলস ও কলাগাছ পুঁতে মন্ত্রের সাহায্যে উদ্দিষ্ট দেবদেবীর আবাহন করে, তেমনি এদের ঐ 'ক্রিস্‌মাস ট্রি' মঙ্গলের স্মরণ চিহ্ন। তাছাড়া এ গাছটির ডালপালায় ও ঝোপেঝাড়ে গৃহকর্তার দিক থেকে বাড়ীর ছেলেপুলে ও অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে কাগজের আবরণে নানা উপহার টাঙানো থাকে। আহার শেষে এ উপহারও বাটা হয়। বড়োদিন থেকে বারো দিনের দিন অর্থাৎ ৬ই জানুয়ারীতে এ গাছটি বাড়ী থেকে সরিয়ে ফেলতে হয়। নইলে প্রচলিত বিশ্বাস মতে বাড়ীর হয় অমঙ্গল।

পোলাও কোরমা আর সেমাই-এর আয়োজন ছাড়া আমাদের যেমন ঈদ হয় না,

তেমনি বড়োদিনে এদের ভোজের প্রধান অঙ্গ রোষ্ট টার্কি, ক্রিস্‌মাস পুডিং আর ক্রিস্‌মাস কেক। টার্কি ছাড়া বড়োদিনের ভোজ এদের জমে না। নিতান্ত গরীবের ঘরেও টার্কি চাই। দিনের বেলায় দুপুরেই এদের 'Christmas Dinner' হয়। সে ডিনারে ছেলেমেয়ে ও নিমন্ত্রিত অতিথি সহ খোদ গৃহকর্তা আর গৃহকর্ত্রী সকলেই এক টেবিলে ব'সে খায়। শুধু খাওয়াই নয়, খেতে ব'সেও সকলেই যেন বিমল আনন্দ পেতে পারে তার জন্যে নানারকমের রঙিন কাগজের মধ্যে সযত্নে বাঁধা উপহার লুকানো থাকে—টেবিলের প্রত্যেকের জন্যই। কেউ জানে না কার ভাগ্যে কি আছে। পাশাপাশি বা সামনাসামনি খেতে ব'সে দু'জনে কাগজের পুরিয়া টানাটানি করলো। দ্রাম ক'রে ফুটে উঠলো সেটি, আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ছোট্ট একটা চিরুণী, কি কুকুর, কি হরিণের বাচ্চা, কি বোতাম, কি এমন ধরনের সাত-পাঁচ আরও কত কি। এতেও কিছু হাসির খোরাক আছে। পেটের খোরাকের সঙ্গে মনেরও তো খোরাক কিছু চাই।

মনের খোরাককে কেন্দ্র করেই এরা নিতান্ত ব্যক্তিগত কিংবা সাধারণভাবে 'ক্রিস্‌মাস পার্টি' করে। ক্রিস্‌মাস ডিনারটি হয় ২৫তারিখে, কিন্তু 'পার্টি' ২৫শে ডিসেম্বরের আগে যে কোনও দিনে। ব্যক্তিগত ঘরবাড়ীতে তো হয়ই, তার ওপরে হয় স্কুল কলেজে, হোষ্টেলে ও ক্লাবগুলোতে। এতে থাকে বল্‌ডান্সের, পানাহারের এবং নানা রকম খেলার আয়োজন। আমরা 'কনট হল' ব'লে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আন্তর্জাতিক হোষ্টেলে থাকতাম। এ হল্‌টিতে এবং 'Friends centre'-এ বড়োদিন উপলক্ষে অনেকগুলো পার্টি দেখলাম। সব পার্টিই মোটামুটি এক ধরনের।

কনট হলের পার্টির কথা বলছি। সাতই ডিসেম্বর রাত্রে এ পার্টির দিন ধার্য হলো। এ হলে থাকতো নানা জাতের আশি জন ছেলে। আশিজন ছেলের আশিটি সঙ্গিনী চাই— এ উদ্দেশ্যে ইউনিভার্সিটি মেয়েদের বিভিন্ন হোষ্টেল থেকে আশিটি মেয়েকে নেমন্তন্ন ক'রে আনা হলো। মদ এলো তিন পিপা, সঙ্গে এলো নানা রকমের কেক ও খাবার। কোন্ ছেলে কোন্ মেয়েটির পার্টনার হবে তা ঠিক করা হলো এক এক জোড়া নাম ঠিক ক'রে দিয়ে। যেমন 'জ্যাক' আর 'জি'ল; 'প্রিন্স আলীখান' আর 'রীটা'; 'চার্লি' আর 'ক্লেয়ারব্লুম' এবং এ ধরনের আরও। উৎসবের রাত্রে নির্ধারিত সময়ে ছেলেরা নাম বদল ক'রে তাদের নতুন নামের টিকেট বুকে এঁটে ঘরের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। অতিথিরা একে একে আসছে আর প্রত্যেকের হাতেই তাদের নিজ নিজ নকল নাম দেওয়া হচ্ছে। প্রথম আমোদ হলো পার্টনার খোঁজাখুজি নিয়ে। মনে পড়ছে একটি তুর্কী ছেলে, 'ওরহান জিহ্‌নী'র কথা। সেক্রেটারীর সঙ্গে ছিল তার খুব ভাব। তাঁকে বলে কয়ে সে বুকে আঁটলো প্রিন্স আলীখান-এর নাম। বেচারী ভেবেছিল, যে রীটা হবে, সে যে সুন্দরী হবে তা অবধারিত। কিন্তু লটারী মতে ৬ ফিট উঁচু বকের মতো সরু গলার কিম্ভুতকিমাকার নকল রীটাকে দেখে বেচারা 'জিহ্‌নী'র উৎসাহ এমন ভাবেই উবে গেলো যে, ক্ষোভে, অভিমানে সে তার নকল নামটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেদের মধ্যেই গা ঢাকা দিলো। আর রীটা! তার পার্টনারকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে বেচারী একাই রইলো দাঁড়িয়ে।

পার্টিতে খাওয়া-দাওয়া হলো। তারপর শুরু হলো নানা রকম খেলা। কয়েকটি জুড়ি

মিলে অনেকগুলো ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেলো। এক একটি দলের প্রত্যেকেই নিজের হাত থেকে অপরের হাতে একটা বল দ্রুত পাস ক'রে দিতে লাগলো। ওধারে বাজছে গীটার। মাঝে মাঝে বাজনা থেমে যাচ্ছে। এ বাজনা থামার সময় দলের যার হাতে বলটা থাকবে তাকে দল থেকে বের হয়ে এসে দলের আর সকলকে হাসানোর জন্যে একটা কিছু করতে হবে। আমাদের দলে আর্জেনটিনার বাগুক ব'লে একটা ছেলে ছিলো। বলটা তার হাতে পড়তে না পড়তে হঠাৎ বাজনা থেমে গেলো। সে তখন দল থেকে বেরিয়ে এসে 'God save our gracious King' উল্টো ক'রে গাওয়া শুরু করলো—'King gracious our save God'. হাসির একটি রোল প'ড়ে গেল।

আর একটি খেলার উল্লেখ করতে হয়। ঘরের মধ্যে আগে পরে প্রত্যেকের পার্টনার নিয়ে একটা 'লাইনে কুড়ি জন ক'রে চারটি লাইন ক'রে দাঁড়ালো। চার লাইনের জন্যে চারটি ছোট ছোট কমলা আনা হলো। যে দল সবার আগে লাইনের প্রথম জনের কাছ থেকে কমলাটি হাতে না ছুঁয়ে মুখ থেকে মুখে নিয়ে শেষের জনের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে, সে দল হবে ফার্স্ট। এ খেলার মধ্যে যেমন আছে উৎসাহ ও উদ্দীপনা, তেমনি শালীনতা বজায় রেখে ছেলেমেয়েদের দু'তরফ থেকেই যৌবনাবেগ প্রকাশের একটা ব্যগ্র ব্যাকুলতা।

২৪শে ডিসেম্বর এদের মূল উৎসবের দিন। এই একটি দিনের জন্যে গত তিন মাস ধ'রে সারা লণ্ডনে প্রস্তুতির পালা দেখলাম। মনে হচ্ছে এরা উৎসব করতে জানে আর উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার অধিকার এদেরই আছে। পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গার ওপরে যে জাত এতোদিন ধ'রে রাজত্ব করেছে এবং এখনও করছে, সে ইংরেজ জাতের বিরাটত্বের কিছু কিছু পরিচয় পাচ্ছি। এদের জাতীয় উৎসবের মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্বের, গাম্ভীর্যের ও লঘু পরিহাসরসিকতার ছাপ রয়ে গেছে। উৎসবের ঠিক দিনটিতে দূর থেকে হলেও যাতে বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের স্মরণ করা যায় তার জন্যে ক্রিস্‌মাস কার্ড পাঠানোর রেওয়াজ এখানে আছে। এক পেনি থেকে এক পাউণ্ড দামের কার্ডও দেখলাম। সে কার্ডে কতো রকম কবিতা লেখা আর কতোভাবে তা সাজানো।যে যেমন কার্ড কিনতে চায় ঠিক তেমনটিই সে পাবে এবং আপন প্রিয়জনকে তেমন কার্ডই এ শুভদিনের স্মরণে দিতে পারবে। আমরা নিতান্ত বাঙালী, খেতে পরতে পারলেই আমরা খুশী, উৎসবের দিনে মনের অতিরিক্ত খুশী সঞ্চারের আয়োজনের দিকে আমাদের ততো নজরই বা কোথায়? তাই এদের ক্রিস্‌মাস কার্ডের ব্যাপারটা প্রথমে তেমন ভাবতে পারিনি। ২৪/২৫শে ডিসেম্বর যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো, ততোই দেখতে পেলাম পোষ্ট অফিসের লোকদের আর বিরাম নেই। কার্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে কতো লোকের যে সপ্তাহ খানিকের চাকুরী হলো তা কানে শুনলাম এবং চোখেও দেখলাম। পোষ্ট অফিসগুলো লণ্ডন শহরের অনেকগুলো ব্যক্তিগত গাড়ীই কার্ড বিলির জন্যে ভাড়া ক'রে নিলো। রবিবারে লণ্ডনে কোনো ডাক বিলি হয় না, কিন্তু ক্রিস্‌মাসের কার্ড রবিবারেও বিলি হ'লো। পরের দিন বি, বি, সি'র ঘোষণা থেকে জানা গেলো এবারের বড়োদিনে সমগ্র ইংলণ্ডে ৫৬০ মিলিয়ন অর্থাৎ ছাপ্পান্ন কোটি কার্ড বিলি হয়েছে। শুনে তো অবাক হয়ে গেলাম। অবাক হবার কথাই বটে। ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা

পাঁচ কোটির মতো, আর কার্ড বিলি হলো ছাপ্পান্ন কোটি; প্রত্যেকটি লোকই গড়ে এগারটা থেকে বারোটা কার্ড পেয়েছে ধরা যেতে পারে। বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে যে, এতে মনের আনন্দের খোরাক ত মিটেছেই তার ওপরে কতো ভাবে কতো লোকের আয়ের পথ খুলে গেছে। কার্ড যারা তৈরী করেছে, যারা কার্ডে লিখেছে এদের আয়টাও কম হয়নি। আর সবার ওপরে আছে গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বা আয়ের প্রশ্ন। এক একটা কার্ড পাঠাতে বড়োজোর এক কি দু'পেনি খরচ লাগে, যে পাঠায় তার গায়ে লাগে না, কিন্তু এক দুই ক'রে এই ছাপ্পান্ন কোটি কার্ডে সরকারের ঘরে কত রাজস্ব এলো হিসেব করলে বেশ একটা মোটা অঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে খাম পোষ্টকার্ডের দাম বাড়িয়ে চলেছেন, তার ফল হয় এই যে, নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ লেখে না। জাতীয় জীবনের আনন্দের আয়োজনও গভর্ণমেণ্টের আয় কি ভাবে বাড়িয়ে দেয় ইংলণ্ড তার বড়ো দৃষ্টান্ত।

এরা উৎসবে কিভাবে খরচ করে তার একটা নমুনা দিই। বড়োদিন উপলক্ষে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলো থেকে টাকা উঠানো হয়েছে উক্ত সপ্তাহের হিসেব মতো ৭৮ মিলিয়ন পাউণ্ড, আমাদের দেশী হিসেবে মোটামুটি আটাত্তর কোটি টাকা। এ ছাড়া ব্যাঙ্ক থেকে না উঠিয়ে ব্যক্তিগত ব্যয়ও আছে। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র প্রদেশের এক বছরের রাজস্বখাতে আয় যেখানে প্রায় ৩৩/৩৪ কোটি টাকা, সেখানে এক সপ্তাহেই ইংলণ্ডের উৎসবের বেসরকারী খরচ আনুমানিক দশ কোটি টাকা। এদের টাকা আছে বোঝা গেলো আর এরা খরচ করতে জানে।

যে জাত সাধারণভাবে তার শিশু সন্তানের দিকে এতো লক্ষ্য রাখে, উৎসবের আনন্দের ভাগ তারাও যেন পায় এ কথা কি সে জাত ভুলতে পারে? এক কথায় বলতে গেলে উৎসব তো শিশুদেরই। তাদের আনন্দেই তো পিতামাতার আনন্দ। এখানে পৃথিবীর সব মানুষ এবং সব জাতের লোকই বোধ হয় সমান। ইংরেজ পিতামাতা তাদের শিশুদের আনন্দ দেবার জন্যে এ বিষয়ে আর একটু এগিয়েছে। শান্তাক্লজ ব'লে এদের বড়োদিনের একজন পুরোহিত ছিলেন। হাতেম তাই'র মতো তিনি ছিলেন দাতা। ছেলেমেয়েদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। তাদের প্রয়োজন মতো তাদের নানা উপহার দিয়ে বেড়াতেন। সে বহুকাল আগের কথা তিনি তো গুজ়রে গেলেন, কিন্তু খৃষ্টান জগতের ছেলেমেয়েরা তাকে ভুললো না। এখনও তারা মনে করে শান্তাক্লজ সব খৃষ্টান সন্তানের Father Christmas; তাই তিনি প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের বড়োদিনের উপহার দিয়ে বেড়ান। ইংলণ্ড শীতের দেশ। প্রত্যেক ঘরেই দেয়ালের সঙ্গে শীত নিবারণের জন্য আগুন জ্বালবার জায়গা আছে। আগেই বলেছি, ইংরেজিতে সেটাকে বলে Fire place। আর ফায়ার প্লেসের উপরে কানেস্তারাকে বলে Mantelpiece। ছেলেমেয়েরা কি উপহার চায় তা একটা কাগজে লিখে তারা মোজায় কিংবা টুপিতে রেখে কানেস্তারায় ঝুলিয়ে রাখে। শিশুদের মা বাবারা যে বুদ্ধিমান লোক তা বেশ বোঝা যায়। ছেলেমেয়েদের অর্ডার মোতাবেক জিনিস

এনে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে গেলে গভীর রাতে তাদের অজ্ঞাতে ঐ টুপি মোজা বা অন্য কোনও জিনিসে ঘরের কোথাও ঝলিয়ে রাখে। ঘুম থেকে উঠে ২৫শে তারিখ সকালে শিশুরা সে উপহার পেয়ে কি যে খুশী হয়! নতুন কাপড় বা বই পাওয়ার আনন্দ থেকে তা কোন অংশে কম নয়। এখানকার শিশুদের আনন্দের একটা বাড়তি কারণ, তারা মনে মনে বিশ্বাস করে তাদের ফরমাইসের কাগজটা ম্যানটেলপিসের ফাঁক দিয়ে চিলেকোঠার ভেতর দিয়ে ফাদার ক্রিস্‌মাসের কাছে পৌচেছে আর ফাদার ক্রিস্‌মাস তাদের জন্যে উপহার রেখে গেছেন।

ছেলেমেয়েদের ভোলানোর জন্যে দোকানে দোকানে সাদা লম্বা দাড়ি লাগিয়ে, আর ঝোলা আলখাল্লা ও লালটুপি প'রে এক একজন লোক নকল শান্তাক্রুজ সাজে। ছেলেমেয়েরা তার কাছে গিয়ে অত্যন্ত সস্তায় তাদের খেলার জিনিস কেনে। ছোট ছেলেমেয়েদের সরল বিশ্বাস এই বিশ্বাসের বলেই ওরা বুঝি অতটা নির্মল আনন্দ পায়।

এ সম্পর্কে এখানকার সাপ্তাহিক "The New Statesman and Nation" পত্রিকায় একটি গল্প পড়লাম। কচি বাচ্চাদের মনে শান্তাক্রুজের ব্যাপারটা কত সহজ ভাবে রেখাপাত করে তার সুন্দর ইংগিত আছে গল্পটির মধ্যে। আমেরিকা থেকে একটি পরিবার বড়োদিনে লণ্ডনে বেড়াতে এসেছে। পরিবার বলতে মা, বাবা এবং দুটি কচি বাচ্চা। আমেরিকার লোকেরাও খৃষ্টান। তারাও বড়োদিনে শিশু জগতের শান্তাক্রুজে বিশ্বাস করে। তাদের ছেলেমেয়েদের মনও সেইভাবে তৈরী। পরিবারটি লণ্ডনের একটি হোটেলে বাস করছে। ২৩শে ডিসেম্বর এলো। বাচ্চা দুটো মা বাবাকে প্রশ্ন করছে, 'আমরা তো বাড়ী থেকে অনেক দূরে এসে গেছি, শান্তা কেমন ক'রে এখানে আসবে বাবা ? ওর উপহার তাহলে এবার আমরা আর পাবো না'। মা বাবা তাদের যথারীতি বোঝালেন। ২৫শে ডিসেম্বর ভোরে উঠে বাচ্চারা দেখলো, ম্যান্টেলপিসের ওপরে তাদের ফাদার ক্রিস্‌মাস শান্তাক্রুজের উপহার। কি খুশীই যে হলো তারা! এত সহজে শিশুমনে বিশ্বাস জন্মে ব'লে বিশ্বাস ক'রেও তারা আনন্দ পায়। তাইতো ইংরেজ কবি গ্রে একদিন শিশুদের লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন, 'where ignorance is bliss it is folly to be wise'। শিশুদের একটু বুদ্ধি হ'লে ফাদার ক্রিস্‌মাস শান্তাক্রুজের পৌরোহিত্য ও উপহার দেবার কথা ওরাই যে কিভাবে হেসে উড়িয়ে দিতে চায় এ কবিতাংশটুকুতে তার মনোজ্ঞ পরিচয় পাওয়া যাবে–

My daddy's dressing up as Father Christmas
With presents for the stocking and the tree.
I know he is, beause he is, always Santa Claus,
And it used to take me in, when I was three.
I did believe in fairies and in Santa.
But definitely stopped when I was four;
It is n't that I won't, but simply that I don't
Any more.

When mummies shop to make merry Christmas
It's up to kiddies all to play the game
I would not be the one to spoil the parents' fun,
and my little baby sister says the same.
The parents think we still believe in fairies
But we have heard and seen an awful lot
They think that games and holly and things will make us
jolly, well, we are not.

When daddy's dressing up as Father Christmas.
When grown-up are enjoying Christmas fun
It makes the Children glad to think that mum and dad
Have not the least idea what's going on—
We want to be good democratic kiddies
My baby sister loves the common cause
But sometimes, she and I confess we wonder why
Grown-ups can still believe in Santa Claus.

শিশুদের জন্যে যেমন বড়োদের জন্যেও তেমনি শান্তা বড়োদিনের উৎসবে আনন্দ যোগায়। ফাদার ক্রিস্‌মাস ইংরেজ জাতের এ উৎসবে হাল্কা কৌতুকের অংশ বিশেষ। তাই দেখা যায় বড়োদিনের শুরু থেকে নতুন বছরের প্রথম মুহূর্ত পর্যন্ত বহু লোক জুব্বা-জুব্বি পরে লম্বা গোঁফ লাগিয়ে নকল শান্তাক্লজ সেজেছে। ২৩/২৪শে ডিসেম্বরের রাত্রে লণ্ডনের ছবির দোকানগুলো থেকে ভিন্ন ভিন্ন দল একজনকে নকল শান্তা সাজিয়ে ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ার, পিকাডিলি সারকাস প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। দেখলাম, এদিনের আনন্দ স্থায়ী ক'রে রাখবার জন্যে নকল শান্তার সঙ্গে প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে বহুলোকই ছবি তুলছে। এতে আনন্দ ও অর্থার্জনের পথ খুলে গেছে। ইংরেজ জাত হিসেবীও কম নয়। আনন্দের মধ্যেও তারা ব্যবসায়ের আয়োজন ক'রে রাখে।

"ক্রিস্‌মাস ইভ" উপলক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে নরওয়ে প্রতি বছর লণ্ডনকে একটা প্রকাণ্ড 'ক্রিসমাসট্রি' উপহার দিয়ে আসছে। লণ্ডনবাসীরা এটাকে পোঁতে ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারে, আর ওর পাতার ফাঁকে ফাঁকে রঙ-বেরঙয়ের আলো দিয়ে ওটাকে অপরূপ মনোহর ক'রে তোলে। পাশে পানির ফোয়ারাগুলো থেকে পানি হাত পঞ্চাশেক উঁচুতে উঠে ঝরণাধারার মতো আবার নীচুতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ ফোয়ারা ও ক্রিস্‌মাসট্রির চারপাশে ক্রিস্‌মাস ও নতুন বছর উপলক্ষে ইংরেজ নরনারী ছেলেবুড়ো সকলেই আনন্দোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করে। আর এর ছবি টেলিভিশনে দেখে সারা ইংলণ্ডের লোক।

ক্রিস্‌মাসে দেশটা সত্যিই মেতে উঠে। তার প্রতি ধমনীতে রক্তের তেজ ও উত্তেজনা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সিনেমা, সারকাস, থিয়েটার, প্যান্টোমাইম (কথা না ব'লে অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে গল্প ইত্যাদি কৌতুকাভিনয়), ব্যালে (নাচের সাহায্যে অভিনয়) কত কিসের যে হাট বসে তা ব'লে শেষ করা যায় না। প্রতিটির মধ্যেই বড়ো ও বুড়োদের জন্যে তো আছেই শিশুদের জন্যেও বিশেষ বন্দোবস্ত রয়েছে। প্যান্টোমাইম গুলোতেই শিশুরা বেশী আনন্দ পায়। কাজেই সেখানে তারাই ভিড় করে বেশী। বড়োদিনে একটা সারকাস দেখলাম– বাট্‌রামমিলস্‌ সারকাস। এরকম সারকাস ছোটবেলায় আমাদের দেশে ঢাকা ও রাজশাহীতে দেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য ঠেক্‌লো এদের অত্যদ্ভুত-স্বাভাবিকত্ব। ৬০/৭০ হাত উঁচুতে লোহার একটি রডের উপরে স্ত্রী-পুরুষে মিলে অবাধে এবং অত্যন্ত সহজে এরা হাতে ব্যালেন্সের খেলা দেখাচ্ছে। অপূর্ব সাধনা! সারকাসের মধ্যেও পাশেই শিশুজগতের আনন্দের আয়োজন 'fun fair' বা 'মজার মেলা।' আমাদের দেশে এ ধরনের মেলায় নাগরদোলা দেখেছি। কিন্তু এ নাগরদোলা যে কত উঁচু না দেখলে ধারণা করা যায় না। ছেলে বুড়ো সকলেই দু'তিন পেনি দিয়ে নাগরদোলায় বসছে। কল টিপলেই আনন্দ পিপাসুরা সমান ব্যালান্সে উপরে উঠছে, নীচে নামছে।

নিজের পয়সায় মোটরকার, রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ কিনবার ক্ষমতা ক'জনেরই বা থাকে। মজার মেলায় তিন থেকে ছ' পেনিতে নির্দিষ্ট একটা সীমার লাইনের মধ্যে শিশুরা দিব্যি এ আনন্দ উপভোগ করছে। সবই যন্ত্র ও পয়সার কারবার। পয়সা দাও আর কলটি টেপো তাহলে মাটি থেকে কত উপরে যে উঠা যাবে তা খোদাই জানেন। পক্ষিরাজ-ঘোড়ায় চ'ড়ে রূপকথার রাজপুত্রেরা সাত সাগর পাড়ি দেয়। মজার মেলায় এসে পয়সা থাকলেই সে নায়ক হবার স্বাদ পাওয়া যায়। সুতরাং কি আনন্দ! কলের ঘোড়া (কাঠের যদিও বা) রেস খেলছে। কলের কুকুর দৌড়াচ্ছে। কাঠের পুতুল (এখানকার হাস্যকৌতুকের পরিভাষায়– হামটিডামটি, পাণ্ডা ইত্যাদি) ওরাও বাজি জিতে দিচ্ছে। তাতে খাবার জিনিস–নানাজাতীয় চকলেটও পাওয়া যায়। এই মজার মেলায় আমি এবং সাজ্জাদ সাহেব (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ) এক জায়গায় গিয়ে ছ' পেনি দিয়ে একটা বোর্ডের মাঝখানে কতকগুলো ঘর লক্ষ্য ক'রে ছোট ছোট তীর ছুঁড়লাম। চল্লিশের বেশী পয়েন্ট হলো না। একটা চাবি রাখবার আংটি উপহার পেলাম। আর এক জায়গায় একটা বড়ো টাইমপিস লক্ষ্য ক'রে কতকগুলো কাঠের গোল রিং ছুঁড়লাম। ঘড়িটা সাজানো ছিল ছোট্ট একটা চৌকোণো উঁচু কাঠের ওপর। রিংটা ঘড়িটার ভেতর দিয়ে এসে কোথাও না ঠেকে মেঝের উপরে পড়লে আমাদের জয় হতো। কিন্তু এমন কায়দায় তা সাজানো যে, ঘড়িটার ভেতরে গিয়ে পড়লেই নীচের কাঠের কোনো এক কোণায় বেধে উপরে আটকে যেতে লাগলো–কিছুতেই নীচে নামলো না। এক শিলিং-এ আটবার ছুঁড়ে শিলিংটা হারলাম। একটা অভিজ্ঞতা হলো। কিছুক্ষণ ঘুরে আবার সেখানে এলাম; কে এক ভদ্রলোক ঘড়িটা জিতে গেছে। ঘড়িওয়ালাকে এবারে একটু বিমর্ষ দেখলাম।

২৬শে ডিসেম্বর 'Boxing Day'। এ নামটি বিদেশীদের বড়্‌ডো ভুল বুঝবার সুযোগ দেয়। মনে হ'তে পারে এ দিনটিকে ইংরেজরা বুঝি 'Boxing' খেলার জন্য ঠিক ক'রে

রেখেছে। কিন্তু তা নয়। বড়োদিনে ইংলণ্ডকে উৎসব মুখর ক'রে তোলবার জন্য পিওন, দুধওয়ালা প্রভৃতি মানুষেরা কম পরিশ্রম করে না। প্রত্যেক বাড়ীর উৎসবে পরোক্ষভাবে এরাও সহায়তা করে। দেশ বিদেশ থেকে প্রতি বাড়ীতেই প্রত্যেকের মনোরঞ্জনের জন্যে কত ক্রিস্‌মাস কার্ডও যে পিওনেরা বয়ে নিয়ে আসে সে কথা স্মরণ ক'রে এদেরকে কিছু কিছু বখ্‌শিশ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাক্সে ফেলা হোক বা না হোক এ উদ্দেশ্যে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই কিছু কিছু পয়সা জমা করা হয়। যার যা দেবার সে তা দেয় কোনো থালা কিংবা বাক্সে। পিওনেরা আসে প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে এ দিনে দাবীর পাওনা আদায় করতে নয়, প্রত্যেকের আনন্দের ভাগে সহায়তা করছে ব'লে তাদের সকৃতজ্ঞ দান গ্রহণ করতে।

এক দুই ক'রে ২৫শে ডিসেম্বর থেকে এলো ৩১ ডিসেম্বর। ৩১ ডিসেম্বর ইংরেজ জাতের নাচের দিন। নাচ আর নাচ। নেচে নেচে হেসে খেলে এরা পুরানো বছরকে বিদায় দেবে। যেদিকে দেখি ইংরেজ নরনারীর মুখে শুধু হাসি। এদের ব্যক্তিগত জীবনে যে কারও দুঃখ নেই এমনতো হ'তে পারে না। ব্যথা, বেদনা, আঘাত, নৈরাশ্য মানব জীবনে সাধারণ কথা। আশা পূর্ণ হ'লে মানুষ হাসে, আনন্দ করে, গান গায়, তার প্রকাশ করে আত্মীয় বন্ধু নিয়ে খেয়ে দেয়ে। দুঃখ মানুষের একার। বিফলতা আসে মানুষের একক জীবনে। সে বেদনায় মুষড়ে পড়ে একা একা, তাতে বেদনার আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে মুখ ভার ক'রে থেকে সকলকে জানতে দিয়ে কি লাভ? ইংরেজ জাত মনে হয় তা ভালই বোঝে। এরা তাই ব্যক্তিগত দুঃখ ঢেকে রেখে, জাতীয় জীবনে আনন্দের তরঙ্গ তুলতে জানে।

দেখলাম ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রিতে সারা লণ্ডন নাচছে। পথে ঘাটে চল্‌তে চল্‌তে নাচ। দু'চারজন একত্রিত হলেই নাচ। পিকাডিলি সারকাস, ট্র্যাফাল্‌গার স্কোয়ার প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়ানো জায়গাগুলোতে পুরানো বছর বিদায় দিয়ে নতুন বছরের বরণোৎসবের নব নব আয়োজন করা হয়েছে। এ উৎসব দেখবার জন্যে বেরোলাম। ঠাণ্ডায় আমরা জ'মে যাচ্ছি। ভাগ্য ভালো, দিন দুই তুষার বৃষ্টি হয়নি। দেখলাম অগণিত লোক জমায়েত হয়েছে—সব বয়সের, সব শ্রেণীর এবং পৃথিবীর অধিকাংশ জাতের। রাত্রি ৯টা থেকে এখানে সেখানে দুটো একটা দলের নাচ শুরু হলো। বারোটার কিছু আগে দেখি হাজার হাজার নরনারী জড়াজড়ি করে, নাচে, ঢলাঢলি করে আর গায়। এ বছর তো ভালই কাটলো, দুনিয়াব্যাপী সমরায়োজনের হুমকীর মধ্যে আজ থেকে যে বছরের শুরু হলো সকলেরই অন্তিম ইচ্ছা যেন সেটাও ভালো কাটে! তাই নরনারী যে যাকে ধ'রে বলছে, Happy New Year!

এ নাচ, এ গান, এ হাসি, এ উল্লাস, সবই এ জাতের বেঁচে থাকার আনন্দঘন প্রকাশ। জীবনে যে সুদীর্ঘ ৩৬৫ দিন উপভোগ করা গেল, সে জীর্ণ পুরাতন বছরকে ধ'রে রাখা যাবে না, তার ক্লান্তি ও অবসাদের মধ্যে প'ড়ে থেকে লাভও নেই। তাকে হেসে খেলেই বিদায় দাও। আবার যে আসছে সমান আদরে তার অভিষেক করো। জীবনের প্রতি এ অদ্ভুত দৃষ্টিভংগী থেকেই মনে হয় ইংরেজ জাতি বর্ষ-বিদায় ও বর্ষ-বরণের এ আনন্দোৎসব পালন ক'রে আসছে।

পার্লামেণ্ট হাউসের উপরের বিগবেন ঘড়িতে ঢন্ ঢন্ ক'রে এক দুই ক'রে বাজল রাত বারোটা। বি, বি, সি থেকে বিগবেনের এ আওয়াজ দুনিয়াতে প্রচারিত হলো। অসংখ্য নরনারীর সঙ্গে ১৯৫০ সালের বিদায়ের আর্তনাদ আমরা শুনতে পেলাম। মনে হলো মহাকাল তার কুহেলীঘন একটা অন্ধকার আস্তরণ মেলে দিয়ে একটি বছরকে আপন বুকের ভেতরে সযত্নে গুটিয়ে নিলো। আনন্দময় মুহূর্তের ভেতর দিয়ে জন্ম হলো ১৯৫১ সালের। এ বছরে জগতের বুকে কে জানে কি ইতিহাস রচিত হবে!

বিলেতে এসে দেখছি এখানকার স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে সকলেই তাদের বিয়ের দিন ও জন্মদিন সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ। বর্তমানের মধ্যে বাস করতে গিয়ে অতীতের সেই হারানো দিনটিকে এরা স্মরণ ক'রে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদে একটা দিন কি একটা রাত্রি কাটাতে চায়। আমাদের দেশে এ রকম উৎসব ক'রে বিয়ে কি জন্মদিনের গৌরব জাহির করার তেমন রেওয়াজ নেই। করতে চাইলেও অনেকের আবার পয়সা থাকে না। দারিদ্র্যই আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের কাল হয়েছে। আবার যাদের পয়সা আছে তাদের এ-সবের দিকে খেয়াল নেই। জীবনকে সুন্দর ক'রে গুছোবার, কিংবা আনন্দ উপভোগ করবার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন আমাদের দেশের অধিকাংশ ধনী ও শিক্ষিত লোকেরও তার অভাব রয়েছে ; ফলে আমাদের দেশের লোকের জীবন হয়েছে গতানুগতিক। রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমোনো ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না আমাদের দেশের নরনারী। জীবনকে এরা উপলব্ধি করে, রচনাও করতে জানে; নিজের সীমাবদ্ধ বিত্তের মধ্যেও এরা চলতে জানে আর ওরই মধ্যে অতীত জীবনের মধুর সুন্দর ক্ষণটি স্মরণ ক'রে বর্তমানকে সাজাতে জানে।

পাঁচ

এ বিজন প্রবাসে একটি বছর কেটে গেলো। ভালো লাগুক আর না লাগুক, পছন্দ করি বা না করি বাকি দিনগুলোও কাটবে। নদীর স্রোতের মতোই সময় কারও জন্যে অপেক্ষা করে না। সুতরাং একদিন আমার এ প্রবাস শেষ হবে। সেদিনের প্রতীক্ষায় প্রতি দিন প্রতি রাত আনন্দ-বেদনায় কাটছে।

এই একটি বছর বহুরূপী ইংলণ্ডের নানা রূপ দেখছি। দেশের যারা মানুষ তাদের চোখে দেশ যেমনভাবে ধরা দেয় বিদেশীর চোখে ঠিক তেমনভাবে ধরা দেয় না! বিদেশীরা বিদেশে পা দিয়ে যা দেখে নিজের দেশের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিতে চায়। ফলে যা দেখে তা তাদের চোখে অনেক সুন্দর এবং বিচিত্রভাবে ফুটে ওঠে। বিদেশের বিচিত্রতাই বিদেশীর মনকে সজাগ রাখে, চিত্তকে রাখে উন্মুখ ক'রে।

মাটি আর প্রকৃতির রসেরূপে গ'ড়ে ওঠা ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। এ জীবনে কত

জায়গা বেড়ালাম, কত দেশ দেখলাম, কত মানুষের সঙ্গে মিশলাম। সে সব দেশের নরনারীর সঙ্গে করলাম ভাব বিনিময়। তাদের মনের গহন কোণে ঠাঁইও পেলাম। মুগ্ধ হলাম দুনিয়ার মানুষের বহু বিচিত্র আত্মপ্রকাশ দেখে। কিন্তু সবার চেয়ে বেশী মুগ্ধ করলো আমাকে যে দেশে যাই সেই দেশের হাওয়া আর প্রকৃতি। তার মাটির রং মাঠের রূপ। বনজঙ্গল আর পাহাড় পর্বতের কমনীয় অনির্বচনীয়তা।

গত জুন মাসে গিয়েছিলাম রিচমণ্ড বেড়াতে। লণ্ডন থেকে রিচমণ্ড বেশী দূর নয়। টিউব ট্রেন কি বাসে ঘন্টা দেড়েকের পথ। টেম্‌স নদী দিয়ে লঞ্চেও যাওয়া যায়। টেম্‌স নদীর পাশ দিয়ে উঁচুনীচু পাহাড় ও সমতল ভূমির ওপর রচিত স্বাস্থ্য-নিবাস রিচমণ্ড। তার পরিধি চারদিকে মাইল কয়েক হবে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া গ্রীষ্মকালে প্রাণ ভ'রে এ জায়গায় সৌন্দর্য পান করবার জন্যে মাঝে মাঝে নাকি এখানে এসে থাকতেন। ফুলের আর গাছ পালার শোভায় সারা ইংলণ্ডকে স্বর্গ ব'লে মনে হয়। রিচমণ্ড সেই স্বর্গের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। নদীর পাশ দিয়ে ছায়া-ঘেরা ঘন সবুজ বনানী। বনের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা। ডালপালার ফাঁক দিয়ে সোনালী সূর্যের স্নিগ্ধ কিরণ এসে চুমো দিচ্ছে সেখানকার সবুজ ঘাসে ভরা মাটিকে। তার ওপরে অগণিত ইংরেজ তরুণ-তরুণী রৌদ্রস্নানের জন্যে নিজেদেরকে মেলে ধরেছে। পাশের ঝোপঝাপে ছেলেমেয়েরা খেলছে লুকোচুরি। দেখে মনে হচ্ছে এ কোন্ এক স্বর্গরাজ্যে এসেছি। এখানে বোধ হয় দুঃখ বেদনা কোনদিন কাউকে স্পর্শ করে না।

পাশেই উঁচু পথ। পথের নীচে তরু ছায়া ঘেরা ফুলবাগানের মধ্যে ইংরেজ হুরপরীদের লীলার মেলা। তার নীচে লক্ষ্মী টেম্‌স। মাথা থেকে পা পর্যন্ত লতাপাতায় ঢাকা দুপারের সবুজ গাছ-পালার পা চুমে টেম্‌স এঁকে বেঁকে তার পথ ক'রে মিশে গেছে দূরের বনের মধ্যে। রিচমণ্ডে বন আর নদীর শোভা অপরূপ। পথের ওপর দাঁড়িয়ে টেম্‌সের পানির ওপর প্রতিফলিত রোদের ঝিলিমিলি আর তার মৌনরূপ দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম।

পথ বেয়ে ক্রমে ওপরের দিকে উঠে গেলাম। কিছুদূর পায়ে চ'লে আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলে রিচমণ্ডের হরিণগুলোর ছায়া-ঘেরা কুঞ্জের মধ্যে এসে পৌছলাম। এখানকার হরিণ না পোষা, না বন্য। কেউ এদের শিকার করতে পারে না। ওরা রাজার রক্ষিত। যে ওদের ক্ষতি করবে, তাকে কিছুদিনের জন্যে শ্রীঘর ঘুরে আসতে হবে। সে ভয়ে ওদের কেউ ছোঁয় না। বনের পাশে অবারিত মাঠ। তাতে কচি ঘাস। এটিই ওদের চারণ ক্ষেত। বনের পাশে এসে দেখলাম অগণিত ধেড়ে-ধাড়ি ও শিশু হরিণ মিলেমিশে কচি ঘাসে মুখ লাগিয়ে চলছে আর কেউবা গাছের নীচে জিরিয়ে নিচ্ছে। দূরে আমাদের সাড়া পেতেই ওরা সচকিত হয়ে উঠলো। আমি ওদের ছবি নেবার জন্যে একটি বাচ্চার একেবারে কাছে এসে পড়েছিলাম। নির্দোষ হরিণশিশু তার রাজ্যে দ্বিপদের এ-অভাবিত সমাগম বোধ ক'রে প্রথমটা বোধ হয় হকচকিয়ে গিয়েছিলো। তাল সামলে নিয়ে দৌড় দিতে যাবে, এমন সময় আমার ক্যামেরায় ওদের চকিত সজাগ ধাবমান রূপ আমি ধ'রে নিলাম।

ইংলণ্ডে বৃষ্টি হয় প্রচুর। এখানকার বৃষ্টি আমাদের দেশের মতো মুষল-ধারায় বর্ষে না। ঝিপ ঝিপ ক'রে ক্ষণে আসে ক্ষণে নেই। ক্ষণে ক্ষণে থাকা আর না-থাকা বৃষ্টি এখানে

একরকম সারা বৎসরই চলে। বর্ষা ব'লে এদের আলাদা কোন ঋতু নেই। সে জন্যেই এখানকার তরুলতায় জীবনের আর সজীবতার ছাপ সুস্পষ্ট। নিদারুণ শীতই সে জীবনের দুরন্ত দুশমন। নইলে প্রকৃতির জীবনে এখানে অনন্ত যৌবন। এ কারণেই বোধ হয়, এখানকার ঘাসের এত বাড়। লেকের পাড়ের, পার্কের আর পশু চারণের ক্ষেত নয় এমন বাগানের ঘাস কাটবার জন্যে ঘাস কাটার যন্ত্র নিয়ে মালীদের নিত্য তৈরী থাকতে হয়। তবু গ্রীষ্মে-বসন্তে ঘাস কেটে শেষ করতে পারে না ওরা। গ্রীষ্মকালে তরুণ-তরুণীরা দলে দলে রোদ পোয়াতে এসে ঘাসের ওপর আরাম ক'রে শুয়ে থাকে।

এ দেশের লোকের জীবনে এ ঘটনা এতো স্বাভাবিক যে, ওরা সেদিকে চেয়েও দেখে না। বিদেশীদের চোখে তা এতো অস্বাভাবিক যে, সে দৃশ্য এড়িয়ে গ্রীষ্মকালে ঘাস সংলগ্ন পথ চলা তাদের সাধ্যের অতীত হয়ে ওঠে। এদের জীবনে এ বেয়াড়াপনা আমরা পছন্দ করি আর না করি এখানকার ঘাসের মধ্যে যে মাদকতা আছে, তা অস্বীকার করি কি ক'রে? দূরে দেখলাম এক ইংরেজ পরিবার (স্বামী-স্ত্রী বলেই মনে হলো) তাদের সঙ্গে দুটো ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘাসের মধ্যে নিজেদের মেলে দিয়েছে। বাচ্চা দুটো ওদের বাবার বুকের উপরে চ'ড়ে দুরন্ত দৌরাত্ম্য শুরু করেছে। আর ওদের মা বাবার মুখে প্রকাশ পাচ্ছে কি নিবিড় শান্তি।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দুর অধ্যাপক ডাক্তার মাসুদ হোসেন আর দিল্লীর জামেয়া মিল্লিয়ার অর্থনীতির অধ্যাপক মিঃ আকেল ছিলেন আমার সঙ্গী। পথ চলতে গিয়ে আমরা এতো ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম যে, বিশ্রাম না নিয়ে আর পারলাম না। একটা কাগজ বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম রিচমণ্ডের মাটিতে। ওপরে অনন্ত নীল আকাশ। নীচে ঘন বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসের মৃদু কম্প। আর চারিদিকে ছায়া-ঘেরা তরুশ্রেণীর স্বপ্নরাজ্য। এর গণ্ডী ডিঙিয়ে গেলেই শোনা যায় বৃহত্তর লণ্ডনের যন্ত্র ও যানবাহনের কোলাহল আকাশ ভেদ ক'রে ওপরে উঠছে। অথচ রিচমণ্ডে শব্দহীন স্তব্ধতার সরু পাড় একটা নিঃসাড় স্বপনের রেখা টেনে দিয়ে কোন্ সুদূরে মিলিয়ে যেতে চাইছে। তারই মাঝে বিশ্রাম করতে গিয়ে কখন যে ঘুমে ঢ'লে পড়েছি জানি না।

লণ্ডনের দক্ষিণে সুন্দরের লীলানিকেতন যেমন রিচমণ্ড, উত্তরে তেমনি হ্যামষ্টেডহিথ। রিচমণ্ডের শোভা বাড়িয়েছে সেখানকার টেম্‌স। হ্যামষ্টেডহিথের শোভা উঁচু নীচু মাটির ঢিবি আর তার উপরে বহুকাল লালিত তরুশ্রেণী। এর উঁচু নীচু দিয়ে চলে গেছে অসংখ্য পায়ে চলার পথ। তাতেই বেড়েছে এখানকার সৌন্দর্য। সুন্দরের কবি কীট্‌স্ মুগ্ধ হয়ে এখানে বাসা বেঁধেছিলেন। এখানেই তিনি তাঁর প্রেমিকা ফ্যানী ব্রাউনের সাক্ষাৎ পান। Beauty is truth, Truth beauty (সুন্দরই সত্য এবং সত্যই সুন্দর) ব'লে কবি কেন সুন্দরের সাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, হ্যামষ্টেডহিথে এলে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। জুন জুলাইয়ের পল্লবছায়া ঘেরা হ্যামষ্টেডহিথে প্রণয়ী ও প্রণয়িণীদের কলকাকলি মুখরিত সুমধুর গুঞ্জন যার কানে একবার প্রবেশ করছে সে বুঝবে এখানকার প্রত্যেক তরুণই কবি কীট্‌স আর প্রত্যেক তরুণীই যেন ফ্যানী ব্রাউন।

আমাদের দেশে ঋতু ছ'টা। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। ইংলণ্ডের ঋতু সংখ্যা চার। শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম আর হেমন্ত। শীত গ্রীষ্মের মধ্যে বসন্ত আসে তার ফুলের পসরা নিয়ে। রূপের বাহার হঠাৎ মেলে ধ'রে এদেশী ও বিদেশীদের চোখ ঝলসে, মন লুটে নিয়ে আবার দু'দিনের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। গ্রীষ্ম এখানকার 'মধুকাল,' কয়েকমাস জুড়ে এখানকার নরনারীর চিত্তফুলবনে মধুচক্র রচনা করে। শীত নরকের শামিল। শীত আর গ্রীষ্মের মাঝখানে হেমন্ত। পূর্ণতা ও বার্ধক্যের প্রতিরূপ। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর জুড়ে থাকে এই ঋতুটি। কবি কীট্স তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Ode to Autumn'-এ ঋতুটিকে "Season of mists and mellow fruitfulness" ব'লে বন্দনা করেছেন।

একটি বছরে ইংলণ্ডের নানারূপই চোখে দেখলাম। দেখলাম বসন্ত কাল থেকে এখানকার সবুজের জীবনমুক্তি। গ্রীষ্মকালে সবুজেরা ভরা যৌবন। প্রকৃতি ও মানুষের দেহে মনে সে সবুজ আনন্দের আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেলো। আমাদের সোনার বাংলার সবুজের ছড়াছড়ি নিয়ে জগৎসভায় আমরা করি গর্ব, কিন্তু ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকালীন আভা ও লাবণ্য যে দেখেছে সে আর এ গর্ব করবে না। এ দ্বীপটিতে খোদা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছেন। আর খোদার ওপরে খোদকারী করেছে ইংরেজরা।

সারা ইংলণ্ডকেই বেহশ্‌তের একটি বাগানের মতো করে সাজিয়েছে এরা। ইংলণ্ডরূপী স্বর্গোদ্যানে একচ্ছত্র আধিপত্য করে রং-এর মধ্যে সবুজ। মার্চ থেকে এর আরম্ভ আর সেপ্টম্বরে এর পরিণতি। ক'মাস ধ'রে প্রাকৃতিক শোভা ধীরে ধীরে উপভোগ করলে মনে হয় হেমন্তকালে এখানকার সবুজ গাঢ় হ'তে হ'তে যেন ঘন নীল রূপ ধরে। চোখ আর তার দিকে মেলে রাখা যায় না। ধাঁধিয়ে আসে। তারপর আসে আবার রূপ বদলের পালা। হেমন্তকাল যেন জীবনের পরিণতির আর বিদায়ের বাণী ঘোষণা করতেই এসেছিলো।

বছর শেষ হয়ে আসছে। চাষীরা ফসল কেটে মেড়ে ঘরে তুললো। লোকেরা আসন্ন শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে কয়লা নিয়ে এসে ঘরে মুজদ করেছে। দখিনা বাতাস দিন দিন শীতের আভাস বয়ে নিয়ে আসছে। গাছের পাতা জীর্ণ হয়ে ঝ'রে পড়েছে। গাছগুলো নেড়া হ'তে চললো। আর কিছুদিন পরেই যেন জীবনের আভাস বন্ধ হয়ে আসবে।

ছয়

বৃষ্টি-নেশাভরা লণ্ডনের সন্ধ্যা বেলায় ছোট্ট ঘরটিতে ব'সে জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছি। যতদূর চোখ যায় শুধু দেখছি লণ্ডনের বাড়ীঘরগুলোর চিমনী থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ধোঁয়ায় আর মেঘে ঢাকা লণ্ডন পাথরের মতো বুকের উপর চেপে বসেছে। মনে মনে ফিরে গেলাম আট হাজার মাইল দূরে, রাজশাহীর আর্যপল্লীর যে বাসাটায় আমার পরিজনেরা বাস করছে সেখানে।

ওখানে হয়তো এরও চেয়ে ঘন কালো মেঘ করেছে। বাংলাদেশের আষাঢ়ের মেঘ–যেমন গম্ভীর তেমনি কালো। হয়তো নেমেছে ঘন বর্ষা। অবিরল ধারা বর্ষণের মধুর রোল গানের অনুরণনের মতো কেঁপে কেঁপে তাদের হয়তো নিদ্রাকাতর ক'রে দিয়েছে।

এখানকার মেঘ আমার দেশের মেঘের মতো অতো সুন্দর নয়। তেমন কালো হয়ে জমাট বাঁধে না। সারা আকাশ ছেয়ে গম্ভীর হয়ে পানির ভারে নুয়ে পড়তে চায় না। গুরুগম্ভীর মন্দ্রধ্বনি এখানকার মেঘে তেমন শোনা যায় না। বিদ্যুৎ চমকায় না। বুকের মধ্যে বিভীষিকার সৃষ্টি হয় না। হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে আশপাশ ঝলসে ওঠে না।

আমি এদেশের লোক নই। দেশে থাকতে বিলেত দেখার শত সাধ বুকে পোষণ করলেও বিলেতে এদের কোন জিনিসকেই তাই আপন ক'রে দেখতে পারলাম না। এখানকার প্রকৃতির কথা পরে বলছি। কিন্তু এদের মেঘে কোনো বৈচিত্র্য দেখতে পাইনে। আমার শিক্ষয়িত্রী মিস্ ইভান্সের সঙ্গে এ নিয়ে যখন তর্ক করি তখন তাঁর নিজের দেশের প্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে তাঁকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখি।

বছর খানিক আগে মিস্ ইভান্স ভারতে গিয়েছিলেন। দিল্লীর খররৌদ্রের তাপ ছিল তাঁর অসহ্য। প্রতি সকালে উঠেই তাঁর মনে হতো কোথায় তাঁর ইংলণ্ড–আর ইংলণ্ডের আকাশ। মেঘের মধ্যে জেগে ওঠা আর কুয়াশা বরফ ও বৃষ্টির মধ্যে পথা চলা। ছেলেবেলা থেকে এ পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছেন। ছত্রিশ বছরের জীবনে নিজের দেশের এই আবহাওয়ায় ছত্রিশটি শীত-গ্রীষ্ম কাটিয়েছেন। হিন্দুস্থানের মাটিতে পা দিয়ে জ্বলন্ত রোদের তাপ সহ্য ক'রে ইংলণ্ডের স্নিগ্ধ রোদ আর আঁধার ঘেরা কুহেলীর জন্যে তাঁর মন কেন যে উতলা হয়ে উঠতো, আমার এ ক' মাসের অভিজ্ঞতা থেকে আজ তা ভাল বুঝি।

মা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমির মতো আর কিছু কি এমন মিষ্টি আছে ? সে জন্যেই বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে বাংলার কবি লিখেছেন–

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত–এ ছয় ঋতুর লীলা নাকি আমাদের দেশে। কিন্তু এখানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ছাড়া শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত কখন আসে, কখন যায় তা চোখেই পড়ে না। আর বর্ষা সেতো সারা বছর লেগেই আছে। বেচারা শীতের বোধ হয় কেউ সাথী নেই। তাই সে আমাদের দেশেও একা। শরৎ, হেমন্ত ও বসন্তের কাজ তিনটি বড়ো ঋতুর পাশে থেকে সেতু যোজনা করা। ফাল্গুনে কোকিল ডাকলে বসন্ত আসে, কি বসন্ত এলে কোকিলের সুর শোনা যায়, এ নিয়ে এখন হয়তো আমাদের দেশে আর কেউ তর্ক করবে না। আধুনিক কালের কোকিল বলেই নাকি সে দুপুর রাতে ডাকে। দিন দুপুরেও ডাকে। শীতেও ডাকে। বর্ষায়ও ডাকে তবু বসন্ত আসে তা বুঝতে পারি যখন দেখি গাছে সবুজের সমারোহ। পুরানো পাতা ঝ'রে যায় আর কচি কিশলয়ে কাঁপন লাগে। কিন্তু ফাল্গুন আসতে না আসতেই ঘোড়া ছুটিয়ে আসে চৈত্রের খর দিন।

ইংলণ্ডের বসন্তকাল কিন্তু ভিন্ন ধরনের। মার্চ মাস শেষ হ'তে না হ'তেই তরুলতায় পাতার মুকুল দেখতে পেলাম। আজ এ গাছে চাই তো দেখি যেখানে যতটুকু পাতা বেরোনো সম্ভব তাতেই অঙ্কুর গজিয়ে উঠেছে। কাল যদি খেয়াল করি তো দেখি আরও বেড়ে গেছে। পরের দিন দেখি আরও এমনি ক'রে সপ্তাহ কি পক্ষ কালের প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে শীতের প্রকোপে নিষ্প্রাণ তরুলতায় অকস্মাৎ একদিন প্রাণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে

দেখলাম। মৃত্যের মধ্যে জীবন কি ক'রে সঞ্চারিত হয় আর প্রকৃতিতে সে জীবন কি ক'রে তরঙ্গায়িত হয় ইংলণ্ডে ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। সন্ধ্যায় এক রকম দেখি তো সকালে অন্য রকম। আরও সুন্দর, আরও ভালো। প্রকৃতির যে দিকে চাই সেদিকেই দেখি যেন সুন্দরের আগুন লেগে আছে।

ছোট ছোট গাছে পাতা নেই। শুধু ফল। অনাবিল সৌন্দর্যের এই খেলা দেখবার জন্য এখানকার পার্কগুলোয় রাশি রাশি টাকা খরচ করা হচ্ছে। ডালপালার হাত পা মেলে দেওয়া আমাদের মাথা সমান উঁচু ফুলের গাছ সারি সারি সাজানো। কতকগুলোতে শুধু সাদা ফুল। কতকগুলোতে লাল, নীল, হলদে, বেগুনি। ভারি ভালো লাগে তার নীচে গিয়ে দাঁড়াতে। পুঁথিপত্রে বেহেশ্‌তের ফুল বাগানের এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের বসন্ত আর গ্রীষ্মকাল দেখলে ইংলণ্ডকেই বেহেশ্‌ত ব'লে মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

রিজেন্ট পার্ক আমার বাসার কাছ থেকে মিনিট তিনেকের পথ। প্রকৃতির শিল্প-সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এটি লণ্ডনের সেরা পার্ক। এ পার্কের গোলাপের বাগানের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। বাগানটি রাণী মেরীর নামের সঙ্গে জড়ানো। জুন, জুলাই এ দু'মাস গোলাপ ফুলের। সম্রাজ্ঞী মেরীর গোলাপোদ্যানের গোলাপেরা কেউ ফুটেছে–কেউ বা ফুটে রৌদ্র-স্নানরত নরনারীর চোখ জুড়োচ্ছে, মন ভোলাচ্ছে। নানা রং-এর এতো গোলাপ এক সঙ্গে পাশাপাশি ফুটতে দেখলে নিতান্ত অরসিকের প্রাণও রসোচ্ছল হয়ে উঠবে তাতে বিচিত্র কি? রোদে ভরা ছুটীর দিনগুলোতে রিজেন্ট পার্ক ও কিউ গার্ডেনে এখানকার মালীদের হাতে গড়া গোলাপ বাগের জান্নাত পরিবেশ দেখে মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। অপরিমেয় ফুলের রঙে চোখে লাগছে নেশা আর ফুলেরই মনোরম স্নিগ্ধ গন্ধে বাতাস হয়েছে মোহকর। এ মাধুরী তিলে তিলে উপভোগ করতে গিয়ে এর মাদকতার মধ্যে নিজেদেরকে এলিয়ে দিয়ে মধুর মধ্যে মৌমাছির মতো এরা যে কি ভাবে জড়িয়ে গেছে না দেখলে তা বোঝা যায় না।

বসন্ত ও গ্রীষ্মের এক এক মাসে এক এক রকম ফুল এখানকার বৈশিষ্ট্য। আবার একই ফুলের কতো যে বৈচিত্র্য তা ব'লে শেষ করা যায় না। এপ্রিল মাসে দেখলাম লাইলাক ফুলে রিজেন্ট পার্ক ছেয়ে গেছে। বেগুনী আর আসমানি রঙের লাইলাক। কবি এলিয়েটের বড় প্রিয় ফুল। মৃত্যুর ভেতর থেকে জীবনের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে ব'লে কবি লাইলাককে বলেছেন জীবনের সঞ্জীবনী। আমারও লাইলাক ভালো লাগলো। তার কারণ ইংলণ্ডের এতো ফুলের মধ্যে শুধু লাইলাকেই গন্ধ পেলাম।

মে মাস ছিল টিউলিপ, উইলো, May's Blossoms, চেষ্টনাট আর ডেইজীর। টিউলিপ আমাদের দেশের ধুতুরা ফুলের মতো। কেবল ফুলটুকু ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে ওর সাদৃশ্য আঁকা যাবে না। পাতার সঙ্গে নয়, পাঁপড়ি বা দল কিছুরই সঙ্গে নয়। বাইরে কিছুটা সাদৃশ্য আছে, এতটুকু বলা যায়। আকারে টিউলিপ ধুতুরা ফুলের চেয়ে অনেক ছোট। বলিহারী যাই টিউলিপের রং দেখে। কোনো জায়গায় দুধের চেয়েও সাদা। কোনো জায়গায় রক্তের চেয়ে লাল। কোনোটায় বেগুনি, কোনোটায় জাফরানী, কোনোটায় ধূপছায়া। কোনোটা দুধে আলতা মাখানো। কোনোটা হলুদ। কোনোটায় থাকে প্রজাপতির গায়ের রেখাটানা বিচিত্র রংয়ের কারুচিত্র। থাকের পর থাক। টিউলিপে টিউলিপময়। ইংরেজ

জাত শুধু নিজেদের স্বাস্থ্য ও সাম্রাজ্যের চর্চা করেনি, প্রকৃতিকে মুঠোর মধ্যে বন্দী ক'রে তৃপ্তি পাবার অপরূপ ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছে। ফুলের যে এরা কি ভক্ত এবং ফুলের রঙে যে এদের কি আনন্দ এ থেকে এ কথাই বার বার মনে পড়ে।

এদের মেয়েদের অফিসে কাজ করতে হয়। বাইরে ছুটতে হয়। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। লম্বা চুল নিয়ে প্রসাধন করা তাই এদের ধাতসহ নয়। এদেশের মেয়েদের সৌন্দর্য সাধনার মধ্যে ইউটিলিটির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। তাই পুরুষের মতো এরা চুল ছেঁটে চুলের মধ্যে নানা কারসাজি ক'রে চুলকে করেছে ছোট। নারী এবং প্রকৃতি–দুইয়ের মিলে দেশের শোভা। নারী যখন তার দিকে বিদায় দিতে গিয়ে শ্রীকে কেটে ছোট করে আনলো তখন প্রকৃতিকে ভার নিতে হলো দেশের শ্রী রক্ষার। উইলো গাছের মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে একরাশ চুল ঝুলতে দেখা যায় এও বোধ হয় সে জন্য। এদেশের মেয়েদের মাথার চুল হয় লাল, সাদা না হয় কটা! কালো কচিৎ দু'একটির। তাই কালো চুলের জন্যে এদেশের লোকের এত আগ্রহ। কিন্তু উইলোর মাথার চুল সবুজ। আমাদের দেশের লাউ আর শসা গাছ মাচায় যে লতার সাহায্যে প্যাঁচ বাঁধিয়ে নিজেকে রক্ষা করে, উইলোর মাথায় চুল সে রকম লিকলিকে। লতার মতো। পাতা নেই, শুধু লতা।

মে'জ ব্লসম মে মাসের খাস ফুল। গাছগুলো আমাদের দেশের মেহেদি গাছের মতো। কোনোটা কিছুটা বড়ো। কোনোটা বা ছোট। ঝন্‌ঝনে গাছে পাতার সঙ্গে যেমন একহারা হলুদ ফুল লেগে থাকে তেমনি মে'জ ব্লসম ফুলের রূপ। ফুলের চমৎকার রং বেশ চোখে লাগার মতো।

বাকী রইলো চেষ্টনাট আর ডেইজী। বৃহত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের দিক থেকে দুটি দুই প্রান্তে। চেষ্টনাট কাঠবাদামের গাছ পার্কগুলোতে সুদক্ষ শিল্পর প্ল্যানমতো সারি সারি যে কত দাঁড়িয়ে রয়েছে তার শেষ নেই। শীতকালে যে ভাবে এরা শুকিয়েছিল, আমাদের দেশ হ'লে বেশ ভাল জ্বালানি হ'তো। কিন্তু বসন্ত আসতে না আসতে প্রকাণ্ড চেষ্টনাট গাছের পাতায় পার্কগুলো ছায়া সুনিবিড় হয়ে উঠলো। পাতার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কাশফুলের মতো শিষ মাথায় নিয়ে তাদের শ্বেতফুল বাতাসের ভারে থর থর ক'রে কাঁপছে। একেই বলে জীবনের আবেগ। দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড গাছ স্নিগ্ধতায় ও সৌন্দর্যে মাথায় একরাশ ফুল নিয়ে মনোরম হ'তে চাইছে।

মাটিতে যদি চাইছি–দেখছি ঘাসেও ফুল। অবিমিশ্র ঘাস কোথাও নেই। শিশির বিন্দুর মতো ফুলের অনন্ত শ্বেত কণিকা ঘাসের মুখ উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে। সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে ঘাস এখানে ছোট হয়ে নেই। সবার আনন্দের ভাগ সেও যাতে ভোগ করতে পারে তার জন্যে তারও বুক ফুলে ভ'রে রয়েছে। এই ঘাস ফুলের অণু পরামাণুগুলোর নাম ডেইজী। আর মেয়েদের কানফুলের মতো যেগুলো সেগুলো ক্রোকাস। মিষ্টতায় ভরা ফুল দুটো। পায়ের তলায় চুড় চুড় ক'রে ভেঙে পড়তে চায়।

এপ্রিল, মে ও জুন-এই তিন মাসে ইংলণ্ডের সৌন্দর্য চোখ ভ'রে দেখেছি। এপ্রিলে এর সূচনা আর সেপ্টেম্বরে পরিণতি। জুন জুলাই আগষ্ট এখানকার গরম কাল। এখানকার গরম

মানে আমাদের দেশের মাঘ বাদ দিয়ে তার আগের ও পরের মাসগুলোর শীত আর কি। তাও আবার একটানা নয়। দিনের কোন অংশ বেশ একটু গরম। ঘণ্টা দুই পরে আবার ঠাণ্ডা। কখনো বেশী, কখনো কম। দিন কয় যদি এক রকম সহনীয় (সে জন্যই আমাদের কাছে আরামপ্রদ) গরম পড়লো তো আর দিন কয় আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। এই ঠাণ্ডা ও গরমের হারজিত খেলা নিয়ে ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকাল। শীতের তুলনায় বড়ো মিষ্টি।

মনে পড়ছে ১৯৫০ সালের আঠারোই সেপ্টেম্বরের কথা। সেদিন ছেড়ে এসেছিলাম শ্যামল সবুজ সোনার দেশ পূর্ব বাংলাকে। ঢাকা থেকে লণ্ডন উড়ে আসবার পথে এক জার্মানীর মিউনিক ছাড়া পূর্ব বাংলার সবুজের মতো সবুজের সঙ্গে আর কোথাও দৃষ্টি বদল হয়নি। লণ্ডনে পৌঁছে দেখেছিলাম তখনও গাছে গাছে পাতা ছিল। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল নিয়ে বিচিত্র ফল ফুলের গাছগুলো তখনও সবুজের আভা ছড়াচ্ছিল। সেপ্টেম্বর মাস ইংলণ্ডে বয়সের ভারে জীর্ণ হয়ে আসে। ও মাসে এখানকার গ্রীষ্মের অন্তিম দশা বলেই নবাগত আমাদের চোখে তার বার্ধক্য-সুন্দর রূপ চোখে পড়েনি।

কিন্তু মে মাস থেকে ইংলণ্ডের প্রকৃতিতে একি শুরু হলো। আমাদের সবুজ এদের সবুজের কাছে ফিকে হয়ে যায়। আমাদের ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে বাতাস যখন ঢেউ খেলে যায় তখন হাল্কা মনোহর সবুজের কম্পন মাঠের প্রত্যন্তপ্রদেশে পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে দেখি। তাতে মন ভরে। চোখ জুড়োয়। এদের ধান ক্ষেত নেই, কেননা ভাত এদের খাবার নয়। পার্কের সবুজ আর নীল দৃশ্য দেখে লোভ হ'ল এদের গ্রাম আর মাঠের শোভা দেখতে। কোচে চ'ড়ে সেদিন কেমব্রিজ বেড়িয়ে এলাম। আমাদের দেশের গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমাদের মন ভুলোয়, কিন্তু এদেশের মাঠের মাঝখান দিয়ে পিচ ঢালা পথের বুকের ওপর দিয়ে বাদশাহী কোচগাড়ী যখন ছুটে চলে তখন দু'পাশের গাছপালার সবুজ ফুলের অনন্ত বৈচিত্র্য আর লতাপাতার ঘননীলিমা চোখের ওপর মধুর-মায়া অঞ্জন লাগিয়ে দিয়ে যায়। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। খাড়া উঁচু, সোজা নীচু বা একটানা সমতল নয়। লালচে আঠার মতো চিকন মাটির উঁচু নীচু তরঙ্গ তুলে তার বুকের ওপর একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাতে কোথাও বাজরার ক্ষেত। কোথাও সরিষার ফুলের মতো সারা মাঠ ছাড়ানো ফিকে আর গাঢ়ো হলুদের বিছানা পাতা। সব কিছু যেন প্ল্যান করা। খাড়া টিলে। তার মাথায় কত কালের ঘন বন। আপনা থেকে গজিয়ে উঠলেও মনে হচ্ছে যেন কুশলী হাতের পরশ পেয়ে থরে থরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পাশে গোচারণ ভূমি। তার নীচে বহু বিচিত্র শস্যক্ষেত। অপরূপ শ্যামলে সবুজে, বেগুনে হলুদে, নীলে লালে আর বিচিত্র আভায় প্রভায় গায়ে গায়ে লেগে থেকে সৌন্দর্যের সে কি প্লাবন বইয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির এতো রূপ এতো নিটোল স্বাস্থ্য, মে জুনের ইংলণ্ড না দেখলে কখনও কি তা বিশ্বাস করা যায়?

সব চেয়ে ভালো লাগছে এখানকার মানুষগুলোর অবসর বিনোদনের পালা দেখে। সোম থেকে শুক্র পর্যন্ত ভূতের মতো এরা কাজ করে। আর শনি রবিবার জীবনের লঘু স্বচ্ছ দিকে নজর দেয়। মনকে সহজ ভাবে ছেড়ে দিতে পারার মধ্যে বোধ হয় এরা অদ্ভুত

মাদকতার স্বাদ পায়। সপ্তাহের শেষের এ দু'দিন ধরে এরা দেহ ও মনকে দেয় বিশ্রাম আর লঘু পরিহাস রসের ভেতর দিয়ে করে জীবনী-শক্তির সঞ্চয়। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলার জন্যে আর পাঁচ দিন ধ'রে সেই জীবনী-শক্তির করে ব্যয়। এদের মতো দায়িত্বশীল জাত পৃথিবীতে দুটো নেই। যার যতটুকু কাজ সুদে আসলে তার সবটুকু সুন্দর ক'রে নিজের মনেই সে ক'রে যাবে। কাউকে কিছু বলতে হবে না। কোনো তাগাদা দিতে হবে না। জীবন শুধু কাজে নয়, শুধু ঢিলে অবসর বিনোদনেও নয়। বিশ্রাম না নিলে, স্বাস্থ্য চর্চা না করলে, সাতদিনের এক দিনও হাল্‌কা ছন্দে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে না পারলে মানুষের দেহের মেশিন মনের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে না । ইংরেজরা জীবনে কাজ করবার জন্যেই সপ্তাহে দুটো দিন এমন ক'রে আনন্দস্রোতে ভাসবার চেষ্টা করে।

এসে অবধি ক'টা মাস সূর্যের মুখ ভালো ক'রে দেখতে পাইনি। মন তাই বডডো ভার হয়ে থাকতো। ঘোলাটে আঁধারের ভেতর থেকে সূর্যের ক্ষীণ হাসিটুকু একটু ক্ষণের জন্যে চোখে পড়লেও মনের ভার কিছুটা হালকা হতো। জুন মাসের ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলাচ্ছে। এ মাসটিতে সবই মনোহর। সবই এ ক'মাসের ধারণা আমার বদলে দিলো। সকাল চারটায় সূর্য উঠে যায়। রাত্রি দশটায় সন্ধ্যা হয় না। শীতকালে বেলা তিনটায় রাত হতো। একে মেঘের আঁধার। তাতে রাতের আঁধার। তাই বাতি জ্বালিয়ে দোকানপাট চলতো, অফিসের কাজ-কাম হ'তো। বাতি জ্বালিয়েই দিনের বেলা স্কুল কলেজের লেখাপড়া চলতো। কিন্তু এখন রাত্রি দশটা পর্যন্তও সূর্যের আলোতে ঘর ভ'রে থাকে। তাই দিনের বেলায় খেয়ে-দেয়ে ছেলেমেয়েদের রাতের ঘুম ঘুমুতে হয়।

সে যা হোক। সূর্যের স্নিগ্ধ রোদে ক'দিন থেকে সারা ইংলণ্ড বিধৌত হচ্ছে। নর নারীর শরীর থেকে শীতের কাপড়ের ভার নেমে গিয়ে স্বভাব-ছন্দে তাদের চলার সুযোগ দিয়েছে। মানুষের মুখে হাসি দেখতে পাচ্ছি, সবচেয়ে ভাল লাগছে এখানকার মেয়েদের স্বাস্থ্য। দুঃখ হয় আমাদের দেশের মেয়েদের কথা ভেবে। ঘরের কোণে চিরবন্দিনী তারা। ধর্ম আমাদের যতটুকু না শাসন করলো, আমাদের দেশের অন্ধ সংস্কার তারও চেয়ে বেশী ক'রে খোদার দেওয়া দুনিয়ার আলো বাতাস থেকে তাদের করলো বঞ্চিত। আর মেয়েরাও এমন যে, জীবনে অধিকার পেলেও তারা এতকালের সংস্কার ছেড়ে সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ করতে পারলো না। এদের সমাজ ব্যবস্থার জন্য এরা জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে। সমাজ রাষ্ট্র ও সংসার জীবনে প্রতিপদে নারী পুরুষের সমকক্ষ ব'লে এদের নারী জীবন পথে মুক্ত-ছন্দে ভাসতে পেরেছে। এদের মন্দ দিক নয় বরং যেটা ভালো সেটা যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি তাতে আমাদের দেশে মঙ্গল বৈ অমঙ্গল নেই। কিন্তু যা বলছিলাম। এ মাসটা ধরেই দেখছি প্রতি শনি রবিবারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু মাত্র প্রয়োজন মতো কাপড়-চোপড় প'রে বাড়ীর কর্তা গিন্নী থেকে আরম্ভ করে ছোট কচি বাচ্চারা পর্যন্ত পার্কে এসে রোদ পোয়াচ্ছে। রোদ স্বাস্থ্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। সূর্য যখন এতোকালের কৃপণতার পর মাস খানিক ধ'রে অকৃপণভাবে আলো দিতে লেগেছে তখন তার কিরণ তো মন প্রাণ ভ'রে পান করা চাই।

প্রকৃতিতে যখন এমন সৌন্দর্যের সমারোহ, বিচিত্র-রঙে যখন সারা ইংলণ্ড রাঙা হয়ে উঠলো, সবুজে নীলে মিতালি পাতানো যখন স্বদেশীদের তো বটেই, আমাদের মতো বিদেশীদের মনেও এদেশকে ভালোবাসার নেশা জাগালো তখন প্রকৃতির প্রাণ-সঞ্চারক সূর্যের আলো, এ স্নিগ্ধ মধুর কিরণ মনপ্রাণ ভ'রে পান না করলে খোদার দেওয়া এ নেয়ামতের মূল্যই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। তাই বুঝি ইংলণ্ডে এতো পার্ক। এত ফুল। এতো বিশ্রামকুঞ্জ। আর গ্রীষ্মকালকে কেন্দ্র ক'রে মর্ত্যজীবনের মাধুরী পানের এতো আয়োজন। ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকালের খ্যাতি দুনিয়াজোড়া। শীতের মতো প্রাণ-সংহারক ব'লে নয়, স্নিগ্ধ রোদে-ভরা মধুর ব'লে।

সাত

একদিন গেলাম 'ফয়েল্স'-এ। 'ফয়েল্স্' পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বইয়ের দোকান। লণ্ডন চেয়ারিংক্রস্ রোডের ওপর অবস্থিত। প্রতিদিন হাজার হাজার বই বিক্রি হচ্ছে, তবু লাখ খানেক বই সব সময় ওদের ঘরে মজুদ থাকে। এ থেকে বোঝা যায় দোকানটি কত বড়ো। এর নানা বিভাগ। এক এক ভাগে এক এক রকম বই। ভ্রমণ বিভাগে গিয়ে কিনলাম বার্নার্ড শ'র সর্বশেষ ছড়ার বইটি। শ' তাঁর নিজের গ্রামের নানা জিনিসের নানা ছবি তুলছিলেন। প্রতেকটি ছবির নীচে তাঁর নিজের লেখা ছোট ছোট একটি ক'রে কবিতা। আপন দেশ ও গ্রামের প্রতি ভালোবাসার ছাপ বহন করছে। কবিতাগুলো অত্যন্ত সহজ ভাষায় লেখা। তাতে তাঁর শেষ জীবনের আবেগ নিজের গ্রামের ছোটখাট জিনিসের প্রতি ঝ'রে পড়েছে। তাঁরএ ছড়াগুলো বুঝতে আমাদের শিশুদেরও অসুবিধা হবে না।

এ বিভাগ থেকেই কিনলাম পৃথিবীর একটি 'ওয়াল ম্যাপ'। এ বিরাট বিচিত্র পৃথিবীতে কতো রকমের দেশ এবং প্রতি দেশে কতো বিচিত্র মানুষ বাস করছে ম্যাপের দিকে চাইলেই তা জানবার কৌতূহল জাগে। ভূগোল পড়তে গেলে সে কৌতূহল হয় আরও তীব্র। সে জন্যেই ছেলেদের জন্যে অমন আকর্ষণীয় ক'রে 'ওয়াল ম্যাপ' তৈরী করেছে এরা! সাগর, মরুভূমি পাহাড়, পর্বত আর মানুষের বাসস্থান, এ নিয়েই তো বিশাল পৃথিবী। মানুষ যে দেশে বাস করে শুধু সে দেশের ম্যাপটি দেখলে তার মনে নিজের দেশের বিরাটত্ব সম্বন্ধে গর্ব হওয়া স্বাভাবিক। দুনিয়ার ম্যাপ অনবরত কাছে থাকলে আর তার ওপর নজর বুলালে তখন অন্যান্য দেশের তুলনায় নিজের দেশের আয়তন মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর দুনিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর কথা জানবারও আগ্রহ হয়। ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করার অভ্যাস থাকলে বিভিন্ন দেশের ষ্ট্যাম্প নাড়তে নাড়তে সে সব দেশ এ রকম দুনিয়ার ম্যাপ থেকে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর সমগ্র পৃথিবীতে জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ যে কতো অল্প সে কথাও প্রতিক্ষণে ভালো ক'রে মনে পড়ে যায়।

এর পরে গেলাম ছেলেদের বিভাগে। সেখান থেকে 'নার্সারী রাইমের' একটি বই

কিনলাম। যেখানে কচি বাচ্চাদের রাখা হয়, ইংরেজীতে তাকে বলা হয় নার্সারী। বিলেতে নিজ বাড়ীতে ছেলেমেয়ে খুব কম হয়, হাসপাতালেই তার সমস্ত আয়োজন। তারপর তাদেরকে রাখবার নানা জায়গা এবং স্কুল আছে। বাচ্চারা কিছুটা বড়ো হ'তে থাকলে তাদেরকে সেখানে রাখা হয়। এ ধরনের নার্সারীগুলোতে নানারকম ছড়া ব'লে তাদের আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। বিলেতের সব শিশুই যে ও রকমভাবে মানুষ হয় তা নয়, তবু ছড়াগুলোর উৎপত্তি এ রকম ভাবেই হয়েছে। এখন সারা দেশময় এগুলো ছড়িয়ে গেছে। সারা দেশের মায়েরা বা মেয়েরা ছেলেমেয়েদের এ সব ছড়া ব'লে সোহাগ ক'রে ঘুম পাড়ায়।

নীচে ছেলে ভুলানো দুটি ইংরেজী ছড়ার নমুনা দেওয়া গেল–

(১)

Dance to your Daddy
My little baby;
Dance to your Daddy
My little lamb.
You shall have a fishy;
In a little dishy;
You shall have a fishy
When the boat comes in.

নীচের ছড়াটি আরও সুন্দর ও সুরময় :

(২)

Robin Hood, Robin Hood,
Is in the mickle wood?
Little John, Little John
He to the town is gone.
Robin Hood, Robin Hood,
Is telling his beads.
All in the green woods.
Among the green weeds,
Little John, Little John,
If he Comes more
Robin Hood? Robin Hood,
He will fret full sore!

আমাদের দেশেও যে এ রকম ছেলে ভুলানো ছড়া নেই তা নয়। যেমন–

ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী
এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব
কিসে!
ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনা
দিব কি
আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি

কিংবা,

দোল দোল দোলনি,
রাঙ্গা মাথায় চিরুণি
বর আসবে এখনি
নিয়ে যাবে তখনি
কেঁদে কেন মরো
আপনি বুঝিয়া দেখ
কার ঘর করো।

এ ধরনের ছেলে ভুলানো ছড়া দুনিয়ার সব দেশেই আছে। নার্সারী রাইম ইংলণ্ডের সেই ছেলে ভুলানো ছড়া। এ দেশের ছেলেদের মন কি ভাবে গ'ড়ে ওঠে, দোলনার সুরের সঙ্গে মায়েরা কি ভাবে ছেলেদের সোহাগ করে এ নার্সারী রাইমগুলো থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

এদের শিশু বিভাগ থেকে 'স্লিপিং বিউটি' বলে আর একটা ছবির বই কিনলাম। গল্পটি ছবির সাহায্যে ব'লে দেওয়া হয়েছে। গল্পের অর্থ উদ্ধার করার জন্যে ছবিই শিশুদের পথপ্রদর্শক। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের এ সুবিধা কোথায়? আমাদের যাঁরা বই লেখেন তাঁদের অধিকাংশেরই দূরদৃষ্টির অভাব আছে বৈকি? শিশুমনের উপযোগী ক'রে ছবি দিয়ে সরল ভাষায় তাদের মনোরঞ্জন করার কোন ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেন না। এযে শুধু লেখকদের দোষ তা নয়, প্রকাশকরা আজও যথারীতি বই-এর ব্যবসা শিখলেন না। কলকাতাতে তবু কিছুটা হয়, আমাদের কথা আর না-ই বললাম। বিলেতের সঙ্গে তুলনা ক'রে তা নিয়ে দুঃখ করি না। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে দু-দশ বছর পরে হ'লেও এ পথ ধ'রে আমাদের এগোতে হবে, নইলে আমাদের দেশের উন্নতি হবে কি ক'রে?

তার মন কি চায় কোনো দেশের শিশুই তা নিজে বুঝে না। অদ্ভুত রহস্যময় তাদের মনোজগৎ! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি নতুন জিনিস যখন তাদের দৃষ্টিপথে পড়ে, নতুনের সঙ্গে পরিচয়ে মনের কলি যখন প্রতিদিন বিকশিত হয়ে থাকে, তখন কি যে আনন্দ হয় তাদের, সে আনন্দ শুধু শিশুমনেই ধরা পড়ে। বড়োদের তাতে কোনো আকর্ষণ থাকে না। এ কারণেই শিশুর জগৎ স্বতন্ত্র। অত্যন্ত সাধারণ অথচ দুর্জ্ঞেয়। শিশুমন তৈরী করার

জন্যে ইংলণ্ড শিশুসাহিত্যের প্রতি যে ভাবে নজর দিয়েছে, তা দেখে এ জাতের প্রতি ভক্তিমুগ্ধ হয়ে যাই।

বাদশাহ হারুনর রশীদের সময়ের মুসলিম জগতের 'হাজার এক রাত্রির', বা 'আলেপ লায়লার' গল্প বাংলাতে আমরা যাকে বলি আরব্য উপন্যাস, শিশুমনের উপযোগী ক'রে ইংলণ্ড তার যে কতো সংস্করণ করেছে তার ঠিক পাইনে। তার ইংরেজী কত সহজ। এমনি করেই তো এরা আপন ভাষা শেখে। জগতের সেরা জিনিসগুলো সম্বন্ধে এদের ছেলেমেয়েদের ধারণা হয়। দুনিয়ার সাহিত্যে যেখানে যা কিছু ভালো জিনিস আছে আগে ওদের ছেলেমেয়েদের উপযোগী ক'রে এরা তার একটা সংস্করণ করবে, পরে অন্য কথা। জার্মানীর গ্রিম্'স ফেয়ারী টেলস্, সুইসফ্যামলী রবিন্সন, স্ক্যানডিনেভিয়ার হ্যান্স্ এ্যাণ্ডারসনের পরীর গল্প, এসব তো দুনিয়ার সেরা শিশুসাহিত্য। আমাদের দেশের ক'জন অভিভাবক এ সব বইয়ের নাম জানেন ? আর কটা ছেলেমেয়েরই বা পৃথিবী বিখ্যাত এসব গল্পের বই পড়ার সৌভাগ্য হয় ?

ইংরেজ জাতের মতো এমন নিশ্চুপ জাত দুনিয়াতে আর নেই। মনে হয় এরা যেন বোবা। আমাদের দেশের রাস্তাঘাটে চেনা অচেনা লোককে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে বেশ আলাপ করতে দেখি। সাধারণ কুশল থেকে শুরু করে মায় চাকুরী বাকুরীর মাইনে ও হাঁড়ির খবর পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে দেখি। এতে যে জিজ্ঞেস করে এবং যে জবাব দেয়-দু'জনেই সমান অংশ গ্রহণ করে। সমান আনন্দ পায়। আমাদের দেশের মানুষের জীবন ধীর, শান্ত। মন্থরতায় ভরা। চলছে তো চলছেই। গল্প করছে তো করছেই। শিক্ষা নেই। তাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে এতো সময় হেলায় অপচয় করতে পারে। ঘরে ব'সে অকারণ পরচর্চায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। যৌবনে অনাবশ্যক অলস কল্পনায় মূল্যবান সময় নষ্ট করতে পারে। জীবনের গতি যেখানে গরুর গাড়ীর মতো সেখানে সময় সম্বন্ধে টন্‌টনে জ্ঞান আমাদের দেশের লোকের কি ক'রে হবে ? অদ্ভুত এ ইংরেজ জাত। রাস্তায় বেরোলে দেখি শুধু জন ও যানস্রোত চলছে। নদীস্রোতের মতোই তাদের গতি। কোথাও বিশ্রামের অবকাশ নেই। সুতরাং পথে দাঁড়িয়ে পরিচিত লোকেরাও যে একটু সুখ-দুঃখের গল্প করবে তার আর ফুরসৎ কোথায় ? ট্রেনে, বাস টিউবে হাজার লোক পাশাপাশি বসেছে। আমাদের দেশের মতো কেউ কারো সঙ্গে গল্প করে না। ট্রেন কিংবা জাহাজে চলতে গিয়ে কেউ কারুর খবরের কাগজটাও চেয়ে পড়ে না। একজনকে খবরের কাগজ পড়তে দেখলে আর একজন গলা বাড়িয়ে তার খবরের কাগজের উপর নজর দেয় না। অদ্ভুত আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন জাত। এ শিক্ষা তারা মা বাবার কাছ থেকে শিশু বয়স থেকেই পেয়ে আসছে। শৈশবে তারা যা শেখে, সারা জীবনে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তারই চর্চা ক'রে যায়।

একটি ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো। তাদের বাড়ীতে ছোট ছোট চারটি ছেলেমেয়ে আছে। তারা যে গোলমাল করে না, তা নয়। তবে আমাদের শিশুদের মতো অতোটা নয়। যতটুকু করে তাতেই দেখি ওদের মা-বাবারা অতিষ্ঠ। তাই ব'লে আমাদের মতো ওরা ছোটদের পিঠে গোটা দু'চার রাম কিল বসিয়ে দেয় না। তাদেরকে বাগ মানাবার স্বতন্ত্র কৌশল ওরা আবিষ্কার করেছে। যে ছেলেমেয়ে বাড়ীতে যতো কম গোলমাল করবে

তার জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেখানে গোলমালের প্রতিযোগিতা চলে সেখানে এদের চলে চুপ থাকার প্রতিযোগিতা।

এ শুধু একটি বাড়ীর ধর্ম নয়। ইংরেজ জাত এমন করেই তাদের ছেলেমেয়ে মানুষ করে। ছেলে বুড়ো সকলের জন্যেই আশ্চর্য হাসির খোরাক থাকে এখানকার নাম করা 'পাঞ্চ' (Punch) নামক একটি পত্রিকায়। শিশুমনের একটি চমৎকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম তাতে। গত সিকি শতাব্দীর মধ্যে ইলংণ্ডকে দু'দুটো মহাযুদ্ধের তাল সামলাতে হয়। ফলে আগে যেখানে এদের জীবনে ছিল স্বচ্ছন্দ-সচ্ছলতা, এখন সেখানে প্রতি পরিবারেই খরচপত্রের টানাটানি দেখা যাচ্ছে। শিশুদেরও চুপ থাকার জন্যে বৃত্তি ও পুরস্কার তাতে ক'রে ধীরে ধীরে ক'মে যাচ্ছে। কতকগুলো শিশু এরই জন্যে এক কনফারেন্সে মিলিত হয়েছে। তাদের একজনের এক এক রকম মস্ত অভিযোগ। একজন বলছে, ড্যাডির জুতোটা এনে দিলে আগে যেখানে ছ পেনি বকশিস পেতাম এখন সেখানে কমে গিয়ে হয়েছে দু'পেনি। আর একজন বলছে, মা যখন রান্না করে তখন আমি চুপ ক'রে থাকলে তার জন্যে আগে বখশিশ পেতাম দু'পেনি; এখন পাই তার বদলে শুধু মিষ্টি কথা। এমনি ক'রে সকল শিশু মিলে তাদের মা-বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এর প্রতিকার কিভাবে করা যায় তা ভাবছে। শেষে ঠিক হলো, ট্রেড ইউনিয়নের মতো একটি মিলিত ফ্রণ্ট খোলার আর স্ট্রাইক করার কথা। যুদ্ধের ফলে এদের সাধারণ মানুষের জীবনের মানও যে কতোটা নেমে এসেছে, বড়োদের লেখা শিশু মনের সুন্দর প্রকাশ থেকে তা বেশ বোঝা যায়। আরও দেখি শিশু বয়স থেকে এরা কি ক'রে চুপ ক'রে থাকতে শেখে। বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে চুপ থাকাটা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়। তাই দেখা যায় এরা কথা বলতে জানে না। পাশাপাশি ঘরে ইংরেজদের সঙ্গে সারা জীবন কাটিয়ে দিলেও ওরা যেচে আলাপ করবে না। তাই ব'লে যে ওদের মায়া মমতা নেই, প্রাণ নেই তা নয়। একবার যদি ওদের সঙ্গে নিজে এগিয়ে গিয়ে কোনো রকম আলাপ করতে পারা যায়, তা হ'লে দেখা যাবে ওরাই সব চেয়ে বড়ো বন্ধু হয়ে গেছে। ইংরেজ চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্যের জন্যেই আজও এরা এতো বড়ো।

আট

ছেলেমেয়েদের প্রতি মা-বাবার স্নেহ যত্ন তাদের জীবনের পথে এগিয়ে যাবার জন্যে কতো যে উপকারী, আমাদের দেশের অধিকাংশ মা-বাবাই তা জানে না। ছেলেমেয়েদের স্কুলে দিয়ে দিলেই গতানুগতিক ভাবে দিন আসে, দিন যায়। আসে পরীক্ষার পর পরীক্ষা। ছেলেমেয়েরা হয়ত পাশও করে। ওপরের ক্লাশে ওঠে। মা-বাবা মনে করে ছেলে-মেয়েদের বেশ লেখাপড়া হচ্ছে। তাদের কর্তব্য পালন করা হচ্ছে। তাতেই তারা সান্ত্বনা পায়। ধনী ও সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে দেখি অনেকে তাদের পুত্রকন্যাদের জন্যে গৃহ শিক্ষকও রাখে। তাতে মা-বাবার সান্ত্বনার পরিমাণ বাড়ে। সন্তানের প্রতি দায়িত্ব শোধ হ'লো ব'লে তারা

আরও বেশী আনন্দ পায়। অর্ধশিক্ষিত এমন কি শিক্ষিত পরিবারেও দেখেছি মা-বাবা ধম্‌কে ধম্‌কে তাদের শিশু সন্তানদের পড়তে বসায়। কাছে ব'সে তাদের পড়াশুনার অতি তদারক করতে গিয়ে শেষে মারধর ক'রে মনে করে বেশী পড়ানো হলো। এতে ছেলেমেয়ের পড়াশোনা তো হয়ই না, পড়াশোনার প্রতি ভালোবাসা বা আগ্রহও তাদের জন্মে না। বরঞ্চ, পড়ার নামে ঐ কাঁচা বয়সে তাদের রীতিমতো ভয় ধ'রে যায়। ফলে আমাদের দেশের যে কতো অগণিত শিশুমতি বালক-বালিকা জ্ঞানরাজ্যের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না তার হিসাব আর কে রাখে ? তাছাড়া লেখাপড়ার জন্যে যে পরিবেশের প্রয়োজন আমাদের দেশে কয়টা বাড়ীতেই বা তা আছে ? যে বাড়ীতে একসঙ্গে তিন চারটা ছেলেমেয়ে ভাইবোন পড়ছে, একত্রে পড়তে বসলে তারা তো চেঁচিয়ে পড়তে গিয়ে হাট বসায়। এর ওপরে আছে পড়াশুনার স্বতন্ত্র ঘরের অভাব। যেখানে ছেলেমেয়েরা পড়ছে সেখানেই হয়তো অভিভাবকেরা, সদাশয় গুরুজনেরা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সংসারের কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসেব নিকেশ করলেন, বাজারের ফর্দ তৈরী করলেন কিংবা প্রতিদিনের আলাপ-আলোচনা করলেন। পড়ুয়াদের কচি মন বই-এর পাতায় আর গেলো না। তারা পার্শ্বের গল্প সল্প, হাসিঠাট্টা, মশকরা ও ইয়ারকির দিকে সহজেই আকৃষ্ট হ'লো। এতো সব অসুবিধা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ভেতর দিয়েও যে আমাদের দেশের কিছু ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখে বড়ো হচ্ছে, তাদের কথা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাই! তারা যতো না পরিবেশের সৃষ্টি, তার চেয়ে বেশী তারা দেশের প্রতি খোদাতায়ালার দান।

যদি কোনোদিন আমাদের দেশের সব ছেলেমেয়ে যথার্থ লেখাপড়া শিখে মানুষ হয় সে দিন হয়তো তাদের ছেলেমেয়ে কি নাতি-নাতনীরা আর অসুবিধায় পড়বে না। তাই মনে হয় দেশের সকলের শিক্ষা ছাড়া দেশের কোনো কল্যাণই হ'তে পারে না।

এখানে দেখছি, এরা এদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য কি যত্ন না নিচ্ছে। যারা আজ শিশু কিছু দিন পরে তারা বড়ো হয়। বুড়ো হয়। বুড়োরা শিশুদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেয়। এজন্যে এদের দেশে এদের কালের শিশুদের মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুলতে এমন ক'রে মন দিয়েছে। শিশু মায়ের পেটে থাকতেই মায়ের এবং শিশুর যত্ন নিতে শুরু করে এখানকার সরকার। এদের সরকার সত্যিই জনসাধারণের সরকার অর্থাৎ এদের প্রত্যেকটি লোকের যাতে ভালো করা যায় সে জন্যেই প্রাণপণ চেষ্টা করে সরকার। এদেশে বিনা চিকিৎসায় কেউ মারা যেতে পারবে না। অসুস্থ হ'লে বাড়ীর নিকটবর্তী ডাক্তারের কাছে কিংবা হাসপাতালে যাও। ডাক্তারের ভিজিট লাগে না। সরকার তাকে বেতন দিচ্ছে। লোকের উপকারের জন্য আছে ডাক্তার। ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে যে কোন ঔষধের দোকানে গেলে বিনা পয়সায় ওষুধ পাওয়া যাবে। যে জাত রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্যে এতোটা ক'রে যাচ্ছে সে জাত তার ভবিষ্যৎ বংশাবলীর স্বাস্থ্য যাতে ভালো হয় তার জন্য চেষ্টা করবে, সে তো জানা কথা।

এখানে শিশুর জন্মের আগে থেকেই তার মার যত্নের ভেতর দিয়ে শিশুর যত্নের শুরু হ'লো। তখন খাওয়া দাওয়া, পথ্যাপথ্যের দিকে নজর রাখা এবং শরীরের কি পরিমাণ উন্নতি হচ্ছে সে জন্যে নিয়মিতভাবে ওজন নেওয়ার কতো কতো যে বন্দোবস্ত এদেশের

আছে, দেখে তার কূল পাইনে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রতি শিশুকে তার একটা নির্দিষ্ট বয়স অবধি কমলার রস, খাঁটি মধু এবং নানা পুষ্টিকর খাবার বিনামূল্যে বিতরণ করে এদেশের সদাশয় সরকার। ছয় সাত কি আট বছর পর্যন্ত এক একটা শিশুকে মনে হয় একেবারে পুতুলের মতো। চেহারা যেমনই হোক তার স্বাস্থ্য ও শরীরের গড়নের দিকে দেখলে শুধু চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। শিশুর কমনীয়তা, লাবণ্য ও স্বাস্থ্য ইংলণ্ডে যেমন দেখা যায় ইউরোপের অন্য কোন দেশে আবার তেমনটি নয়। প্যারিসেরও শিশু দেখলাম, কিন্তু ইংলণ্ডের শিশুদের মতো এমন 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' আর কোথাও নজরে পড়লো না।

এ ছাড়া ইংলণ্ডের অধিকাংশ মা-বাবাই তাদের নিজেদের শিশু সন্তানের প্রতি যথাবিহিত নজর রাখে। এখানকার শিশুদের জন্যে অবৈতনিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। কিন্ডার গার্টেন এবং মন্টেসরী প্রথায় এদের শিশুরা লেখা পড়া শেখে। শিশুদের এ স্কুলগুলো শিক্ষার দিক থেকে দুরন্ত শাসনে বাধা নয়। এগুলো তাদের খেলা ঘরের মতো। যে সব মা-বাবা জাতীয় জীবনের এবং নিজেদের আর্থিক উন্নতির জন্যে বাইরের কাজ করতে বাধ্য হয় তারা হয়তো নিজেদের শিশুদের দিকে তেমন নজর দিতে পারে না; এমন মা-বাবারা তাদের ৩/৪ বছরের শিশুদের নার্সারীতে পাঠায়। নার্সারী এবং কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে নানা রকম খেলাধূলা ও খাবার দাবারের আয়োজন আছে। স্কুল থেকেই বিনা খরচায় তাদেরকে ছড়া ও পড়ার বই দেওয়া হয়। খেলাধূলা ও পড়াশোনা হয় স্কুলের ভেতরেই। স্কুলের বাইরে গেলে কি বাসায় ফিরে এলে স্কুলের পড়াশোনার জন্যে তাদের আর দুর্ভোগ পোয়াতে হয় না। শিশুরা স্কুলের নামে উৎফুল্ল হয়। আমাদের দেশের মতো পড়াশোনা শিশুদের ওপর ভার হয়ে দাঁড়ায় না। সেখানে স্কুল জীবন এবং পড়াশোনা তাদের অফুরন্ত আনন্দের উৎস হয়ে রয়েছে।

মা-বাবারা তাদের শিশুদের যাতে মারধর না করে তার জন্য শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী (Society for Preventing Cruelty to Children) বহু সমিতি আছে। মা বাবাদের অযথা উৎপাত থেকে এ সমিতিগুলো শিশুদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করে। শিশুদের ওপর কর্তৃত্বের সীমা লঙ্ঘন করলে মা বাবাদের অনেক সময় শাস্তিও পেতে হয়। আমাদের কাছে এ খবর যেমন বিস্ময়কর তেমনই অদ্ভুত।

শিশুদের যথারীতি মানুষ ক'রে তুলবার জন্যে এদের মনের দিকে নজর দিয়েছে সারা ইংলণ্ড। শিশুর মন একটা অদ্ভুত জগৎ। শিশুরা তো শিশুই। তাদের মন কি চায়, কি তাদের প্রয়োজন তারাই কি সব সময়ে বোঝে, না তাদের মা বাবাই সব জানে! তাদের মনের চাহিদা মেটানোর জন্যে শিশু জগতের মনোবৈজ্ঞানিকদের এখানে কতো যে গবেষণা তার আর অন্ত নেই। এখানে হয় সারাটা দেশকেই শিশুর আনন্দ নিকেতন ক'রে গ'ড়ে রাখা হয়। তাদের এক এক বয়সের উপযোগী এক এক রকম খেলনার সাহায্যেই এদেশ একদিনে শিশুদের বশ করতে চেয়েছে, অন্যদিকে আবার তারই সাহায্যে তাদের মনোজগতের সামনে তাদের অগণিত আপনার জগতের রহস্য খুলে ধরেছে।

লণ্ডনের ছোট বড়ো অধিকাংশ দোকনেই শিশুদের জন্যে স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। বড়ো

বড়ো দোকান 'সেলফরীজ', 'অষ্টিনরীড', 'আর্মী নেভী' প্রভৃতিতে আবার শিশুদের আছে টয় টাউন (Toy Town), যার অর্থ শিশুদের খেলনার শহর। এক একটা দোকান যে কতো বড়ো তা বলে শেষ করা যায় না। এদের একটা বড়ো দোকানে ঢাকার সবগুলো বড়ো দোকান আর তাদের মালপত্র সব ধ'রে যাবে। সুতরাং কোনো দোকানে খেলনার শহর যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা যে একটা শহর বিশেষ তা সহজেই ধারণা করা যায়। এক একটা দোকানে এ ধরনের এক এক 'টয় টাউনে' ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিসই বেশী রয়েছে। তাতে কতো রকমের কাঠের ঘোড়া, উড়োজাহাজ আর মোটর। কাগজ অথবা কাঠের সাহায্যে শিশু যাতে আনন্দ পায় এমন রূপকথার, পরী রাজ্যের আরব্যোপন্যাসের গল্প কাহিনীগুলোর নানা খেলনার সহজ ও সুলভ সংস্করণ তৈরী ক'রে রাখা হয়েছে। এদেশেও আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের গল্পের আবেদন কম নয়। সম্পূর্ণ গল্পটা পিচবোর্ড ও ছবিতে বই-এর আকারে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়াশোনার দরকার হয় না। গল্প শোনার সঙ্গে ছবি দেখেই সব বোঝে। আর বড়দের চেয়েও বেশী আনন্দ পায়। ওদের শিশুরা যাতে আসল আনন্দ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মন তাদের বিকশিত হয়ে ওঠে তার প্রতি জোর দিয়েই খেলনা তৈরীর পেছনে ওদের কারিগরেরা নজর দিয়েছে মনোবৈজ্ঞানিকের মতো।

নয়

লণ্ডনে একদিন দেখতে গেলাম এখানকার এক বিখ্যাত 'জু'। লণ্ডন শহরের বুকের ওপর রিজেন্ট পার্ক, তারই মধ্যে এখানকার চিড়িয়াখানা। সওয়া শ বছর আগে এ চিড়িয়াখানার গোড়াপত্তন হয়। এতোদিনে ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠেছে এটি। আজকের যারা শিশু, তারাই হলো আগামীকালের নাগরিক। ইংরেজ জাত সেই শিশুদের কি ভাবে চোখে দেখিয়ে হাতে কলমে শিখিয়ে ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে গ'ড়ে তুলছে তা না দেখলে ভালো ক'রে বোঝা যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জীব-জানোয়ার আর তার আবহাওয়ার কথা ভূগোলে প'ড়ে শিখা যায়। পরীক্ষা পাশের জন্যে মুখস্থ করতে হয়। কিন্তু যদি নানান দেশের জীব জানোয়ার আর সে সব দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এক জায়গায় চোখে দেখতে পাওয়া যায় তা হ'লে কি ভালোই না লাগে। মুখস্থ করতে হয় না। চোখে দেখেই সব কিছু শিখে নিতে পারা যায়। রিজেন্ট পার্কের 'জু'-তে গিয়ে দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেরই জীব-জানোয়ার দেখলাম। আবার যে দেশের জীব-জানোয়ার তাকে রাখাও হয়েছে ঠিক সে দেশেরই আবহাওয়া তৈরী করে। জিরাফ, হাতী, বাঘ, সবগুলোর জন্যে গরম ঘর। বরফের দেশ দক্ষিণ মেরু। সেখানকার সাদা ভালুকগুলোর জন্যে পাহাড়ের মত উঁচু ঘর। তার আবহাওয়াও রীতিমত ঠাণ্ডা। পাহাড়ের গর্তে যে সব জানোয়ার থাকে, নকল পাহাড় তৈরী ক'রে তার মধ্যে গর্ত কেটে তাতে সে সব দেশের বড়ো বড়ো ছাগল কি ভেড়া জাতীয় বড়ো বড়ো শিংওয়ালা প্রাণীগুলোকে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে যে সব

জানোয়ার পাওয়া যায় তার কতকগুলোকে বলে Sea Lion—সমুদ্রের সিংহ আর কি। সেগুলোকে রেখেছে পাহাড়ের নীচে সমুদ্রের মতো চওড়া গভীর গর্তে পানির মধ্যে। এই 'জলসিংহ' গুলো আমাদের পদ্মার শুশুকের মতো।

আমাদের দেশে যে সব পাখী দেখা যায়, সেগুলোকেও দেখলাম এখানে। মায় শকুন পর্যন্ত। বাঁশের জঙ্গলে কিংবা ছোট খালে বিলে আমাদের গ্রামে যে সব দোয়েল শ্যামা পাখী দেখা যায়, তারাও বাদ যায় নি। তাদের থাকবার জায়গা করা হয়েছে আমাদের গ্রামাঞ্চলের বাঁশঝাড়ের মতো বাঁশ ঝাড় আর তার পাশে সে রকমের খাড়িতে। ভারি ভালো লাগলো নিজের দেশের পাখীগুলোকে এখানে এমন ভাবে দেখে।

আগে বললাম, সওয়া শ বছর আগে এ চিড়িয়াখানার গোড়াপত্তন হয়। জিরাফ আসে ১৮৩৪ সালে। শিম্পাঞ্জী, জলহস্তী ও সাপ ১৮৫০-এ। হাতীগুলো শীতকালে থাকে ঘরের মধ্যে। গরমের সময় বাইরে। তখন দর্শকেরা হাতীতে চড়ার শখও মিটিয়ে নিতে পারে।

চিড়িয়াখানাটা একটি বড়ো রাস্তার দু'ধারে গড়ে ওঠেছে। নীচে দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ এপাশ ওপাশকে যোগ করেছে। সব চেয়ে ভালো লাগলো সাপের ঘরগুলোতে গিয়ে। মনে হলো যেন ছবির দেশে পৌঁছলাম। ঘরের মধ্যে যে দেশের সাপ সে দেশের ছবি আর সে দেশের তাপ। বালুর উপরে কত কত সাপ শুয়ে আছে, দেখে বিস্মিত হলাম। আমাদের দেশের কোনো কোনো সাপ নাকি গাছে থাকে। শোনা যায় ওরা নাকি উড়ে এসে মানুষের কপালে কামড়ায়। সত্যি কামড়ায় কি না জানিনা। তবে চিড়িয়াখানাতে এসেও ওরা তাদের পরিবেশ হারায়নি গাছের ডালে নিজের রং-এ রং মিশিয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

এদেশের ছেলেমেয়েরাও চিড়িয়াখানার প্রত্যেকটি জীব-জন্তু সম্বন্ধে খুব উৎসুক। তারা প্রায়ই তাদের দেখে আসে। কিছু দিন আগে বি. বি. সি. থেকে প্রচার করা হলো চিড়িয়াখানার পাণ্ডাদের মধ্যে বড়ো পাণ্ডাটির খুব অসুখ। পাণ্ডা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের একটি জন্তু। ছোট্ট ভালুকের মতো দেখতে। মাথাটা সাদা লোমে ঘেরা। কান ও চোখের কাছে কালো লোম। মনে হয় যেন শো কেসে রাখা একটি পুতুল। রিজেন্ট 'জু'তে অনেকগুলো পাণ্ডা ছিল। তার মধ্যে বড়োটি ছিল চীন দেশের। চীনদেশের নাম তো তুয়াং চুয়াং, চিং চং, হো হো এসব ধরনের। চীন থেকে আনা হয়েছিল বলে বড়ো পাণ্ডাটির নাম লিয়েন হো। তার খাবারের অসুবিধা হওয়ায় শরীরে ভিটামিন কম পড়ে। ফলে তার অসুখ হয়। তবে সে খায় কি ? বাঁশের ডগা। তাও আবার কচি হওয়া চাই। বি. বি. সি. থেকে লিয়েন হোর অসুখের কথা প্রচারিত হবার পর কর্তৃপক্ষ সেদিনই ১৭টা টেলিফোন পায়। প্রত্যেকেই বলে সে অসুস্থ পাণ্ডার খাবার যোগাবে।

এরা জীব-জানোয়ারকে শুধু খাঁচায় বন্দী করেই রাখেনি। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিও নজর রেখেছে। তাদের প্রতি ইংরেজ জাতের কতো দরদ। আমরা একদিন লিয়েন হোকে দেখতে গেলাম। মনে ভাবলাম বেচারা বোধ হয় এতোদিনে শেষ হয়ে গেছে। ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। চিড়িয়াখানার লোকেরা বললো, পেনিসিলিন, গ্লুকোজ আর ভিটামিন ইন্‌জেকশন দিয়ে ওকে সারিয়ে তোলা হয়েছে। আমাদের দেশে মানুষ চিকিৎসার অভাবে মরে। আর এখানে পশুরও সুচিকিৎসার অভাব হয় না।

এ চিড়িয়াখানার মধ্যে ছোট শিশুদের জন্যে নানা রকমের সুন্দর আর শান্ত স্বভাবের জীব-জানোয়ার দিয়ে গ'ড়ে তোলা হয়েছে আর একটি চিড়িয়াখানা। ছাগল, লুমড়ি, হরিণের বাচ্চা, ক্যাঙ্গারু, এরাই এখানে বেশী। ছেলেমেয়েরা এদের খাবার দেয়, বিনিময়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওরা খেলা করে। পশু ও মানুষের বাচ্চাদের নির্দোষ খেলা আর বিমল আনন্দের বহর দেখে আশ্চর্য হলাম।

রিজেন্ট 'জু'তে ইতিহাস শেখানোরও ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে এরা। কিউ গার্ডেনস-এর কথাও এর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। 'জু'তে নানা দেশের জীব-জন্তু আর কিউ গার্ডেনস-এ দুনিয়ার নানা দেশের গাছপালা। মনে পড়ছে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের কথা। সেখানে একটা বট গাছ আছে বহুদূরব্যাপী। ঝুরি নেমে নেমে আয়তন আর পরিধি ক্রমেই বড় হয়ে গেছে। আমার ছেলেবেলায় এমনি একটা অশ্বত্থ গাছ দেখেছিলাম মুর্শিদাবাদ জেলার খয়রামারী গ্রামের পার্শ্বে। আমাদের দেশের লোক প্রকৃতির কোনো জিনিসের যত্ন জানে না। মূল্য বোঝে না। শুনেছিলাম কিছুদিন পরে নানা লোকে গাছটির এক একটা 'ব' কেটে নিয়ে জ্বালানি করেছে। বিলেতে এসে আমাদের দেশের সঙ্গে এ দেশের লোক যতোই মনে মনে তুলনা করছি বার বার ততোই মনে পড়ছে নানা দিক থেকে আমরা যে কতো পেছনে আছি শুধু সে কথা। আমাদের দেশ দুশো বছর শাসন ক'রে টাকা পয়সা লুটে নিয়ে সে টাকা দিয়ে ওরা সব কিছু গড়েছে। এর মধ্যে কিছুটা সত্যি আছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের দেশের টাকা থাকলেও সৃষ্টি করার, কোন তাগিদই দেশের লোকের চরিত্রের মধ্যে নেই। আমরা যেখানে ক্ষয় করি এরা সেখানে জমা ক'রে জাতির ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলে।

যাক, কি কথায় কি কথা এসে পড়লো। বলছিলাম কিউ গার্ডেনস্-এর কথা। সেন্ট্রাল লণ্ডন থেকে প্রায় মাইল বিশেক দূরে বাগানটি। নানা দেশের ফুল আর গাছপালা নিয়ে ভরা। ইংরেজরা ফুল ভালোবাসে। কতো যে ভালোবাসে তার পরিচয় পাওয়া যায় এদের দরিদ্রতম ব্যক্তিরও বাড়ীর সামনে একটি ছোট বাগান দেখে। বাড়ীর সামনে একটি ছোট্ট বাগান দেখে। নিজের হাতের গড়া বাগান। মার্জিত রুচির পরিচয় আছে তাতে। নিজেই কেটে ছেঁটে সুন্দর ক'রে রেখেছে। সেই ইংরেজ জাত দুনিয়ার সব দেশের ফুল আর গাছপালাকে, যে দেশের গাছপালা সে দেশেরই আবহাওয়া তৈরী ক'রে, এখানে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে। কাঁচের বড়ো বড়ো ঘরের মধ্যে গরম দেশের গাছগুলা ঠাঁই পেয়েছে। নারিকেল গাছও বাদ যায়নি। মনে হলো এরা দুনিয়ার ওপর শুধু রাজত্বই করেনি, জগতের সকল বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ মুঠোর মধ্যে বন্দী ক'রে এনে নিজের দেশের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে।

এ বাগানেও একটা যাদুঘর আছে। কাঠের আস্তানা এটা। দুনিয়ার সকল দেশেরই কিছু কিছু শুক্‌নো কাঠ আছে এখানে। দেখলাম ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একটা গাছ কেটে আনা হয়েছে। প্রকাণ্ড চওড়া। গাছটি প্রায় দেড় হাজার বছরের। হযরত মোহাম্মদের জন্ম সাল ৫৭০ থেকে নিয়ে নেপোলিয়ানের উত্থান পর্যন্ত এর বয়স। পদ্মার চরের বালির ওপর

যেমন পানির ঢেউয়ের দাগ পড়ে গাছটির গায়েও দেখলাম প্রতি বছর তেমন ক'রে এক একটা দাগ রেখে গেছে! বয়সের চিহ্ন বটে। এমনি করেই কালে কালে মানুষ নানা জাতের পশুপাখী গাছপালা সব কিছু নিয়ে দুনিয়াটা বুড়ো হচ্ছে। এ বৃদ্ধ প্রাচীন পৃথিবীকে ধ'রে রেখে এরা এদের জাতিকে এর বৈশিষ্ট্য শেখানোর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে।

দশ

লণ্ডনের টিউব রেলওয়ের নাম দুনিয়া জোড়া। টিউব মানে সুড়ঙ্গ। শোনা যায় ঢাকার লালবাগ কেল্লার নীচে মোগল শাসনের সময় সুড়ঙ্গ পথ ছিল। মাটির নীচে দিয়ে বহু দূর পর্যন্ত এ পথ এগিয়ে গিয়েছিলো। আমরা যখন ঢাকায় এলাম তখন ইসলাম খাঁর সময়কার এ সুড়ঙ্গ পথের কথা শুনে ভারী কৌতূহল বোধ করলাম। পরী বিবির কবর আর লালবাগ কেল্লার সুড়ঙ্গ পথ দেখবার জন্যে সদলবলে সেখানে হাজির হয়ে মুসলিম শাসনের সমাধি দেখেছিলাম।

এককালে মুসলমানদের যা ছিল বিলেতে এসে দেখেছি পুরো মাত্রায় তার বিকাশ করেছে ইংরেজরা। পরিধিতে দুনিয়ার সব চাইতে বড়ো শহর লণ্ডন। আয়তনে ৬৯৩ বর্গমাইল। দালানকোঠা ঘরবাড়ীতে বোঝাই এ শহরটি। এক ঘরে গাদাগাদি ক'রে এখানে বহু লোক বাস করে না। প্রত্যেক লোকের জন্য ঘর চাই স্বতন্ত্র। তাই দোকানপাট, ঘরবাড়ী আর দালানে দালানে লণ্ডনের বুক ভ'রে আছে। এখানকার মানুষেরা কাজ বোঝে। কাজের জন্যে এক রকম ছুটেই চলে। তাই শহরের ওপর দিয়ে রেলপথ তৈরী ক'রে ঢাকার মতো লেভেলক্রসিং-এ পথে বেরিয়ে অত্যাচারে আটকে পড়তে এ জাতটা নারাজ। প্রতি ইঞ্চি মাটির সদ্ব্যবহার জানে এরা। মাটি এদের কম বলেও কিছুটা এমন হবে হয়তো। তাই সারা লণ্ডন শহর জুড়ে মাটির নীচ দিয়ে পাতাল-পুরীতে আর একটা শহর এরা গ'ড়ে তুলেছে। অধিকাংশ বাড়ীতেই যেমন বেস্‌মেণ্ট অর্থাৎ মাটির নীচে দু'একটা ঘর তেমনি লণ্ডন শহরের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে মাটির তলায় এখানকার সুড়ঙ্গ-রেলপথ।

উপর থেকে কিছু বোঝা যায় না। মাটির নীচে এমন কিছু আছে ব'লে মনেও হয় না। রাস্তার পাশ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ পথের মাঝখানে চারিদিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা সুড়ঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। ওপরে হয়তো লেখা থাকবে ষ্টেশনের নাম। কোথাও বা আণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্রান্সপোর্ট বা রেলওয়ে। আবার কোথাও দেখা যায় ঘরের একটি দরজার মতো। সেখান দিয়ে ঢুকে কয়েক ধাপ নীচে নেমে গেলে পাওয়া যাবে বিরাট ষ্টেশন। আমাদের দেশের মাটির উপর বড়ো বড়ো ষ্টেশনগুলো যেমন এদেশের মাটির নীচের ষ্টেশনগুলোও তেমনি। সেখানে টিকিটঘর। প্লাটফরম। সেখানেই সব। তার আবার তলা শুধু একটা নয়। মাটির ওপর থেকে সিঁড়ির কয়েক ধাপ নীচে নেমে এসে যেমন এ ধরনের একটা বিরাট ষ্টেশন দেখা যায় তেমনি আবার এর নীচেও কয়েক তলা থরে থরে সাজানো আছে। অতো নীচে নামা যদিও বা সহজ হয়, সেখান থেকে ওঠা তো আর তেমন সহজ

নয়। তাই এরা Escalator বা চলন্ত সিঁড়ির বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছে। মাটির ওপর থেকে সাধারণ সিঁড়ি বেয়ে প্রথম তলায় এলে তারপরের তলাগুলোতে যেতে এই এস্কেলেটরের সাহায্য নিতে হয়। তল্লাবাঁশের কতকগুলো চওড়া বাতা এক জায়গায় ক'রে সুতো দিয়ে একত্রে গেঁথে সিঁড়ির মতো বিছিয়ে দিলে যেমন হয়, এস্কেলেটরের একটা ধাপও তেমনি। মাটির নীচের প্রথম তলাগুলো থেকে তার নীচের তলাগুলোতে যেতে এ জীবন্ত সিঁড়ির প্রয়োজন। ওপর থেকে এসে এর একটাতে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই সাত আটটা ধাপ ফিতার মতো গড় গড় ক'রে চলার পর একেবারে সিঁড়ি হয়ে যাবে। তখন হয় তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকি কিংবা নীচে ওঠানামা করি, ঠিকমতো গন্তব্যস্থলে পৌঁছা যাবে। নামার জন্য যে ব্যবস্থা ওঠার জন্যেও তাই। নিজের কোন পরিশ্রম নেই। ইলেক্‌ট্রিসিটির চলন্ত সিঁড়ি ক্রমেই যেমন পাতাল-পুরীতে নেমে যাচ্ছে তেমনি সেখান থেকে উঠিয়েও নিয়ে আসছে। এমনি ক'রে একটার পর একটা প্লাটফরম পাওয়া যায়। এখানে দু'তিন মিনিট পরই গাড়ী আসছে। এক একটা ট্রেন প্রকাণ্ড। আমাদের ঢাকা কি চাটগাঁ মেইলের সমান, কি তারও বড়ো বই ছোট হবে না। প্ল্যাট-ফরমে গাড়ী এসে দাঁড়ালে যারা নামার তারা নেমে যাচ্ছে, যারা উঠবার তারা উঠে যাচ্ছে মাত্র দু'এক মিনিট সময়ের মধ্যে। তারপর সুড় সুড় ক'রে বিরাট দৈত্যের মতো গাড়ীটি সুড়ঙ্গ পথের মধ্যে ঢুকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। সুড়ঙ্গ পথের ষ্টেশনগুলো মাটির তলায় ব'লে দিনরাত সেখানে সমানে আলো জ্বলছে। আলোয় আলোয় দিন বরাবর সেই পাতাল-পুরীর রাজ্য। হাজার হাজার মানুষ রাস্তা দিয়ে পথ বেয়ে চলতে চলতে ইঁদুরের মত সুড়ঙ্গ পথের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ছে আবার সুড়ঙ্গ দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে প'ড়ে যে যার কাজে শহরের বুকে ছিটিয়ে পড়ছে। হ্যামষ্টেড ব'লে একটি ষ্টেশন আছে মাটির নীচে। সেটি আঠর তলা (১৯০ ফুট)। টেমস্ নদীর নীচ দিয়ে মাটির তলা দিয়ে ট্রেনে বা পায়ে হেঁটে কি ক'রে মানুষ চলাচল করে নিজের চোখে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো ছেলেবেলায় পড়া সে লাইনটি 'উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর, অপরূপ আর কিবা আছে এরপর।' লণ্ডন শহরের টিউব রেলওয়ে আমার কাছে ভারী আশ্চর্য লাগে। এর ভেতরে ষ্টেশন আছে। ইচ্ছে হ'লে সেখান থেকে টিকিট করা যায়। নইলে পাশে মেশিন আছে, সেখানে পয়সা ফেললে টিকটিও বেরিয়ে আসবে, আবার টাকাটা সিকিটা দিলে টিকিটের দামটা রেখে মেশিনই বাকী পয়সা ফিরিয়ে দেবে।

এগারো

লণ্ডনে পৌঁছার দু'দিন পরেই আমরা বকরাঈদের নামাজ পড়তে গেলাম লণ্ডন থেকে মাইল তিরিশেক দূরে ওকিং মসজিদে। লণ্ডনে মুসলমানদের আরও কয়েকটি মসজিদ আছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রবাসী জাহাজীদের কলোনী অঞ্চল পূর্ব্ব লণ্ডন আল্ডগেটে একটি। আর পাট্‌নীতে কাদিয়ানীদের মসজিদ। বেকার ষ্ট্রীটের ইসলামিক কালচারাল সেণ্টারেও ঈদের দিনে নামাজ হয়। লণ্ডনে ওকিং-ই সবচেয়ে বিখ্যাত মসজিদ।

বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হবে। মসজিদ কমিটির সৌজন্যে অন্তত একটি বেলার জন্যে সিদ্ধ খাবারের দেশে মুফ্‌তে রসনা পরিতৃপ্তিকর পাকিস্তানী খানা খাওয়া যাবে। আরও দেখা যাবে দুনিয়ার নানা জাতির মুসলমানকে। এক ঢিলে এতগুলো পাখী মারা যাবে দেখে লণ্ডন প্রবাসীরা তো বটেই, এমনকি ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থানকারী মুসলমানরাও ঈদের দিনটিতে ওকিং-এ নামাজ পড়তে আসে।

মসজিদের পাশে নানা জাতীয় ফল ফুলের গাছের ছায়ায় নামাজের জন্যে তাঁবু খাটানো হয়েছে। মসজিদের গেট সাজানো হয়েছে পাকিস্তানী-মিশরী আল-হেলাল আর আরবীয় তরবারী খচিত ঝাণ্ডা দিয়ে। পতাকার শোভা দেখলাম তাঁবুর উপরের চারপাশ দিয়ে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়, কেদা (মালয়ের একটা ষ্টেট), পাকিস্তান, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান, তুর্কী, মিশর, ইরাক, সিরিয়া, আরব ও মরক্কো প্রভৃতি মুসলিম দেশের নানা রঙের পতাকা জড়াজাড়ি ক'রে উড়ে জয় ঘোষণা করছে 'আল্লাহ্ ছাড়া দোসরা আর মাবুদ কেহই নাই আমার।'

মুসলমানদের ঈদের নামাজে ধর্মানুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠান ছাড়াও একটা বড়ো দিক আছে। সেটা হলো তার সামাজিকতা আর উৎসবের দিক। এর মাধুর্য ও সৌন্দর্য কম নয়। এতোগুলো জাতের এতো রকমের পাতাকা তলে এক আল্লাহ্ ও রসূলকে কেন্দ্র ক'রে এক ধর্ম বিশ্বাস বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশকে কি ক'রে একত্র করেছে ছোট্ট এই ওকিং মসজিদের প্রাঙ্গণে তার অপরূপ রূপ দেখে অমুসলিমের মনও চমৎকৃত হয়। ঈদের দিনে ওকিং-এ এসে নানাজাতের মুসলমানের মিলনে এক জামাত ও মিল্লাতের এদিকটা এত ক'রে চোখে পড়ে যে, অতি সাধারণ মানুষও তাতে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না।

এখানে এসে আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়লো। ইসলাম ধর্ম যে জগতের নানা দেশে ছড়িয়ে আছে, তার চাক্ষুস পরিচয় পেলাম। মিশর, আরব, সিরিয়া, ইরাক, পারস্য, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং আফ্রিকার বহু মুসলমান এসেছে। ভারত ও পাকিস্তানের আমরা তো অনেকেই ছিলাম এখানে। এক এক দেশের লোক দেখতে এক এক রকম। ভিন্ন ভিন্ন রকমের চেহারা ও শরীর অথচ ঈদের নামাজ পড়তে এসে সব দেশের মুসলমানই এক ধর্মের বাঁধনে ভাই ভাই হয়ে গেছে। নামাজ শেষে চেনা-অচেনা নানা দেশের মুসলমানের কোলাকুলি দেখে কি যে আনন্দ পাওয়া গেল তা বুঝানো কঠিন। এ কোলাকুলি এক দিকে যেমন মুসলমানে মুসলমানে অন্য দিকে তেমনি জাতিতে জাতিতে। সবচেয়ে বড়ো কোলাকুলি সাম্যের, মৈত্রীর এবং মানবতাবাদের। এর জোরেই ইসলাম একদিন বিশ্বের আচার-পীড়িত মজলুম মানুষের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এ সাম্যের বাণী এবং তার বাস্তব রূপ দুনিয়ার অমুসলমানকেও কম মোহিত করে না। ইউরোপে আমেরিকায় ইসলামের তেমন তবলিগ হয় নি। হ'লে আজ সেখানে আরও অনেক মুসলমান দেখা যেতো।

নামাজ হলো আরবীতে। একজন মিশরীয় মুসলমান অপূর্ব সুন্দর সুরে কোরআন শরীফ থেকে আবৃত্তি করলেন। আরবীর 'আ' স্বরধ্বনিটি বাংলার মতো ক'রে আমরা মুখের পেছনের দিক অর্থাৎ জিবের গোড়ার কাছাকাছি জায়গা থেকে উচ্চারণ করি। মিশরীয়দের

এ স্বরধ্বনি জিবের সামানের ভাগ থেকে তির্যকভাবে বেরিয়ে আসে। ভদ্রলোকের গায়ের রং গমের রং-এর মতো লালচে ফর্সা। তাঁকে দেখতে লাগছিলো ইংরেজের মতো। পারস্য, মিশর ও তুরস্ক প্রভৃতি দেশের লোক অবশ্য দেখতে অনেকটা ইউরোপ ও আমেরিকার লোকের মতো।

ইমাম সাহেব খোতবা পড়লেন সকলের বোধগম্য ভাষা ইংরেজীতে। যাদের কাছে খোতবা পড়া হয়, তাদেরকে ইসলামের সার কথা বোঝানোই খোতবার অর্থ। বহুদেশে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মোল্লাদের হাতে প'ড়ে ইসলাম বিকৃত হয়ে গেলো। ইংলণ্ডে দেখছি এখানকার চার্চের পুরোহিতেরা রীতিমতো শিক্ষিত। অশিক্ষিত কি অর্ধ-শিক্ষিত পুরোহিত ইংলণ্ডের কোন চার্চে নেই। ফলে এদের ধর্মব্যাখ্যা শুনলে জনসাধারণ তৃপ্ত হয়ে ঘরে ফিরে যায়। আমাদের দেশে অধিকাংশ ইমামই আরবী ভাষায় পারদর্শী নন! শুধু তোতাপাখীর মতো আরবী খোতবা প'ড়ে দিয়ে রুটিন বজায় রাখতে পারলেই এদের চ'লে যায়। ইংলণ্ডের মতো আমাদের রাষ্ট্রের এ বিষয়ে সচেতেন হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে যদি মাতৃভাষায় খোতবাটা পড়া হতো তাহ'লে অনেক মঙ্গল হতো আমাদের সাধারণ মুসলমানের। ওখানে নানান দেশের নানান লোক এসেছিল। ইংরেজদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাছাড়া এরা মোটামুটি সকলেই ইংরেজী বোঝে। খোতবায় ইমাম সাহেব যা বোঝাচ্ছিলেন সকলের শোনার ধরন দেখে মনে হলো সকলেই তা বুঝছে।

নানান দেশের মেয়েরাও ওকিং-এ এসেছে নানা বেশভূষায়। কেউ নামাজ পড়তে, কেউ দেখতে আর কেউ বন্ধুদের নেমন্তন্ন খেতে। ইংরেজরা সিদ্ধ ছাড়া তো আর কিছু খেতে জানেনা। জানলেও তা খায়না। এ সুযোগে তাই এখানকার প্রবাসী মুসলমানেরা তাদের বন্ধুবান্ধবদের আমাদের দেশী খাবার খাইয়ে বন্ধুত্ব গাঢ় করে। আর পাশ্চাত্যের লোকদের কাছে আমাদের দেশের মোগলাই খানার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

নামাজের পর নামাজের তাঁবুতেই মসজিদ কমিটির তরফ থেকে কয়েকবারে হাজার দেড়েক লোক খাওয়ানো হ'ল। সেই সঙ্গে আমরাও খেলাম দেশী পোলাও আর কালিয়া। ওকিং-এর এ খাওয়ার মধ্যে আর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মুসলমানদের হাতে হালাল করা টাটকা গোশ্‌ত ঈদের নামাজ উপলক্ষে একটি দিনের জন্য এখানেই পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের গোশ্‌তের মোটা ভাগ আসে আরজেনটিনা থেকে। বিদেশ থেকে যে গোশ্‌ত ইংলণ্ডে আসে জবাই হবার পর থেকে মানুষের পেটে গিয়ে পৌঁছতে তার তিন চারটে মাস লেগে যায়। ঠাণ্ডা দেশ ব'লে গোশ্‌ত নষ্ট হয় না। এর ওপরে আছে রেফ্রিজারেটার আর বরফ। দোকানে দিনের পর দিন এ গোশ্‌ত ঝুলতে দেখা যায়। ঈদের দিনে সাধারণ মুসলমান টাট্‌কা গোশ্‌ত খাবার আনন্দ মেটায়। আর ধর্মভীরুরা বহুদিন ফাঁকা থাকার পর হালাল গোশ্‌ত খাবার সুযোগ পেয়ে আল্লার কাছে এখানে শোকর গোজার করে।

ওকিং-এ নামাজ উপলক্ষে আমার কয়েকজন বিদেশী বন্ধুকে নেমন্তন্ন ক'রে এনেছিলাম। ইংরেজ চাউন, ডেরিক ও মাইকেল, ইরাণী নিক্‌পে, তুর্কী জিহ্‌নী, আরজেনটিনীয় বাওক আর ত্রিনিদাদের রামশরণ। আমাদের পাকিস্তানী খাবার ভালো লাগে

দেখে এরা প্রত্যেকেই দেখলাম বেশ পেট ভ'রে খেলেন আর আমাকে জানালেন হাজারো শুকরিয়া।

পৃথিবীর জনসমুদ্রের সঙ্গে মিশবার ও বিচিত্র শোভা দেখবার সুযোগ পাই লণ্ডনে। আজকের দিনে আরও শোভা দেখলাম মুসলিম জগতের। লণ্ডন দুনিয়ার কসমোপলিটন শহরগুলোর অন্যতম। ইংরেজ রাজত্বের সমৃদ্ধির সঙ্গে লণ্ডন শহর দুনিয়ার নানাদেশেরই স্নায়ু কেন্দ্র এবং তীর্থক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। এখানে নানা দেশ থেকে নানা লোক আসে। নানা কিছু শিখতে ও দেখতে। পৃথিবীতে মুসলমানদের রাজ্য যেখানে নেই এমন অনেক দেশেও মুসলমান বাস করে। মধ্য এশিয়ার তো কথাই নেই। এখানকার অধিকাংশ দেশই মুসলমানদের। ইংলণ্ড ভ'রে আছে নানান দেশের মুসলমানে। ওকিং মসিজদে নামাজ পড়তে গিয়ে দুনিয়ার নানান দেশের মুসলমান ও সার্বজনীন রূপের চাক্ষুস পরিচয় প্াওয়া যায়। ওকিং মসজিদকে কেন্দ্র ক'রে এখানে একটা মুসলিম মিশন কাজ করে। পত্রিকা বের করে, বক্তৃতা দিয়ে, সভাসমিতির আয়োজন ক'রে ইসলামকে এরা ব্যাখ্যা করছে এখানে। ইসলাম সম্বন্ধে খৃষ্টানদের যে ধারণা তা মোটেই সুবিধাজনক নয়। এদেশের সাধারণ খৃষ্টান মুসলমানদের সম্বন্ধে জানে যে, মুসলমানেরা ক্রুসেডার। খৃষ্টজগতের সঙ্গে মধ্যযুগে ইসলামের যে সংঘর্ষ হয় সেটাকেই আজ পর্যন্ত সাধারণ খৃষ্টানরা বড়ো ক'রে দেখছে এবং মুসলমানদেরকে যোদ্ধা ও আক্রমণকারী জাত হিসেবে ভেবে আসছে। ওকিং-এ মুসলমানদের মিশন সব রকমে যত্ন নিচ্ছে মুসলমানদের সম্বন্ধে এদের ভুল ধারণা ভেঙে ইসলামকে যথারীতি ব্যাখ্যা করবার।

ইসলাম বিশেষ কোন একটি জাতির ধর্ম নয়। নানাজাতি, নানাদেশ এ ধর্মের বাঁধনে কি অদ্ভুত ভাবে বাঁধা পড়েছে—এখানকার ঈদের দিনে ওকিং তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে অমুসলমানদের কাছে। ওকিং মসজিদের সামনে বিরাট সামিয়ানা খাটানো হয়। তার চারধার ঘিরে এক একটা মুসলিম দেশের পতাকা টাঙানো হয়। পতাকাগুলোর দিকে একবার চোখ বুলোলেই সে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, সউদি আরব, য়্যামন, লেবানন, ইরাক, সিরিয়া, কেদা, মিশর, জর্দান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, মরক্কো– একের পর এক ইসলামী নিশান উড়ছে। আর মাটির দিকে তাকালে এক এক দেশের অপূর্ব পোশাক পরিচ্ছদ ভূষিত এক এক রকম চেহারা দেখা যাচ্ছে সেখানকার নরনারীর। তার মধ্যে আফ্রিকার নিগ্রো মুসলমানের পোশাক পরিচ্ছদই অদ্ভুত ধরনের। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানেরা চীন জাপানের পীত জাতের মধ্যে যেমন রঙের সুষমা রক্ষা করেছে তেমনই মরক্কোর মুসলমানেরা ইউরোপের শ্বেতজাতির সবচেয়ে নিকটবর্তী ব'লে দেহের রং-এর দিক থেকে ভারসাম্য রক্ষা করেছে। মাঝখানে আমরা না কালো না ফরসা। কিন্তু আফ্রিকার নিগ্রোরা জাম কালো। ওকিং-এ দেখলাম নানাজতির ফ্ল্যাগ, পোশাক আর নানান জাতির নানা রং। এতো বৈষম্য অপূর্ব সুন্দর বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। সে বাঁধন হচ্ছে এক আল্লাহ এবং তার রসূলে বিশ্বাস। নামাজের পরে সকলে জাতীয় পোশাক আচার ও রং নির্বিচারে যখন কোলাকুলি করে তখন সে দৃশ্যে মুগ্ধ হ'তে হয়। ইসলামের এ সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের রূপ দেখেই ওকিং মসজিদের

ইমামের হাতে হাত রেখে কয়েকজন ইংরেজ মহিলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। এর পরে প্রায় হাজার বারো শ লোক বিরাট ঈদের ভোজে আপ্যায়িত হলো। দেখলাম রান্না বান্নার আয়োজন থেকে বিতরণ ও খাওয়ানোর দাবী মেটানো পর্যন্ত কাজ পাকিস্তান এয়ারফোর্সের ছেলেরা দেশের সুনাম বজায় রেখে সম্পন্ন করলো। এতোগুলো দেশের মধ্যে পাকিস্তানের প্রধান অংশ গ্রহণ ধনজন ও মানের দিক দিয়ে বিদেশে আমাদের গর্বের কারণ বটে।

বারো

অধিকাংশ মানুষের জীবন কাটে স্বদেশে এবং স্বজাতির মধ্যে। নিতান্ত ভাবুক এবং চিন্তাশীল না হ'লে নিজের দেশে এবং জাতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যও সহজে কারুর চোখে ধরা পড়ে না। জীবন যখন সহজ ভাবে চলে তখন জীবন সম্বন্ধে ভাববার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য চিন্তাশীল লোকের সংখ্যা দুনিয়ার সব দেশেই কম। তবু যখন জীবনের চলার পথে কোন কিছুর অভাব ঘটে তখন সাধারণ মানুষও সে বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে।

নিজের দেশের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে স্বজাতির ও স্বদেশের যতোটা জানা যায় বিদেশে নানা মানুষ এবং নানা বস্তুর সংস্পর্শে এসে স্বদেশকে লোকে আরও ভালো ক'রে চিনে। কারণ তখন তাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়। প্রত্যেকটি জিনিসকে সে বিচার করতে শেখে।

দেড় বছর অবধি ইংলণ্ডে বাস ক'রে ইংরেজ জাতকে দেখছি। এদের জীবনের অনেকগুলো দিক আছে যা দুনিয়ার অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিলে না। বিদেশীরা চোখ দিয়ে এদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা যায়। কোন্ গুণে এরা বড়ো হয়েছে, কি বৈশিষ্ট্যে এতোকাল দুনিয়াকে শাসন করেছে, এদের অপসৃয়মান অতীত গৌরব অস্তমিত হ'তে গিয়েও কোন্ মাহাত্ম্যে এদেশের 'টোয়াইলাইটের' মতো লম্বমান রেখা টেনে দিয়ে যাচ্ছে, এ বিষয় ভাবলে স্তম্ভিত না হয়ে পারা যায় না।

এদেরকে যতো দেখছি ততোই মনে মনে প্রশ্ন করি একটি জাত কিসে বড়ো হয়? এক কথায় অবশ্য এর উত্তর দেওয়া যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষিত ক'রে তোলা। তাহ'লে এক পুরুষে না হয় দুই পুরুষে জাতি অগ্রসর না হয়ে পারবে না। শিক্ষা পেলেই নিজের দায়িত্বজ্ঞান বাড়বে এবং সকলেই নিজের কাজটা ঠিক মতো করবে। জাতির প্রত্যেকেই যদি নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং নিজের বিবেক ও বুদ্ধির কাছে নিজেকে দায়ী করে, নিজের কাছে তৎপর হয়ে উঠে, তাহলে প্রত্যেকের সংঘবদ্ধ ও সমবেত চেষ্টায় জাতি দিনে দিনে বড়ো হয়ে উঠবে।

কথা উঠতে পারে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ইংলণ্ডের সব লোকই কি শিক্ষিত ? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাত বছরেরও কিছু বেশী সময় ধ'রে ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থা লেবার পার্টির হাতে থাকায় এখান থেকে অশিক্ষা এক রকম দূর হয়ে গেছে বললেই চলে। 'বৃটিশ জার্ণাল

অব এডুকেশনাল সাইকোলজি' পত্রিকায় স্যার সিরিল টাটের The Education of Illiterate Adults নামক একটি লেখা সেদিন পড়ছিলাম। তাতে তিনি ইংলণ্ডের অশিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত লোকের একটি তালিকা দিয়েছেন। তাঁর মতে ইংলণ্ডের মোট লোক সংখ্যার শতকরা দেড় থেকে দু'জন অশিক্ষিত এবং পনর থেকে বিশ জন অর্ধশিক্ষিত। অশিক্ষা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন দৈনন্দিন জীবনে যারা লেখাপড়ার কোন কাজই করতে পারে না। আর অর্ধশিক্ষা বলতে বুঝিয়েছেন লেখা এবং পড়ার ব্যাপারে যারা তেমন অংশ গ্রহণ করতে পারে না। যারা বিগত জেনারেশনের লোক তাদের সম্বন্ধেই সার সিরিলের এ মন্তব্য প্রযোজ্য। Adult Education প্রথম প্রবর্তনের ফলে এদের সংখ্যাও দিনে দিনে ক'মে আসছে। কিন্তু যারা জেনারেশনের কনিষ্ঠতম তাদের কারুরই প্রাথমিক শিক্ষালাভ না ক'রে গত্যন্তর নেই।

যে শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে বৃটেনের এতো গৌরব ও মান তা আজকের নয়। বরং একথাই বলা যেতে পারে যে, বৃটেন যখন তার জাতীয় শিক্ষার মান ও শিক্ষিতের সংখ্যার দিক থেকে সর্বোচ্চ শিখরে তখন দু'দুটো মহাসমরের প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে গিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব লোপ পেয়ে গেছে। তবু বৃটেন আজও যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে জাতিসংঘে তার কর্তৃত্বের ভারসাম্য রক্ষা ক'রে চলেছে, তা তার নিজের দেশের নরনারী নির্বিশেষের দায়িত্ববোধ, কর্মতৎপরতা, জাতীয় চেতনা, নিজের কাজে নিজেকে ফাঁকি না দেওয়া এবং সর্বোপরি জাতীয় কল্যাণ সাধনায় অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতার গুণে। কেবলমাত্র শিক্ষার গুণেই যে একটা জাত এতোগুলো গুণের অধিকারী হয় এমন কথা কি ক'রে বলবো ? শিক্ষাই অবশ্য এর মূলে। তবু এর পেছনে রয়েছে বৃটেনের জাতীয় ট্র্যাডিশন। ইংরেজ জাত ট্র্যাডিশন ও কনভেনশন, ঐতিহ্য ও প্রথাকে জীবনের নানাক্ষেত্রে বড়ো স্থান দিয়েছে। পুরুষ পরম্পরায় যে ট্র্যাডিশন গড়ে উঠে তাকে এদের প্রত্যেক নারনারীই প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে প্রয়াস পায়। আর নতুন ট্র্যাডিশন গ'ড়ে তোলবার জন্যে পথ খুঁজে ফেরে।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অপিস, আদালত, ব্যাঙ্ক, রেস্তোঁরা ও দোকানপাটে যারা কাজ করে তারা তারতম্য ভেদে সকলেই শিক্ষিত। নানাকাজে দোকানপাটে, ব্যাঙ্কে, স্কুলে, কলেজে, অফিসে যেখানেই গেছি সেখানে কাজের সময়ে কাউকে দেখলাম না যে পরের চাকরী করছে ব'লে মুনিবের অদর্শনে কিছু সময় বিশ্রামে, আলস্যে কি সহকর্মীর সঙ্গে মিষ্টি আলোচনায় কাটালো। এদের কর্মতৎপরতা দেখলে মুগ্ধ হ'তে হয়। কোন কাজের জন্যে কোথাও গিয়ে একটুখানি দাঁড়িয়েছেন কি সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ এসে মধুর ভাষায় প্রশ্ন করবে, আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি ? কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার কাজ উদ্ধার হয়ে গেলো। আপনার সময়ের অপচয় হলো না। প্রত্যেকের সময়ের মূল্য প্রত্যেকে বোঝে বলেই প্রয়োজনীয় কাজ স্বল্পতম সময়ে শেষ হয়ে যায়। প্রত্যেকের সময় এমনিভাবে বাঁচে দেখে দেশের আর্থিক জীবনের তাতে উন্নতি হয়।

পথে দেখছি কুলি-মজুর কাজ করছে। কৌতূহলী হয়ে ওদের সঙ্গে আমি মিশি। এটা সেটা নিয়ে অনেক সময় আলোচনা করি। ওদের অধিকাংশ লোকই তেমন বুদ্ধিমান নয়।

লেখাপড়ার চর্চ্চা ওদের তেমন নেই। সকল দেশের মজুর শ্রেণীর মতো মার্জিত রুচি ও সংস্কৃতির স্বাদ থেকে ওরাও বঞ্চিত। কথা অপরিষ্কার। বুলি 'ককনি'। দক্ষিণ ইংলণ্ডের স্কুল কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের মতো কিংবা বি. বি. সি. থেকে প্রচারিত ইংরেজীর স্বচ্ছ সুন্দর উচ্চারণ ওদের নেই। ওদের ইংরেজী উচ্চারণের স্বরধ্বনিগুলো 'ডিপথঙ্গাল' এবং দুই স্বরধ্বনির সঙ্গমস্থলে প্রথমটি লক্ষযোগ্যভাবে দীর্ঘ। কারুর বা দ্বৈত স্বরের সংযোগস্থলে হাঁচির মতো ধ্বনি।

মনে পড়ছে তখন আমি ওয়েস্ট লণ্ডনের ২৯ নটিংহাম প্লেসে থাকতাম। একদিন এক আঠারো উনিশ বছরের ছোকরাকে দেখলাম আমার ঘরের জানালা পরিষ্কার করছে। ল্যাণ্ডলর্ড বেজমেণ্ট থেকে একবার বেরোলেনও না। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি মন দিয়ে সুন্দর ক'রে কাজ করছো। তোমার নিয়োগকর্তা তো একবার দেখলেন না ? সে বললো, না দেখলে কি হবে স্যার ? আমার কাজের জন্যে আমি পারিশ্রমিক নেব। সময়ের কাজ সময়ের মধ্যে ভালো ক'রে করা আমার কর্তব্য। আমার সাধ্যমত তাই আমি ভালোভাবে কাজ করছি। মজুর শ্রেণীর এই ছেলেটির দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান দেখে মুগ্ধ হলাম। শুধু এর কথা কেন বলি! এ নিয়ে এদের যারই সঙ্গে আলোচনা করেছি তারই মুখে দেখেছি হাসি এবং আপন কর্তব্য সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান।

ইংলণ্ডের প্রায় প্রতিটি মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে তার দায়িত্বজ্ঞান লাভ করেছে। সেজন্যে তারা যক্ষের ধনের মতো জাতীয় চরিত্রের এ শ্রেষ্ঠ গুণটিকে বংশ পরম্পরায় আগলে রেখেছে। ইংলণ্ড এজন্যে আজও পৃথিবীতে এতো বড়ো। যতদিন তার জাতীয় চরিত্রের ও গুণ অক্ষুণ্ন থাকে ততোদিন সে যে বড়ো হয়ে থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভাবছি ইংরেজ জাত কর্তব্যপরায়ণ হবার এতো শক্তি পেলো কোথায় ? ব্যক্তি বা জাতি বিশেষ শুধু যদি মেশিনের মতো কাজ ক'রে যায় তাহ'লে মানুষে আর মেশিনে পার্থক্য থাকলো কোথায় ? অথচ এও জানি যে, মানুষ মেশিন নয়। সুইচ টিপলেই মেশিন চলে, সুইচ বিকল হ'লে শত টিপলেও আর চলে না। এদিক থেকে মানুষও মেশিনের মতো। মেশিনের চলার এবং চালানোর যতো উৎস আছে, বিদ্যুৎই তার মধ্যে প্রধানতম। মানুষ মেশিনের চলার জন্যে চাই ক্ষুধার নিবৃত্তি এবং অফুরন্ত উৎসাহ আর প্রেরণা।

কোন ইংরেজ পেটের জ্বালায় মরেছে কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসে এমন নজীর ইংলণ্ডে নেই। এরা কষ্টসহিষ্ণু। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে এদের অভিধানে বিলাসিতা ব'লে কোন শব্দ থেকে থাকলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এদের জাতীয় জীবন থেকে সে শব্দটি একেবারে উধাও হয়ে গেছে, ডায়েট এদের ব্যালান্সড্। বড়লোক থেকে শ্রমিক সকলেই শরীর গঠন ও শরীর ধারণোপযোগী আহার পায়। এদের দীনতম ব্যক্তিটির আয়ও সপ্তাহে পাকিস্তানী টাকার হিসেবে তিরিশ টাকার নীচে নেই। সে জন্য আমাদের দেশের তুলনায় ক্ষুধার জ্বালায় মরার মতো কিংবা মাসিক তিরিশ টাকার চাকুরিজীবী পিতার পুত্রকন্যাসহ চিন্তা ও জরাভারগ্রস্ত হবার মতো কাউকে এখানে তেমন সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতি দেশের মতো ধনী ও নির্ধন এখানেও আছে। জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম এখানকার গরীবদেরও

করতে হয়। তবু মানুষের জীবনে অপরূপ বিলাসের অবসর আর দুর্ভিক্ষজনিত অন্তিম হাহাকার এখানকার মাটিতে পাশাপাশি ঠাঁই পায়নি।

বড়োলোকদের কথা না হয় বাদই নিলাম, জীবনের মান উঁচু ব'লে গরীবরাও তাই এখানে জীবন সম্বন্ধে প্ল্যান করতে পারে। এদের কাজের সপ্তাহ সাত দিনের নয়। সাড়ে পাঁচ দিনের। যদি কেহ এর অতিরিক্ত সময় কাজ করতে চায় তার জন্যে সে অতিরিক্ত মজুরী পায়। এদের শ্রমিক, কি চাকুরিজীবীর জীবন কর্তৃপক্ষের মরজির ওপরে চলে না। গোলামীর দাসখতেও তা বাঁধা নয়। বড়োসাহেবের মরজির কৃপার দিকে সভয় ও সলজ্জ দৃষ্টি রেখে এখানে কোনো মানুষকে চলতে হয় না। এখানে প্রত্যেকেই 'ইনডিভিজুয়াল'। সে জন্যে প্রত্যেকের কাজেরই মূল্য রয়েছে। কর্তৃপক্ষ আপন সীমারেখার মর্যাদা রক্ষা ক'রে চলে। অতিরিক্ত সময় খাটলে বা খাটালে তার জন্যে কেউ কারও প্রতি রুষ্ট হয় না। এ কারণে কাজ এবং অকাজের সময় সম্বন্ধে এদের প্রত্যেকেই আগে থেকে ওয়াকেফহাল হ'তে পারে। অবসর ক্ষণকে এরা ধনী নির্ধন নির্বিশেষে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করার সুযোগও তাই পেয়ে থাকে।

বলেছি এরা চাকরির অর্থাৎ দেশের জন্যে কাজ করে খুব বেশী হ'লে সাড়ে পাঁচদিন। সোমবার থেকে শনিবারের দুপুর পর্যন্ত। আর কেউ কেউ বা সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত। পরীক্ষার পড়া তৈরী করবার ভয় না থাকলে কিংবা অত্যন্ত সহিষ্ণু না হ'লে এদেশী অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করে না। শনি রবিবার সেজন্যেই এখানকার ব্যক্তি বিশেষের নিজের আর সপ্তাহের অন্য দিনগুলো কাজের। 'উইক এণ্ড' কথাটি ইংরেজের জাতিগত। ইংলণ্ড থেকেই উইক এণ্ডের প্রথা এবং শব্দটিও কণ্টিনেন্টের অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়েছে।

কাজের দিনগুলোতে এখানকার নরনারীরা যেমন কাজের মধ্যে ডুবে থাকে, অবসরের দেড় দিনে সপ্তাহান্তে তেমনি প্রাণ ভরে নিজের জীবন উপভোগ করে। 'উইক এণ্ড' ও ছুটির দিনগুলোতে নিজেকে লঘু ছন্দে ভাসিয়ে দিয়ে যে শক্তি তারা সঞ্চয় করে, সপ্তাহের কাজের দিনগুলোতে সে শক্তিই আবার দুহাতে ব্যয় করে। ইংরেজ জীবনের প্রেরণা এবং উৎসাহের উৎস তার ছুটি উপভোগ করার ক্ষমতায় আর তার অবসর ক্ষণকে সুন্দর ক'রে রচনা করার তাগিদে।

অবসর ক্ষণ রচনা করা ও ভোগ করার কতো পদ্ধতি যে ইংলণ্ডে রয়েছে। এ সম্বন্ধে ধীরভাবে চিন্তা করলে ইংরেজের জাতীয় ও সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য পরতে পরতে আলগা হয়ে যায়। ইংরেজের বলডান্স, ড্রিঙ্ক, তার জুয়ো, পেশাদারী গ্যাম্বলিং, খেলাধূলা, মুক্ত সমাজ ব্যবস্থায় নরনারীর সম্বন্ধ ও অবাধ মেলামেশা, সিনেমা, থিয়েটার, তার বেতার জগৎ, পড়াশোনার অভ্যাস ও ধর্মব্যবস্থা প্রভৃতি এক একটি বিষয় সম্বন্ধে নানা কথাই বলা যায়। ইংরেজ জীবনের অবসর ক্ষণ এ সবের উপভোগ ও আলোচনায় ভ'রে থাকে। উইক এণ্ডের সন্ধ্যাগুলো অনেক তরুণ-তরুণীরই নাচের ঘরে কাটে। সপ্তাহের কাজের দিনগুলোতে যথারীতি কাজ করায় শরীর ও মন শ্রান্ত হয়ে আসে। সপ্তাহ শেষে নাচের ঘরে গিয়ে নাচের ছন্দের তালে তালে দেহমনের সে ক্লান্তি এরা দূর ক'রে নেয়। সপ্তাহ শেষে নাচ এবং গানে

এরা এদের কর্মের ক্লান্তি ভোলে বলেই সপ্তাহের শুরুতে দ্বিগুণ শক্তি ও উৎসাহে আবার কাজ আরম্ভ করতে পারে।

আমাদের দেশের মতো দিনের পর দিন মাসের পর মাস একটানা রোদ ইংলণ্ডে বড়ো বেশী দেখা যায় না। যার যেখানে অভাব তার সম্বন্ধেই সে চকিত হয় বেশী। আর সে অভাব যদি তার মেটে তাহলে তার মনের তৃপ্তির মাত্রাও হয় বেশী। সকাল বেলাতেই যেদিন রোদ ওঠে সেদিন মানুষে মানুষে কথা শুরু হয়, How Lovely! Lovely morning isn't it? যাকে লক্ষ্য ক'রে কথা বলা হয় তাকেও এ ধরনের উত্তরই দিতে হয়। আর সেদিনটি যদি ছুটির দিন থাকে, যদি উইক এণ্ড হয় তবে তো কথাই নেই। পরিবারের সকল লোকই সদল বলে কোনো প্ল্যান না থাকলেও পার্কে রোদ পোয়াতে বেরোলো। দম্পতি যুগল নিজেরাই কিংবা সন্তান সন্ততি নিয়ে স্যাণ্ডউইচ কি সে ধরনের হাল্কা লাঞ্চ নিয়ে দিনের মতো এসে বসলো পার্কে। রোদে গা মেলে দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে অপ্রয়োজনীয় জামা কাপড় খুলে মিষ্টি রোদে নিজেকে এলিয়ে দিলো। ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করলো। করলো খেলাধূলা আর লুটোপুটি। বড়োরা কাগজ কিংবা সময় কাটাবার মতোই বই পড়লো কিংবা চোখ বন্ধ ক'রে রোদের মিষ্টতাই করলো উপভোগ। আগে থেকে একটু প্ল্যান করা থাকলে স্বামী হ'লে স্ত্রীকে নিয়ে, কিংবা আপন আপন বন্ধু নিয়ে গ্রামে কি সমুদ্রতীর থেকে একটি দিনের জন্যে হলেও বেড়িয়ে এলো।

জীবনের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করবার উপায় এদের জানা আছে। গতানুগতিকতা জীবনকে ক্লান্ত ক'রে তোলে। গণ্ডীবদ্ধ সংসার জীবন বৈচিত্র্যের উদ্রেক করতে না পারলে জীবন দুর্বিষহ ও দুর্বল হয়ে ওঠে। নানা আকর্ষণ ও চাঞ্চল্যে জীবনকে ভ'রে তুলতে না পারলে জীবনের মাধুর্য কি ক'রে আহরণ করা যায় ? জীবনকে শতভাবে উপভোগ না করলে জীবনের উদ্দেশ্য লঘু ও ফিকে হয়ে আসবে নাকি ? জীবন যে পরিমিত! এতো বিচিত্র সুরে কোথা থেকে মানুষ ভ'রে তুলবে ? নতুবা উপায় আর কতোই বা উদ্ভাবিত হবে। পৃথিবীতে মানুষের রচনা করা শত উপায় নিঃশেষিত হয়ে এলো না কি ? ইংরেজদের অবসর ক্ষণ উপভোগ করার মধ্যে বড়ো কিংবা আশ্চর্য কিছু দেখি না। ছোটখাট জিনিসের মধ্যে তুচ্ছতম প্রক্রিয়া ও প্রণালীর মধ্যে বহু মুহূর্তের বিচিত্রতম মিল এদেরকে সৃষ্টি করতে দেখি।

লণ্ডনের বুক ভেদ করা টেমস্ নদীর পাশের ঘননীল ও শ্যামশোভাময় পত্র-পুষ্প পল্লবিত রিচমণ্ড। এটি এখানকার রাজ-রাণীদের অনেকেরই গ্রীষ্মকালীন বিশ্রামাগার। জুন মাসের এক রবিবারে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে সেখানকার প্রকৃতির শ্যামশোভা প্রাণ ভ'রে উপভোগ ক'রে এলাম। স্বর্গীয় মাধুরীতে ভরা ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকাল। টেমসের পার্শ্ববর্তী তরুচ্ছায়াঘন রিচমণ্ডের নানা স্থানে বেঞ্চ পাতা রয়েছে। তাতে আর মসৃণ সবুজ ঘাসের পাতায় অগণিত তরুণ তরুণীকে দেখছি সহজ ছন্দে গা মেলে দিয়ে বন্ধু প্রেমের ও মিষ্টি সূর্যের অমিয় ধারা পান করতে। নদীর বুকে ছোট ছোট নৌকায় যুগলের দলকে ভেসে যেতে দেখেছি। দাঁড়ের পানির ছিটায় উত্থিত হচ্চে তাদের মধুর কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত কল-লহরী। নদীর মৃদু তরঙ্গে কম্পিত হচ্ছে তাদের জীবন। জেগে উঠছে জীবনে রোমাঞ্চ। জীবনের

গতানুগতিকতার মাধ্যেম অতি পুরাতন প্রণালীর মধ্যে সামান্যতম পুলক শিহরণের সঞ্চার ক'রে জীবনকে এমন ভাবে উপভোগ ক'রে জীবনের নতুনত্বের স্বাদ সৃষ্টি করতে পারাতেই তো আনন্দ। নইলে চলার পথে শক্তি ক্ষয় করার এতো প্রেরণা পাওয়া যাবে কোথা থেকে?

ইংরেজের মতো এতো ছুটি এবং বিশ্রাম উপভোগ-প্রিয় জাত বোধ হয় খুব কমই আছে। ছুটির জন্য প্ল্যান করে এরা ছমাস আগে থেকে। গ্রামের ও সমুদ্রতীরবর্তী হোটেলগুলোর সব কয়টাই হলিডের ছয় থেকে তিন মাস আগে ভাড়া হ'য়ে যায়। ইষ্টারের ছুটি শেষ না হ'তেই গরমের ছুটি কাটানোর জন্যে হোটেলের সিটগুলো ভাড়া হয়ে যাচ্ছে। পথে বেরিয়ে আমাদের দেশের মতো শোওয়া ও থাকার ভাবনায় এখানে বিছানাপত্র বাঁধতে হয় না বলেই পথের বোঝার ভারে বিশ্রাম ও অবকাশের আনন্দ এদেশে ফিকে হয়ে যায় না। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঠাঁই কানট্রি ও সমুদ্র তীরবর্তী হোটেলগুলো। ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সবাই প্ল্যান্‌ড কি প্ল্যানহীন হলিডে ক'রে আসতে পারে সেখানে গিয়ে।

ইংলণ্ডের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে ইংলিশ চ্যানেল। ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলবর্তী ইষ্টবোর্ণ, ব্রাইটন, হোভ, হেষ্টিংস্ ওয়েমাথ, বোর্ণমাথ, টর্কি, প্লিমাথ প্রভৃতি শহরগুলোর প্রত্যেকটিই অবকাশ ও বিশ্রাম ভোগ করবার জন্যে ভূস্বর্গের মতো। সমুদ্র তীরের ছোট ছোট শহর এগুলো। প্রত্যেকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যেন ঝকঝক করছে। দিনের বেলায় এগুলোর পরিচ্ছন্নতা ও মার্জিত পরিকল্পনা নজরে পড়ে। সন্ধ্যার সময় বাতি জ্ব'লে উঠলেই এরা অপরূপ রমণীয় শোভা ধারণ করে।

লণ্ডন থেকে ব্রাইটন। মাঝখানে মাত্র মাইল পঞ্চাশেকের ব্যবধান। লণ্ডন থেকে ট্রেনে ক'রে আধ ঘণ্টাখানের মধ্যেই যাওয়া যায় সেখানে। সমুদ্রের কুলঘেঁষে একটানা পথ সারা শহরকে বেষ্টন ক'রে রেখেছে। মাঝে মাঝে সবুজ মসৃণ ঘাসের আকর্ষণীয় বিছানা। পথের পাশেই বিশ্রামকারীদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঘাসের উপর বসতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে ঘুমুতে। তার মাঝে মাঝে ফুলের বাগান। মানুষের হাতের রচনা কতো সুন্দর ও মনোহর হ'তে পারে, না দেখলে তা বলা এবং বোঝান শক্ত। শহর থেকে পথ বেয়ে সমুদ্রতীরে এগোবার পথের পাশে মাঝে মাঝে বাগান! নীচে ফুলের সারি ও শোভা। ওপরে তরুশ্রেণীর নানা শাখা পল্লব। আলো জ্বালানোর জন্যে ডালপালার ফাঁকে নানা প্রকার বাল্‌ব। আলো যখন জ্ব'লে উঠে তখনকার নানা রঙের আভা শহরটিকে বিচিত্র ও রমণীয় ক'রে তোলে। দেখতে দেখতে চোখে যেন নেশা ধ'রে যায়। মনে হয় হলিডের উপযুক্ত স্থানই বটে। সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে নানা রেস্তোরা আর সমুদ্র স্নানার্থিনীদের পোশাক ভাড়া করার আর বদল করার ঘর।

সমুদ্রের তীর থেকে পানির মধ্যে প্রায় কোয়াটার মাইল লম্বা পিয়ার (pier) গ'ড়ে তোলা হয়েছে। তার ওপরে খাবার ঘর। রেস্তোঁরা। আনন্দ মেলা (Fun fair)। নিত্যকার উৎসব লেগেই আছে। এখানে নানাভাবে এটা সেটার পয়সা পকেট থেকে বেরিয়ে যায় সত্য কিন্তু নিজের কাজের ক্লান্তি, সংসারের ঝামেলা, মানসিক ও ব্যক্তিগত অশান্তি এবং যাতনা থেকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও যে মুক্তি পাওয়া যায় তাও কম সত্য নয়।

সারা ইষ্টারের ছুটিটায় ওয়েদার অবিশ্বাস্যভাবে ভালো গেলো। গত তিন বছরের মধ্যে

নাকি এপ্রিল মাসে এতো রোদ ইংলণ্ডে দেখা যায়নি। শীত নেই। দিনের বেলায় তাপের মাত্রা পঁচাত্তর থেকে আশী ডিগ্রীর মধ্যে ঘোরাফেরা করলো। ইংলণ্ডে একটা 'ওয়ার্ম ওয়েভ' বয়ে গেলো। আমরা গরম দেশের লোক। শীতের দেশের মধুর উষ্ণ হাওয়া আমাদের কাছে স্বর্গসুখ ব'লে বোধ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এদেশের লোকও দেখছি অবকাশকালে এতো ভালো ওয়েদার পাওয়াতে ওয়েদার ফোরকাষ্টের ওপরে নির্ভর ক'রে দলে দলে ঘরের বাইরে থেকে হলিডে ক'রে এলো। হলিডে উপলক্ষে লণ্ডনের নিয়মিত ট্রেনের ওপরে অতিরিক্ত দু'হাজার ট্রেন এ ক'দিনের জন্য দেওয়া হয়েছিল। প্রতি চার মিনিটে ভিক্টোরিয়া, ওয়াটারলু প্রভৃতি ষ্টেশন থেকে একটি ক'রে ট্রেন এবং প্রতিদিন আট হাজার অতিরিক্ত বাস বিশ্রামভোগীদের নিয়ে সমুদ্রতীরে কি গ্রামে পৌছে দিল। ছোট ছোট কাগজগুলোতে হলিডে সংক্রান্ত হালকা লোভনীয় ও মুখরোচক সংবাদ বড়ো বড়ো অক্ষরে ক'দিন ধ'রে ছেপে বের করা হলো। রাস্তাপথে বেরোলেই মনে হ'তো এরা যেন জাতীয় জীবনের একটা মহোৎসব পালন করছে। নরনারীর মুখে চোখে একটা লীলাচঞ্চল ভাব সহজেই যেন চোখে পড়ছে। এতো যোগাড়, এতো আয়োজন ও উপকরণ সত্ত্বেও গ্রেট বৃটেনের অর্ধেক লোক হলিডে করতে ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে পারলো দেখে খবরের কাগজগুলো আনন্দের প্লাবনের মধ্যে এক সুরে জাতীয় বেদনার গান গাইলো।

হলিডে বা ছুটি উপভোগ করা কথাটি আমাদের দেশে নেই। ভাষার অভিধানে নেই। আমরা কাজের মধ্যে প্রতি মিনিটে ছুটি নেই। আর ছুটির দিনে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না ক'রে হয়তো কাজ করি। আমাদের পক্ষে তাই জীবনকে উপভোগ করাটা আর হয়ে ওঠে না। তাই কাজের মতো কাজও সেজন্যে আমরা ক'রে উঠতে পারি না। ছুটির দিনটা যে আমাদের নিজের ও স্ত্রী-পুত্রকন্যার আনন্দ বিধানে কাটাবো এ ধারণা আমাদের হ'লো কৈ ? যদি হতো তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন অনেকের সুখের হতো। দেহের বিশ্রাম ও মনের স্বস্তির জন্যে যদি একটি নিশ্চিন্ত অবসর ক্ষণ আমরা রচনা করতে জানতাম তাহলে কাজের দিনগুলোতে নিজের দেশের কাজে হয়তো বেশী ক'রে আমাদের নিয়োগ করা সম্ভব হ'ত। বহু দুঃখ থেকেই আমরা বাঁচতাম। আমাদের দেশেরও তাতে বৃহত্তম কল্যাণ হতো।

ইষ্টারে এদের ছুটি উভোগের পালা দেখে লণ্ডন-প্রবাসী দেশী বন্ধুদের মধ্যে যারা আমার ঘনিষ্ঠ তাদের বললাম, 'এ ক'দিন তো লাইব্রেরী পর্যন্ত বন্ধ। কোনো কাজই হবে না। সুতরাং চলো আমরাও হলিডে ক'রে আসি।' কিন্তু অভ্যাস কোথায় ? প্ল্যান করিনি ব'লে রোজ রোজ নিজেদের মধ্যে সম্ভাব্য নানা যুক্তি তর্কের ছুতোয় ছুটি ফুরিয়ে ফেল্‌তে লাগলাম। শেষটায় প্ল্যানহীন অবস্থায় একদিন ওয়াটারলু থেকে ট্রেনে চেপে বোর্ণমাথের পথে বেরিয়ে পড়লাম। লণ্ডন থেকে বোর্ণমাথ একশো দশ মাইল। দুটোয় বেরিয়ে পাঁচটায় গিয়ে উঠলাম। হোটেলের দ্বারে দ্বারে ঘুরলাম। কিন্তু প্রত্যেক জায়গা থেকে উত্তর পেলাম Full up sir, no room অজানা নতুন জায়গা! একা আমি। কোথাও জায়গা পাচ্ছিনে। দেখে মনটা যেন কেমন হয়ে উঠলো। Y. M. C. A-তে গেলাম। সেখানেও এ কথা 'Sorry, full up', যে তরুণীটি তখন সেখানে কাজ করছিলো আমাকে প্রবাসী বুঝে বোধ

হয় কিছুটা দয়াপরবশ হয়ে সে কয়েকটা বোর্ডিং ও প্রাইভেট হাউসে ফোন ক'রে এক জায়গায় আমার ঠাঁই ক'রে দিল। তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আমি মিষ্টার ও মিসেস্ ইকাপ্সের বাসায় গিয়ে উঠলাম।

হলিডের সময় ব'লে নয়, বছরের অধিকাংশ সময়ই বার্ণমাথ হলিডের বেশ প'রে থাকে। সমুদ্রের পারে একটি Pavilion তৈরী করা হয়েছে। এ Pavilion-টিতে ধর্মচর্চা থেকে শুরু ক'রে ধর্মের গণ্ডী ভাঙার সব রকম আয়োজনই দেখলাম। কোনো দিকে কনসার্ট, কোনো দিকে সিনেমা কিংবা অপেরা। কোনো দিকে প্রমোদ ও পানীয়ের ব্যবস্থা আর কোনো দিকে চলেছে সময় মত বলড্যান্স। আবার কোনো দিকে ধর্মের আলোচনা হচ্ছে। একরাত্রে বক্তৃতা শুনতে গেলাম Pavilion-এ। বক্তৃতা হচ্ছিল চার্চ সংলগ্ন স্কুলগুলোর প্রভাব ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে কি ভাবে পড়েছে সে সম্বন্ধে। লোকে যেন বেশী ক'রে তাদের ছেলে মেয়েদের চার্চে পাঠায় তার জন্যে সাধারণের কাছে কৌশলে আবেদন করা হচ্ছে। মনে হলো চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। সেজন্যে আমোদ প্রমোদের আড়ালে এ হেন সুন্দর ও সদুপদেশমূলক কথা ব'লে মুক্তো ছড়ানোর ব্যবস্থা। যে যা হোক, এ প্রকাণ্ড Pavilion-টি মুসাফির ও স্থানীয় নরনারীদেরও সমান আকর্ষণ ও প্রলোভনের স্থান বটে। এর সামনেই একটি বাগান। মনোরম ফুলে ফুলময়। বাগানের মধ্যে বসবার ও দাঁড়াবার নানা আসন পাতা। বিকেল থেকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত সারা গ্রীষ্মকালে সপ্তাহের কয়েক দিন ধ'রে এখানে Open air কনসার্ট চলে এবং কনসার্টের তালে Open air dance-ও হয়। অসংখ্য নরনারীর ভীড় দেখলাম সেখানে। নাচছে। পান করছে। গান গাইছে। লঘু ছন্দের তালে মনে হচ্ছে যেন ভেসে যাচ্ছে এরা! দুনিয়া ভোলবার জন্যেই বোধ হয় এখানে আসে আর এমনি করে আনন্দে গা ভাসিয়ে দেয়।

দিনের বেলাতে এ'রকম তাকে বোর্ণমাথ, কিন্তু নিরুপম শোভা ধারণ করে সন্ধ্যার পর। আলোয় অপরূপ আলোময় হয়ে যায়। আলোর বিচিত্র রং চোখে মায়াপ্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে যায়, আলোর সঙ্গে রঙের আর রঙের সঙ্গে মনের যে কি মিল, এখানে তার কিছুটা স্বাদ পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে পাড়ের নীচ দিয়ে এঁকে বেঁকে যে রাস্তাটি বহুদূর বিস্তৃত হয়ে সান্ধ্য ভ্রমণ বিলাসী নরনারীর পায়ের ছোঁয়া পাবার আশায় নিরীহ ভাবে বুক পেতে দিয়েছে, তার ওপরে প্রতি রশির ব্যবধানে গায়ে গায়ে বিচিত্রমত আলোর মালা দেখলে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না। সে আলোর সাজ অপরূপ অনুপম। প্রতি থাকে বাল্‌ব সাজানোর পদ্ধতি কি পরিমিত ও পরিকল্পিত। কোনোটায় পান পাতা। কোনোটায় জিজ্ঞাসা চিহ্ন দু;দিক থেকে এসে গলাগলি ক'রে মিশছে। কোনোটায় স্বস্তিকা আঁকা। কোনোটায় লতা। কোনোটায় তারের ফুল। তার ভেতরে হলুদ, বেগুনে, লাল, নীল, জরদ, জাফরাণি, ধূসর ও আসমান রঙের বাল্‌ব জ্ব'লে জ্ব'লে কি শোভা যে বিকীর্ণ করেছে! এরা বড্ড কল্পনাপ্রবণ জাত। এদের রুচি আছে। আকাশের তারার ফুলকে আলোর মেলায় এরা সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে হীরের দুলের মতো সাজিয়ে দিয়েছে। দূর বা কাছে যেখান থেকেই দেখিনা কেন বোর্ণমাথের আলোয় আলোময় এ রূপ দেখে স্বর্গীয় মায়াপুরী ব'লে মনে হয়। আলোর প্রভাবে সারা শহরেই fairy town-এর রূপ ধরেছে।

জীবনে এমন পরিপূর্ণ বিশ্রাম কতো বছর যে নিইনি এবং পাইওনি, তা খোদাই জানেন। ক'দিন ধ'রে বোর্ণমাথ শহরের শোভা দেখছি। সমুদ্র তীরের স্নিগ্ধ রোদ পোয়াচ্ছি। আর প্রাণ ভ'রে বিশুদ্ধ বাতাস খাচ্ছি। দিনের বেলাটায় প্রয়াগের গঙ্গাস্নানের মেলার মতো ইংরেজদের রৌদ্রস্নানের মেলা বসে। এ রোদ পোয়ানোতে পুরুষের চেয়ে নারীর উৎসাহ বেশী ব'লে মনে হয়। ঘণ্টা হিসেবে আরাম চেয়ার ভাড়া ক'রে কতো যে নরনারী গা ছেড়ে প'ড়ে রয়েছে, তা কে গুণবে? শুধু দেখা যায় মুনুষ আর মানুষ। কতো অগণিত অলস অবশ ক্ষণ মানুষের কাজের চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যেন জিরিয়ে নিচেছ।

অনেকে আবার নেমেছে সমুদ্রে স্নান করতে। কোনো দল ছোট নৌকা ভাড়া ক'রে চ'লে গেছে পাড় থেকে বহু দূরে। ইংরেজরা বিশ্রাম ক্ষণের এই শোভা সৃষ্টি করতে এবং তা দেখে চোখ জুড়িয়ে নিতে বোধ হয় আরাম পায়। দলে দলে ক্যামেরাম্যান আসে এ দৃশ্যের ছবি তুলতে। ফিল্মের জন্যে ছবি তোলে। পিকচার পোষ্টকার্ড এ দৃশ্য ধ'রে রাখে ছুটির দিনগুলোকে লোভনীয় করার জন্যে। এ ছবির আবার বাজার আছে। খবরের কাগজগুলো এ সব দৃশ্যের ছবি ছাপে সামনের কিংবা পিছনের পৃষ্ঠাতে। আমাদের কাছে যা তুচ্ছ ওদের কাছে মনে হয় তাই উচ্চ। ছোটকে বড় করার, অনাবশ্যককে ফলাও ক'রে জীবনে ঠাঁই দেবার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এরা জানে। এরা জাত হিসাবে হুজুগপ্রিয় বটে। তবে হুজুগ থেকে মনে হয় জীবনের পাথেয় ও প্রেরণা এরা আহরণ ক'রে নেয়।

বোর্ণমাথ 'সি-বিচে' আমার মতো রঙীন চামড়ার লোক খুব কমই দেখলাম। লণ্ডন কসমোপলিটন শহর ব'লে দুনিয়ার সকল দেশের লোক লণ্ডনের প্রতি ঘরেই দেখা যায়। কিন্তু মফস্বল শহরগুলোতে বিচিত্র রঙের লোকের সমাবেশ কম; তাই ভিন্ন রঙের লোকেরা হঠাৎ এখানে এসে সহজেই স্থানীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বুঝতে পারছি আমাদের দিকে কতো লোক যে কৌতূহলী দৃষ্টিতুলে ধরেছে আর কতো লোক যে মনের প্রশ্ন মুখের কাছে নিয়ে এসে জোর ক'রে চেপে যাচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। যেখানে বসেছিলাম তার পাশেই এক প্রৌঢ়া ইংরেজ মহিলার আগ্রহ দেখে তার সঙ্গে নিজেই কথা শুরু করলাম। তার একটি বছর-ছয়েকের মেয়ে বালুর মধ্যে ঘর তৈরী ক'রে খেলছে। তাকে কেন্দ্র করেই আলাপের শুরু। ভদ্র মহিলা বেশ মিশুক। আমি বিদেশী। এখানে আত্মীয়হীনও। সেজন্য আমার ওপরে তার কিছুটা মায়া হওয়া স্বাভাবিক। নিতান্ত ঘরোয়া স্বরে তিনি নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আমি আকৃষ্ট হলাম তাঁর অইংরেজোচিত ব্যবহার দেখে। তাতে তিনি খুশী হয়ে একেবারে গ'লে গেলেন। ভাল হলো, পরের দিন তাঁর বাসায় চায়ের নেমন্তন্ন। তাঁর সঙ্গে এক তরুণীকে দেখলাম তাঁর মেয়েটির আয়া হিসেবে। ওর নাম মাফল্‌তা, ডাকা হয় মাফি বলে। সুইজারল্যাণ্ড থেকে এসেছে নিজের চেষ্টায় ইংরেজী শিখতে। ইউরোপের ছেলেমেয়েদের এ রকম আত্মনির্ভরতায় পরিচয় ইংলণ্ডের যে কোন জায়গাতেই পাওয়া যায়। ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। ছোটখাট একটি চাকুরি যোগাড় ক'রে নেয়। তাতে পেটও চলে পকেট খরচও জোটে। এমনি ক'রে মাস ছয়েক কি বছর খানিকের মধ্যে একটি দেশ দেখা ও ভাষা শেখা দু'ই হয়ে যায়। মাফির মাতৃভাষা ফরাসী। এখনও ইংরেজী ভালো ক'রে শিখে উঠতে পারেনি। মেয়েটির মুখের কমনীয়তা ও লাবণ্য অসাধারণ। তাকে ঘিরে

যেন একটা স্নিগ্ধ সারল্য বিরাজ করছে। ওকে বললাম, "মাফি, তোমার ইংলণ্ড কেমন লাগে। তোমার দেশ ভাল না ইংলণ্ড ?" ও বললে, "তোমার কেমন লাগে এ দেশ আগে বলো তবে আমি বলবো।" আমি বললাম, "ইংলণ্ডের গ্রীষ্ম ও বসন্তকাল আমার খুব পছন্দ হয়, মনে হয় যেন ভূ-স্বর্গ।" ইংলণ্ডের প্রশংসা করাতে বেচারী আহত হ'লো নাকি বুঝলাম না। সে বললেন, "তোমার দেশে ফেরার আগে একবার সুইজারল্যাণ্ড দেখে যেও। তা হ'লে ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকালও তোমার ফিকে মনে হবে।" আমি বললাম, "মাফি, তুমি হোমসিক্‌নেসে ভুগছো নাতো ?" আমি মাফির রোগ ধ'রে ফেলেছি দেখে আমার এ প্রশ্নে তাঁরা উভয়েই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

ঘর ছেড়ে যারা বাইরে আসে, ডানপিটে বেপরোয়া হলেও কিছুদিনের জন্যে হোমসিক্‌নেস যে কি, তার ব্যথা তাদের সকলকেই ভোগ করতে হয়। কিছুদিন পরে সয়ে গেলেও মাঝে মাঝে ধিক্ ধিক্ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌তে চায়। আমি এর বেদনা জানি ব'লেই মাফিকে সহানুভূতি জানালাম।

আমার সমবেদনার সুর দেখে ভদ্রমহিলা বোর্ণমাথের শোভা ও সৌন্দর্যের দিকে আমাদের উভয়ের মন আকর্ষণ করলেন। ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে সুন্দর এ শহরটি। তারপরে ইংলিশ চ্যানেল। অপর পারে 'দুরাদয়শ্চক্র' ফ্রান্সের নীল বনরাজির আবছা ও অস্পষ্ট রেখা দেখা যাচ্ছে 'আভাতিবেলা লবণম্বুরাশের্দ্ধারানিবদ্ধের কলঙ্করেখা'র মতো। দূর দিগন্তে ইংলিশ চ্যানেলের মুখ রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য পাটে বসতে যাচ্ছে। সোনালী আভায় পার্শ্ববর্তী অগণিত নরনারীর ধব্ ধবে গণ্ডদেশ রক্তিম আভাময় হয়ে উঠেছে। সব সুন্দর। দেশ, ক্ষণ, পরিবেশে জুড়ে পাত্রপাত্রীদের ঘিরে সৌন্দর্য উপচে পড়ছে! এ সন্ধ্যায় স্নিগ্ধ করুণ প্রবাহ আমার চোখে মুখে এক ঝলক আনন্দ দীপ্তি ছড়িয়ে দিয়ে গেলো। মনে মনে গুন্ গুন্ ক'রে উঠলাম—

"তোমার ঐ অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা
হয়নি কোনো কালে
আর হবে না কভু,
এমনি করেই, প্রভু,
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে
লও যে নূতন করি।"

ভদ্রমহিলাকে বললাম, তোমাদের শহরের বিশেষ ক'রে তোমাদের সঙ্গে একটি মধুর সন্ধ্যা কাটানোর আনন্দ আমার সারা জীবন মনে থাকবে। কিন্তু 'হোমের' কথা মনে ক'রে দিলে দেখে এত আনন্দের মধ্যেও মনটা আমার বেদনায় ভ'রে উঠলো। তুমি যদি বুঝতে তাহ'লে আমার দেশের শ্রেষ্ঠ কবির কথা তোমাকে শোনাতাম—

'যত বড় হোক ইন্দ্রধনু সে
সুন্দর আকাশে আঁকা
আমি ভালবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা।'

মাফিকে লক্ষ্য ক'রে বললাম, "এ তুমিও বুঝবে, কেননা আমার মতো তুমিও প্রবাসী–

'Amid pleasures and palaces
Though we may roam.
Be it ever so humble.
There's no place like home'

মাফির ইংরেজী জ্ঞান টন্‌টনে না হলেও তার মনের কথাটি সুন্দর ক'রে প্রকাশ ক'রে দিলাম দেখে সুইজারল্যাণ্ডের এই লাবণ্যময়ীর চোখে অশ্রুর রেখা টল্‌মল করে উঠলো।

তের

বিদেশের সঙ্গে যার একবার পরিচয় হয় দেশ দেখবার মোহ তাকে পেয়ে বসে। ইউরোপে এলে তো কথাই নেই, ইংলণ্ডে এসে সারা কন্টিনেন্ট যে না দেখে গেলো তার অবস্থা ঢাকা কি কলকাতা ছেড়ে বাংলাদেশের বাইরে না যাওয়ার মতো। যাদের এ সৌভাগ্য পুরোপুরি হয় না তারা কমপক্ষে পারী নগরীটি দেখে যেতে ভোলে না।

বিদেশে যারা পড়াশোনা করতে আসে বাড়ী ব'লে তাদের কিছু নেই। সুতরাং ছুটিতে স্থান বদল করতে বেগ পেতে হলেও মায়ার কোনো বন্ধন না থাকার জন্যে পথে বোরোতেই তাদের আনন্দ বেশী। সাজ্জাদ সাহেব আমি ও আলী আশরাফ সাহেব তিন সঙ্গী মিলে সত্যি একদিন পারীর পথে বেরিয়ে পড়লাম।

ইংলণ্ডের পোর্টে ইউহ্যাভেন থেকে আমাদের জাহাজ ছাড়লো দীয়েপের দিকে। এই পোর্ট দুটির মধ্যে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের ব্যবধান সবচেয়ে বেশী। ডোভার ও ক্যালের মাঝখানে দু'দেশে ব্যবধান কম ব'লে (৬০ মাইল) সাধারণতঃ এ বন্দর দুটো দিয়ে জাহাজে লোক পারাপার হয়। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে পারীতে হচ্ছিল ওদের বাইমিলেনারী (দ্বিসহস্রতম) উৎসব। এ উৎসব উপলক্ষে দুনিয়ার নানা জায়গা থেকে এতো বেশী লোক পারীতে যাচ্ছিলো যে, সময় মতো সচেতন হইনি ব'লে ডোবার-ক্যালের পথ আমাদের ভাগ্যে জুটলো না।

ঘন্টা তিন ধ'রে ভাসলাম ইংলিশ চ্যানেলের অথৈ নীল পানির ওপরে। অশান্ত ব'লে ইংলিশ চ্যানেলের কুখ্যাতি আছে। আমাদের ভাগ্য ভালো। আবহাওয়া সেদিন ভালো ছিল। শান্ত সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজ নিতান্ত নিরাপদে আমাদের পার ক'রে দিল। কিছুকালের জন্যে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর সঙ্গে আমরা তিন পাকিস্তানী আমাদের দেশের অস্তিত্ব ঘোষণা করলাম।

ফ্রান্সের উপকূলে দীয়েপ বন্দরে নামতেই যেন চোখে পড়লো আমাদের দেশের নারায়ণগঞ্জের রূপ। সেই ময়লা। সেই নোংরা। মানুষের চেহারাতেও কেমন যেন দারিদ্র্যের ছাপ। ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স। ইংলিশ চ্যানেলের সামান্য ব্যবধান। অথচ এ দু'দেশের মধ্যে যে তফাৎ তা ফ্রান্সের মাটিতে পা দিতে না দিতে বিদেশীদের চোখেও স্পষ্ট হয়ে উঠে। একমাত্র

গায়ের সাদা রং ছাড়া আর কিছুতেই মিল নেই। এরা সাদা হলেও যে ইংরেজ নয় তা এদের চেহারা থেকেই ধরা যায়। ভাষা আর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা নাই বা বললাম।

দীয়েপে কিছু কুলি দেখলাম। এরা ইংলণ্ডের পোর্টারের মতো নয়। সাদা চামড়া বাদ দিয়ে ওদের পোশাক আর পেশা আমাদের দেশের কুলিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই ব'লে গোয়ালন্দ, চাঁদপুর কি শিয়ালদহের কুলিদের মতো নয়। গোয়ালন্দের কুলি ওদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যেই বিখ্যাত। মোটা মালের গাদা নিয়ে যে একবার গোয়ালন্দের কুলির পাল্লায় পড়েছে সে আজীবন মনে রাখবে তার দুর্ভোগের কথা। এরা ভদ্র ও নম্র। ঠকানোর প্রবৃত্তি এদের নেই। ফ্রাঙ্কও যা দাবী করে তা পরিশ্রমের পারিশ্রমিক। তার Service-এর দাম।

দীয়েপ থেকে ট্রেন চললো পারীর দিকে। উদার উঁচু নীচু মাটির পাহাড়ের চূড়া। আর তরুছায়া ঘন জনবিরল গ্রাম। তার ভেতর দিয়ে রেল লাইন। ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের যেখানে মিল তা তাদের প্রাকৃতিক গঠনে সেই উঁচু মাঠ। সেই নীচু সমতল ভূমি। দু'য়ে মিলে চারণ এবং চাষের ক্ষেত। মাঠ যেখানে নীচু থেকে ক্রমেই মসৃণভাবে উঁচু হয়ে গেছে সে উচ্চতা জুড়ে ছড়িয়ে আছে ঘন বন। তাতেও যেন মানুষের হাত লাগানো। প্রাকৃতিক বাঁধুনিতেও দুই দেশ এক। তবে ইংলণ্ডের মতো ফ্রান্সের প্রকৃতিতে সৌন্দর্যের অপরূপ ফাগ ছড়ানো নেই। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইংলণ্ডের সবুজ পেকে যেভাবে গাঢ় হয়ে ওঠে তার এক অদ্ভুত অপরূপ সৌন্দর্য আছে। ফ্রান্সের প্রকৃতিতে সবুজের ছাপ আছে। সে সবুজ গাঢ় নয়। ফিকে আর নীলের মাঝখানে তার বসতি।

ইংলণ্ডের গ্রাম, শহর, পোর্ট কি ষ্টেশন, যাই দেখি না কেন, তাতে শালীনতার ও আভিজাত্যের ছাপ। কতো কালের আর্থিক ভারসাম্য এবং সচ্ছলতা ইংলণ্ডকে তার রূপপ্লাবী প্রবৃদ্ধ ছন্দ দিয়েছে ইংলণ্ডের ইতিহাস যাদের জানা আছে তারাই ইংলণ্ডের এরূপ দেখে একটা জবাব ও সান্ত্বনা পায়। এ রকমটা না হলেই যেন অস্বাভাবিক ঠেকতো। দুনিয়া শোষণ কম্বরে সারা ইংলণ্ডকেই ইংরেজরা স্বর্গে পরিণত করেছে। সারা ইংলণ্ড স্বর্গের একটি বাগানের মতো। ফ্রান্স ইংরেজদের মতো এমন ক'রে দুনিয়াকে লুটতে পারেনি। তাই শুধু পারীই সৌন্দর্যে ইউরোপে সেরা হয়ে রয়েছে, সারা ফ্রান্স নয়। ইংলণ্ডের ছোট বড়ো শহরের তো বটেই, তার গ্রামগুলোতেও লণ্ডনের সভ্যতা, ঐশ্বর্য ও সজ্জার ছাপ পাওয়া যায়। সুতরাং সারা ইংলণ্ডই এক হিসাবে লণ্ডন। ফ্রান্সের প্রভিন্সিয়াল শহর থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্স এক শহরের দেশ। সৌন্দর্যে শুধু ইউরোপে নয়, পৃথিবীতেই পারীর জুড়ি মেলা ভার। তাইতো সারা দুনিয়ার ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে পারী পারীই। পারীকে এমনভাবে সাজানোর জন্যে ফ্রান্সের গ্রামবাসীরা মাঝে মাঝে আপত্তি করে। তাদের আপত্তির কারণ বুঝি। পেটে না জুটলে পিঠে সওয়া কি মাথায় বোঝা বওয়া যায়! ইংলণ্ডের আর্থিক সচ্ছলতার জন্যে বন গ্রাম থেকে শুরু ক'রে তার লণ্ডন পর্যন্ত সব কিছুকেই নানা পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ সুসজ্জিত করতে তার বাধেনি। ফ্রান্সের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। ট্রেনে চলতে চলতে গ্রামের ভাঙাচোরা বাড়ীঘর প্রচুর চোখে পড়ছে। আমাদের দেশের মতো করগেট টিনের আর অ্যাজবেস্টোজের ছাদ দেওয়া বাড়ীও রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সেও সেগুলো দিয়ে

দারিদ্র্যের চিহ্ন ফুটে বেরোচ্ছে। ইংলণ্ডে এ কল্পনাতীত। ফ্রান্সের গ্রামের মানুষ ছাড়াও গ্রামের ঘোড়া গরু যা দেখছি ইংলণ্ডের ঘোড়া ও গরুর তুলনায় তারা অনেকটা রোগা। ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের ছাপ এই দুই দেশের মানুষ ও প্রকৃতিতে স্পষ্ট ধরা পরেছে।

পারীতে পৌছলাম বিকেলে। নতুন ও বড়ো শহরে হঠাৎ এসে পড়ার চকিত বিস্ময় লণ্ডন আমাদের ঘুচিয়ে দিয়েছে। এর বৃহত্ব ও নতুনত্ব আমাদের তেমন আশ্চর্য করলো না। লণ্ডনের ভাষা জানা ছিলো। শৈশব যৌবনের প্রতীক্ষা নিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম নগরীতে এসে বিস্ময়রস ভাঙতে সেখানে ভাষার সাহায্য নিতে কষ্ট হয়নি। তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে বুক দুরু দুরু করলেও মুখে কথা ফুটেছিলো। দ্বিধাজড়িত হাতে তার অবগুণ্ঠন অপসারণ করতে মুখের মধু রসই হয়েছিল প্রধান সহায়। পারীতে সাজার্মা ষ্টেশনে পা দিতেই অদ্ভুত কাকলি শোনা গেলো। লণ্ডনে মাদাম দুপের কাছে ফ্রেঞ্চ পড়তাম। লণ্ডনে দু'চারজন লোককে ফরাসী ভাষা যে বলতে শুনিনি, তাও নয়। তাদের ফরাসী ভাষা বলা আর আমাদের শোনার মধ্যে একটা সচেতনতা ছিলো। সেজন্যেই খুব সম্ভব তার বৈচিত্র্য ও মাধুর্য আমাদের মনে ধরেনি। ভাষা না-জানা দেশে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হ'লে কেমনটি যে লাগে এ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা যার হয়েছে সে-ই এর অসহায়তা এবং অনির্বচনীয়তা ভালো করে উপলব্ধি করবে। চারদিক থেকে একই শৃঙ্খলার বহু বিচিত্র ধ্বনি কানে এসে হরদম বাজছে। আর সে বিচিত্র ধ্বনির প্রভাবে মানুষগুলো যে যার তেমন ভাবে ছুটোছুটি করছে। সে ধ্বনির সঙ্গে তার নিজের না আছে কোন যোগ না সে পারছে তাদের একজন হয়ে তাদের মতোই চলাফেরা করতে। তখনকার মতো আমরা যতটুকু ফ্রেঞ্চ জানতাম তা কাজে এলো না। পারীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে বেচারী পারী তার সমস্ত আকুলতা নিয়ে এগিয়ে এলেও আমাদের সামলে নিতে হলো। শুধু মনে মনে বললাম, 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি ......।'

"ও-ভাটনগর"–হঠাৎ কানে বেজে উঠলো অতি পরিচিত বাঙালী হিন্দু ঢং-এর ডাক। পারীর রাস্তায় এ ধরনের ডাক শুনে বিস্মিত হবারই কথা। সচকিত হয়ে পাশ ফিরতেই দেখি আমাদের 'কমন' বন্ধু ডাঃ ভাটনগর আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আওয়াজকারী ভদ্রলোক আর তার সঙ্গে আর একজন—দু'জনই এসেছে বর্ধমানের দিক থেকে। ওরা সকলেই লণ্ডনে হোমিওপ্যাথি কলেজের ছাত্র। দেশে ফেরার পথে কণ্টিনেণ্ট ভ্রমণে বের হয়েছে। আশ্চর্য এ ভাটনগর ছেলেটি। দিল্লীর সেরা হোমিওপ্যাথের একমাত্র ছেলে। ছেলেবেলায় ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে তার ডানহাতটা অবশ হয়ে যায়। ওর বাবার বিশ্বাস, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতেই তার হাত সেরে উঠবে। হোমিওপ্যাথি পড়া আর চিকিৎসা করানো—এক ঢিলে দুই পাখী মারার জন্যে তার বিলেতে আসা। ধর্মাধর্মের কোন বালাই নেই। মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে। অতি সহজেই মিশতে পারে। চট ক'রে বন্ধুত্ব করতে পারে। ছবি তোলার বাতিক খুব। তাতে পয়সা নষ্ট করে বেশ। কিন্তু খাবার সময়ে খুব হিসেবী! আমাদের ক'দিন আগে পারীতে আসে। কথা ছিল ষ্টেশনে সে আমাদের রিসিভ করবে। আমাদের যখন বোবার দশা তখনই শুনলাম অভাবিতপূর্ব এ ডাক। ভাটনগর এরই মধ্যে ভুল ফরাসী ভাষা বেশ আয়ত্ব ক'রে ফেলেছে। সে গেলো আমাদের জন্যে ট্যাক্সি আনতে। এমন সময় আমাদেরকে বিদেশী মনে ক'রে একজন ফরাসী পোর্টার

আমাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলো। এতে বর্ধমানের এক ভদ্রলোক ফ্রেঞ্চ আর ইংরেজী মিলিয়ে বোঝাতে চাইলো—"মন আমি (আমার বন্ধু) গন্ ফর ট্যাক্সি"–হাত দিয়ে দূরে দেখালো ভাটনগরকে। লোকটা কি বুঝলো খোদাই জানেন, কিন্তু আমরা না হেসে পারলাম না।

ভাটনগরের সাহায্যে 'রু-দ-ত্রভিজের' একটি হোটেলে এসে উঠলাম। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে চারতলার উপরে উঠতে হলো। আমাদের থাকবার জন্যে ওয়েট্রেস আমাদের কামরা ঠিক ক'রে দিয়ে গেলো। পারীর হোটেলগুলোর বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। বাথ নেবার ব্যবস্থা থাক বা না থাক(না থাকাটাই অবশ্য স্বাভাবিক) কামরায় কিংবা কামরা সংলগ্ন ছোট্ট একটি ঘরে মুখ হাত ধোয়ার 'ওয়াস বেশীন' আর তার পাশে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার জন্যে মেঝেতে বেশ নীচু আর একটা 'বেশীন' আছে।

পারীতে এমন হোটেলও যে থাকতে পারে তখনকার মতো হোটেলের মধ্যে দাঁড়িয়েও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমাদের কামরার পাশে ছিলো টয়লেট রুম। নামে নিশানায় বুঝা যাচ্ছে ফ্লাশ সিষ্টেমেরই হবে। টয়লেট পেপ্যারের অভাব আছে ব'লে মনে হলো। খবরের কাগজের ছেঁড়া টুকরোয় সবটা ভর্তি হয়ে আছে। কতোকাল যে পরিষ্কার হয়নি খোদাই জানেন।

পারীতে তিন রকমের হোটেল আছে। যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিলাস ও আরামের প্রথম শ্রেণীর হোটেল। মাঝারি রকমের হোটেল আর সাধারণ হোটেল। হোটেলের ক্লাশ ভাগ করা হয়েছে বিলাসের উপকরণ ও পরিচ্ছন্নতার তারতম্যের হার দিয়ে। সাধারণ হোটেলগুলো বড়ডো নোংরা। একটি দুটি নয়। অধিকাংশ হোটেলই পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে অসহনীয়। পারী দু'হাজার বছরের পুরাতন শহর ব'লেই এতে চূড়ান্ত ভালো ও মন্দের আশ্চর্য সমন্বয় দেখা যায়। পারীর তুলনায় লণ্ডনের বয়স কম। সেজন্যই হোক, কিংবা ওসব দিকে ইংরেজ জাত অত্যন্ত সতর্ক বলেই হোক, অপরিচ্ছন্নতা ইংরেজ হোটেলে সাধারণত চোখে পড়ে না।

একদিন যেতে না যেতেই বাধ্য হলাম হোটেলটি ছাড়তে। বেশ খোঁজাখুজির পরে রু'লাফায়েতের পাশে রু'বুফোর হোটেল লাফোঁতে এসে উঠলাম। হোটেলটি মাঝারী রকমের। বেশ পরিষ্কার। আমরা তিনজনে মিলে পাশাপাশি দুটো কামরা নিলাম। কামরা সংলগ্ন 'সাল দ ব্যাঁ', বা বাথরুম পাওয়া গেলো। ভালোভাবে গোসল করা যাবে এ আনন্দে সাজ্জাদ সাহেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আশরাফ সাহেবেরও অজিফা পড়ার জায়গা হলো। পারীর বুকে এ রকম কামরার (শুধু থাকার জন্যে অবশ্য)–দৈনিক বার শ ফ্রাঙ্ক ভাড়া। আমাদের হিসেবে মোটামুটি বার টাকা। এক রকম সস্তাই বলতে হবে। হোটেলের অধিকারিণী মাদাম মারী। অমায়িক ভদ্র মহিলা। কিছু ইংরেজী শিখেছেন হোটেল চালানোর জন্যে। তাঁর স্বামী এবং নিজে মিলে হোটেলটি চালাচ্ছেন। আট দশ বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে আন্ মারীকে কেন্দ্র ক'রে এদের দাম্পাত্য জীবন সুন্দর বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। মাদাম মারীর আশ্রমে আমাদের পারী প্রবাসের ক'টা দিন সুধায় ভ'রে উঠলো।

* * * *

পায়ে হেঁটে পারী দেখছি। নগর পরিকল্পনার দিক থেকে পারীর বেশিষ্ট্য আছে। রাস্তার সাহায্যে এক একটি ত্রিভুজ তৈরী করা। তারই মধ্যে দালানের পর দালানের সমারোহ। রাস্তাগুলো সবই সরল রেখাকৃতি। সমান্তরাল ভঙ্গীতে সাজানো। কোথাও আঁকাবাঁকা বা ঘুরপাক নেই। রাস্তার একপ্রান্তে দাঁড়ালে অন্য প্রান্ত বেশ নজরে পড়ে। সমস্তপারী নগরীকে ছবির মতো সাজানো গুছানো লাগে।

পারীর ছোট রাস্তাগুলোর নাম রু। আর বড়গুলোর নাম বুলেভার্ড। বুলেভার্ডগুলো এক একটি বাগানের মতো। মাঝখান দিয়ে সরল রেখার পার্ক। তাতে সমান মাপের ছোট বড়ো গাছপালা। বসবার বেঞ্চ পাতা। আর তার দুপাশ দিয়ে প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা। একটা আসবার। একটা যাবার। পারীর এমন (এমন কি দুনিয়ারও) সুন্দর রাস্তাটির নাম সাঁ-জে-লি-জে। কবিতার ছন্দভরা নামটি। আর পারীজেনরা এর স্বরধ্বনিগুলোকে টেনে রীতিমতো খেলিয়ে দিয়ে যখন উচ্চারণ করে তখন মনে হয় যেন নৈশ সৌন্দর্যের প্রবাহের উপরে স্বর তরঙ্গের একটা মৃদু কম্পন এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি জুড়ে বিস্তৃত হয়ে গেলো। সাঁজেলিজের এক প্রান্তে গগনচুম্বী আলোকস্তম্ভ। আর অন্য প্রান্তে নেপোলিয়ানের যুদ্ধ জয়ের স্মৃতিস্তম্ভ আর্ক দু'ত্রয়ামফ্। মাঝে মাঝে পানির ফোয়ারা। পানির গুঁড়ো গুঁড়ো সফেন বিন্দু বাতাসের সঙ্গে মিশে উড়ে উড়ে একটি মিষ্টি কোমল পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। মাঝে মাঝে রং বেরঙের আলোর ফুলঝুরি। আর তার দু'পাশ দিয়ে বিছানো রয়েছে নানা রকম ফুলের বাগান। প্রথম প্রান্ত থেকে এমনিভাবে আর্ক দু'ত্রয়াম্ফের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলে পর ক্ল্যাসিকেল ভঙ্গীর আর এর সম্পূর্ণ সুচারু কারুকার্যের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দালান। তাতে হোটেল রেস্তোরাঁ আর কাফে। মনে হয় যেন একেবারে পরীর রাজ্য। ইউরোপের মধ্যে লাবণ্য, কোমলতায় ও নিটোল দেহসৌন্দর্যে পারী যেন মিস্ য়ুনিভার্স। আর তার আনারদানা রঙীন গালের উপর আঁকা সাঁজেলিজে যেন একটি মিষ্টি তিলক ফোঁটা। শেষে আর্ক দু'ত্রয়ামফ্। আট দিক থেকে আটটি রাস্তা এসে এর পায়ে কুর্নিশ করেছে। পারীর রূপ দেখতে আসে বিশ্বের সব রস পিপাসুরা। সেজন্যেই পারীর সেরা রূপোপজীবিনীরাও এখানে তাদের রূপের বেসাতি মেলে ধরে।

দিন ও রাতের পারীতে আকাশ পাতাল তফাৎ। দিনের বেলা সারা পারী নগরীই যেন ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু চাঙা হয়ে উঠে সাঁঝের কিছু আগে দিয়ে। পারীর কাফেগুলোই পারীর জীবন। রাস্তার পাশের এই কাফেগুলো ঘরে বাইরে টেবিল চেয়ার ফেলে দিয়ে সন্ধ্যার পরে যেন হাত পা ছড়িয়ে বসে। রসিক জনেরা এখানে আসে রসপান করতে। মাদামোয়াজেলরা চা, কফি অন্যান্য কোমল মধুর পানীয় পরিবেশন করতে। মধুলোভী রসিক জন সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়। হৈ চৈ গোলমাল, আলাপ আলোচনা, গান বাজনা, সবই চলছে। শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি ললিতকলাবিদরা এখানেই ব'সে ব'সে ভাবের আদান প্রদান করেন। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, এমন কি রাজনীতি—যা নিয়ে পারীর খ্যাতি ও অখ্যাতি সব কিছুরই সূতিকাগার পারীর এই কাফেগুলো।

শুনি প্রিয়জনের শরীরের ঘ্রাণ (body odour) নাকি নরনারীর মনে মোহ জাগায়।

কিন্তু যুগ যুগ ধ'রে ইউরোপের অধিকাংশ লোক গোসল করে না ব'লে তাদের শরীর দিয়ে বাঘের গায়ের বোটকা গন্ধের মতো যে গন্ধ বেরোয় তাতে অনভ্যস্ত আমাদের অনেক সময় বমি বমি করে, মাথাও ঘুরে যায়। পারীতে গোসল না করাটা আবার ফ্যাসান এবং আভিজাত্যের লক্ষণ। সে জন্যে পারীতেই ইউরোপের সেরা সুগন্ধি ইভ্ নিং ইন্ প্যারিসের জন্ম, আর তার বহুল ব্যবহার।

পারীতে দেখবার জিনিসের অভাব নেই। যা-ই দেখি সবই বিশ্ববিখ্যাত। বিশ্ব নিয়ে কারবারী এমন দেশ আর কোথাও দেখলাম না। দৃষ্টিভঙ্গীতে এরা যে সত্যই আন্তর্জাতিক তার পরিচয় প্রতি পদে পদে। জর্জ ওয়াশিংটন, রুজভেল্ট, ফ্রাঙ্কলিন, লেনিন, ষ্ট্যালিন সকলের নামেই এরা এদের পথ ঘাটের নামকরণ করেছে।

বৃহত্ত্বে আর ঐশ্বর্যে বিশ্বে পারীর লুভার মিউজিয়ামের জুড়ি নেই। লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখে মনে হয়েছিলো কি জানি কি দেখলাম। লুভারে এসে স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে গেলাম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সভ্যতার সমস্ত নিদর্শন আছে লুভারে। প্রাচীন গ্রীক, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের ভাস্কর্যের নমুনা তো আছেই, তাছাড়া মধ্যযুগীয় ইউরোপের ললিতকলার নিদর্শনেরও প্রচুর চিহ্ন এখানে বিদ্যমান। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির চিরন্তন নারীর অপূর্ব রহস্যময়তার প্রতীক মোনালিসার মূল ছবিটি আর ভেনাস দি মিলোকেও দেখলাম এখানে। চিত্রের তো তুলনাই নেই। ইতিহাস ও পুরাণের নানা কাহিনী চিত্র ও ভাস্কর্যে ধরা প'ড়ে এখানে চির বিরাজ করছে। মন দিয়ে আর বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে লুভারে দেখতে গেলে কতোদিন যে লাগবে, বিশেষজ্ঞরাই তার হিসেব দিতে পারেন। সাধারণ দর্শকের হাতে এতো সময় কই ?

পারীর সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম। যেমনি বৃহৎ, তেমনি গম্ভীর। সামনেই বিখ্যাত দার্শনিক অগাস্ত কোঁতের মূর্তি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সরবোনই বিশ্বের ছাত্র ও সুধী সমাজকে আকৃষ্ট করেছে। এই সেদিন পর্যন্ত পারীই ছিলো ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষায়, দর্শনে, শিল্প-সাহিত্যে, চিত্রে-ভাস্কর্যে—এক কথায় সাংস্কৃতিক জীবন-নির্মাণে ইউরোপের গুরু। সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিলো সেই জ্ঞান ও সংস্কৃতির সূতিকাগার!

নেপোলিয়ানের মাজার আঁভালিদকে ঘিরে নেপোলিয়ান সংক্রান্ত এক পরিদর্শনাগার গ'ড়ে উঠেছে। তাঁর জীবনের কীর্তি আর মৃত্যুর পথকে এখানে যেন থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি যুদ্ধে কি পোশাক পরেছেন, সেন্ট হেলনা দ্বীপে বন্দী হয়ে কি ভাবে তাঁর সময় কেটেছে, কোন্ বিছানায় ঘুমিয়েছেন, কোন্ মশারি খাটিয়েছিলেন সবই দর্শকদের চোখের সামনে ধ'রে রাখা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিবার-পরিজনদের ইতিহাসও রয়েছে।

পারীর মুসলমানদের মসজিদটি আমার ভালো লাগলো। মরক্কোর সুলতানেরাই উদ্যোগী হয়ে এ মসজিদটি এখানে নির্মাণ করেন। মসজিদটির কারুকার্য আশ্চর্য রকম সূক্ষ্ম। মনের ওপরে তা কোমলতার একটা স্পর্শ ছড়িয়ে দেয়। আগ্রার স্মৃতি-সৌধ এতমাদুদ্দৌলার সঙ্গে এর সূক্ষ্ম কলা-কৌশলের আর বাইরের সৌন্দর্যের কিছু মিল খুঁজে

পাওয়া যায়। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মুসলিম স্থাপত্যের একটি প্রবাহ দেখা যায়। তার বৈশিষ্ট্য আর পারীজেনদের রুচি ও রসবোধের সমন্বয়ে এ মসজিদটি গ'ড়ে উঠেছে। তাই বোধ হয় এ মসজিদটি এতো মাধুরীময়।

নরনারীর দেহ সম্বন্ধে এদের অহেতুক কুণ্ঠা কিংবা কৌতূহল নেই। প্রকৃতির অন্যান্য জিনিসের মতো মানব দেহকেও এরা সহজ দৃষ্টিভীঙ্গীতে গ্রহণ করেছে। পারীতে আর ভার্সাইএ নামকরা পথ খুব কমই আছে যেখানে দু'চার পা যেতে মানবদেহের ঐশ্বর্য এরা পাথরে প্রতিফলিত করেনি। ফরাসীরা যে লাবণ্য আর সুষমার চর্চায় অদ্বিতীয় তার চিহ্ন দেখা যায় পারীর গায়ে গায়ে। ফরাসীদের লাবণ্য-প্রীতি উছলে উঠেছে ওদের নগর পরিকল্পনায়, মেয়েদের অঙ্গসজ্জায়, রূপচর্চায়। ফরাসী মেয়েরা সত্যিই সুন্দরী। 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'। বড়ো মিষ্টি। বড় স্নিগ্ধ। আর ওদের সেই মধু মুখ দিয়ে অনুনাসিক সুরপ্রধান স্বরধ্বনি–ছন্দায়িত ফরাসী ভাষা যখন ঝ'রে পড়ে তখন সত্যিই মনে হয় যেন ওরা কথা বলছে না, কপোত কূজন করছে।

চৌদ্দ

লণ্ডনের পথ ঘাট আর দালান কোঠার দিকে চেয়ে সময়ে সময়ে এক রকম উল্টো ভাবনা আমাকে পেয়ে বসে। কোনো ব্যক্তিবিশেষ কিংবা জাতিবিশেষের যদি কোনো অতীত না থাকে, যদি সে ব্যক্তি বা জাতি কোনো একটি জায়গায় হঠাৎ গজিয়ে ওঠে, তাহলে কেমন হয়? তার ইতিহাস নেই। অতীত নেই। কোনো মানুষ বা জাতিবিশেষের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নেই। আপনাতে আপনিই স্বয়ম্ভু হয়ে একদিন এমনি কাউকে গজিয়ে উঠতে দেখা গেলো। তখন আর পেছনে কি আশেপাশে পরিচিত কাউকে না পেয়ে তার কি দশা হয় তা অনুভব করার এবং চিন্তা করার মতো। কোনো সুস্থ মানুষ বা জাতির জীবনে স্বভাবতই এমন অবস্থা দেখা যায় না, এই যা ভরসা। তাই সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করার জন্য ব্যক্তি বা জাতিবিশেষ কতো না আয়োজন করছে। তার সে আয়োজনের ভেতর দিয়ে তার স্বাতন্ত্র্য ও অগ্রগতির ইতিহাস সূচিত হচ্ছে।

চীনাদের সম্পর্কে একটি গল্প আছে। তারা জাতীয় ইতিহাস জানবার আগে নাকি পিতৃপুরুষের ইতিহাস আয়ত্ত করে। এ সত্যিই কৌতুকপ্রদ। ইতিহাসে দেশের যুগ যুগান্তরের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়। যে বর্তমান প্রতিদিন নিজেকে রচনা ক'রে দিয়ে যায় ইতিহাসের পাতায় তা অতীতের গায়ে গিয়ে পুঞ্জীভূত হয়। স্বচ্ছ পানির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তাতে যেমন নিজের মুখ প্রতিবিম্বিত হয় তেমনি ইতিহাসে মানুষ তার পিতৃপিতামহের কীর্তিকথা প্রতিফলিত দেখে। এ কারণেই বোধ হয় চীনারা দেশের ইতিহাস জানবার আগে নিজের পিতা, তস্য পিতা, তস্য পিতা করতে করতে তার চৌদ্দ কি আটাশ পুরুষের ইতিহাস করতলগত করে। জানে তাদের নাম। তারা কি কারণে খ্যাত কি অখ্যাত তার বিবরণ—ঘটনা ও কাহিনী। ভাবছি সত্যিই তো এ না হ'লে ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ

কি ক'রে জমবে ? আমাদের দেশে এমন ক'টা লোক পাবো যারা তাদের বাবা থেকে ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষের নাম অবাধে ব'লে যেতে পারে। মা থেকে ওপরের দিকে আর পাঁচজনের নাম করতেপারে।

এক একটি মানুষের মধ্যে দেখা যায় এ ভাবে তার মাতৃ কি পিতৃকূলের ঊর্ধ্বতন বহু পুরুষের নাম জানার স্পৃহা! যার এ স্পৃহা প্রবল তার আত্মসচেতনতাও উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রশংসনীয়।

ইংরেজদের প্রত্যেককে বিচারের সমান মাপকাঠিতে ফেলে যাচাই করা যায় না। তবু সত্য, ইংরেজরা জাতি হিসেবে আত্মসচেতন। তার পরিচয় পাই ইংলণ্ডের পথে ঘাটে। পথ চলতে গিয়ে রং বেরঙের ছোট বড়ো নানা আকারের মূর্তি দেখি। এ মূর্তিগুলোর কতকটা পৌরাণিক, অধিকাংশই ঐতিহাসিক। গ্রীক কি রোমকদের মতো কিংবা ভারতীয় হিন্দুদের মতো ইংরেজরা এতো বেশী পুরাণপ্রিয় নয়। কিন্তু ইতিহাসপ্রিয় তাদের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। খাস লণ্ডনে পৌরাণিক মূর্তি যা দেখি তা আর সংখ্যায় কয়টি ? পিকাডিলীর এরোস বা কামদেবতা কিউপিডের আর কেনসিংটন গার্ডেনের পিটার প্যানের মূর্তি। এ ধরনের আরও দু'চারটি মূর্তি বাদ দিলে লণ্ডনের প্রায় প্রতি প্রধান পথের আশেপাশে এক রকম দু'চার কদম আগে পরেই জাতীয় ইতিহাস রচনাকারী এমন ছোট বড়ো লোকের পাথরের বহু মূর্তি শোভা পাচ্ছে। যে সব মূর্তির গায়ে তাদের নাম ধাম, তাদের কীর্তি খ্যাতি খোদাই করা আছে। এদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ রাজত্ব বিস্তারের জন্যে যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। যুদ্ধ বিজয়ী কিংবা যুদ্ধে শহীদদের মূর্তি কি স্মৃতিস্তম্ভই এসবের মধ্যে সংখ্যায় বেশী। চলতে চলতে দেখবো কোন মা এদের স্মৃতির পূজোয় কখন ফুল দিয়ে গেছেন। কোন স্ত্রী ফুলের সঙ্গে স্মৃতির বেদীতে হৃদয়ের অর্ঘ্যও নিবেদন ক'রে গেছেন। জাতীয় জীবনে এর মূল্য কি কম ? আগের যুগের ইংরেজদের বীরত্ব ও জীবনদানের এসব কীর্তি ও স্মৃতিস্তম্ভ দেখে বর্তমানের ইংরেজরা প্রেরণা পাবে। তাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির করবে। সামনে চলার পথে উদ্দীপ্ত হবে। অতীতের পথ ধ'রে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ক'রে বর্তমানে ইতিহাস রচনা ক'রে যাবে। ইংরেজদের নগর পরিকল্পনা আর পথে মূর্তির বহর দেখে আমার এ কথাই মনে পড়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হই ট্র্যাফালগার স্কোয়ারের নেল্‌সনের কলাম দেখে। ট্র্যাফালগার যুদ্ধবিজয়ী নৌসেনাপতি নেল্‌সনের মূর্তি সুউচ্চ স্তম্ভের উপর স্থাপন করা হয়েছে। মুখে তার বিজয়ীর গৌরব। বুকে অপরিসীম সাহসের উদ্দীপনা। নীচে স্তম্ভের পার্শ্বদেশে বৃটিশ সিংহের দুই বিরাট প্রতিমূর্তি। আভাসে ইংগিতে বলা হচ্ছে, কোথাও যেন এদের পরাজয় নেই শুধু বিজয়দৃপ্ত অভিযানের এ ইতিহাস।

ইংরেজের ইতিহাস-প্রীতির কথা বলতে গেলে শুধু মূর্তি কিংবা ভাস্কর্যেই তার পরিচয় শেষ হয় না। যে সব মূর্তির কথা বলছি তা তো জন ও যান চলার পথের বহিরাবরণ হিসাবে বিরাজ করে। ইংরেজ ও তাদের অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরবে আপন মহিমা ঘোষণা করে। এছাড়া স্থান বিশেষে ইতিহাসকে জীবন্ত ও জাগ্রত ক'রে রাখবার প্রয়াসও এদের কম নয়। তার দৃষ্টান্ত দেখি এদের মিউজিয়াম বা যাদুঘরগুলোতে। সাম্রাজ্যলিপ্সা ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান লক্ষণগুলোর অন্যতম। পথের পার্শ্ববর্তী

মূর্তিগুলোতে তার কিছুটা পরিচয় পাই। কিন্তু তারও চেয়ে বেশী ক'রে পাওয়া যায় প্রাচীন অস্ত্র প্রদর্শনীর আগারগুলোতে। টাওয়ার অব লণ্ডন এমনি এক স্থায়ী অস্ত্র প্রদর্শনী। প্রাচীন কাল থেকে একাল পর্যন্ত এক এক যুগের সৈন্যরা কি সাজে সেজেছে, কি অস্ত্র ব্যবহার করেছে, কি অসুবিধায় পড়েছে, সে অসুবিধা থেকে বাঁচবার জন্য পরবর্তী যুগে কি উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে— বই-এর পাতায় তাকে নিবদ্ধ না রেখে এখানে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবসর মতো ছেলে বুড়ো সকলে তা দেখছে। শিক্ষিতদের স্মৃতির এতে হচ্ছে ঝালাই আর বই-এর পাতা থেকে মুখস্থ না ক'রে শিশুদের হচ্ছে এ থেকে চাক্ষুস শিক্ষা। যুগ যুগান্তের ইতিহাস এমনি ক'রে মানুষের চোখের সামনে আপনাকে আপনিই যেন মেলে ধরেছে। মানুষ না শিখে যাবে কোথা দিয়ে ? আর দেখে শিখে ভুলবেই বা সে কি ক'রে ? ইতিহাসের পুরানো পাতা চোখের সামনে যখন এমনি ক'রে ভেসে ওঠে তখন মানুষের অজ্ঞাতসারেই নতুন ইতিহাস আপনা থেকেই রচিত হয়ে যায়। জাতি কোনোদিন আত্ম বিস্মৃত হয় না। জাতির মর্মমূলে অতীত অলক্ষে দানা বেঁধে বেঁধে ভবিষ্যতের পথে আপনাকে রচিত ক'রে যায়। জাতীয় জীবনে এর প্রেরণা কি কম ?

এর মূল্য কি টাকা দিয়ে পরিমাপ করা যায় ? সমগ্র জাতির আত্মচেতনাকে বিদ্ধ ক'রে তাকে জীবন্ত রাখার এ এক অপরূপ আয়োজন।

* * *

একটি মানুষের জীবনে যা সত্য, একটি জাতীয় জীবনেও বোধ হয় তাই সত্য। যে যায় সে আর ফিরে আসে না। যাকে বর্তমান থেকে ঝরিয়ে অতীতের খাঁচায় বন্দী করা গেল, সে অতীত এমনি করুণ, এমনি নিষ্ঠুর যে, তার স্বমূর্তিতে সে কোনদিন আর তাকে ফিরিয়ে এনে দেবে না। বর্তমান ও অতীতের সম্পর্ক বড় ঠুনকো। প্রতিমুহূর্তের বর্তমান অতীতের অতল গহ্বরে যাচ্ছে তলিয়ে। কেউ কারও পাশে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে একটু যে মিষ্টি সম্পর্ক পাতাবে তার অবসর নেই। হয়তো বা মহাকালের নিষ্ঠুর নিয়মে তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু মানুষ মানুষ। সে জড় পদার্থ নয়। সে মহাকালের অমোঘ নিয়েমের মতো অমন নির্মমও নয়। তাই সে কল্পনা করে—যেদিনটি হারিয়ে গেলো তাকে ধ'রে রাখবার স্বপ্ন দেখে। যে মানুষ তার জীবন থেকে ঝ'রে গেলো তার স্মৃতি বুকে পুষে অবসর মুহূর্তে অঝোরে ব্যথা বারিধি রচনা করে। তবু 'আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে'— যদি আবার তাকে ফিরে পাওয়া যায়। তার অতীতের কীর্তি ও অপকীর্তি, গল্প ও রচনা, চাওয়া ও পাওয়া, সার্থকতা ও ব্যর্থতার সকল ইতিহাস একত্র ক'রে তাই এক জায়গায় গুছিয়ে রাখতে স্বতঃই সে ভালবাসে। সে-আগ্রহের বশেই সে রচনা করে বিরাট গ্রন্থাগার। গগনচুম্বী স্মৃতিস্তম্ভ। সুদৃশ্য কুতুবমিনার। 'সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জ প্রশান্ত পাষাণের তাজমহল'। সুবৃহৎ মিউজিয়াম। মূল অতীতকে মুখর করার জন্যে কতো না তার প্রয়াস।

লণ্ডনে এসে সুযোগ পেলেই একটা-না একটা মিউজিয়াম দেখে আসি। এখানে মিউজিয়াম কি একটা দুটো ? না একই ধরনের ? ছোট খাটো মিউজিয়াম তো বেশুমার। বড়ো মিউজিয়ামের সংখ্যাও কম নয়। এর মধ্যে ভিক্টোরিয়া এ্যালবার্ট মিউজিয়াম, সাইন্স মিউজিয়াম, ন্যাচারাল হিস্টরী মিউজিয়াম আর বৃটিশ মিউজিয়াম দেখবার মতো। বৃহত্বের

দিক দিয়ে সারা ইংলণ্ডে বৃটিশ মিউজিয়ামের জুড়ি নেই। জায়গার অভাবে এখানকার প্রদর্শনীয় জিনিসপত্রের কিছুটা ভিক্টোরিয়া এ্যালবার্ট মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বৃটিশ মিউজিয়ামের নানা ভাগ উপভাগ রয়েছে; ভারতীয়, চৈনিক, মিশরীয় ও সিরিয়াকে সভ্যতার নিদর্শনযোগ্য ভাগগুলোই এ মিউজিয়ামে সুরক্ষিত। প্রাচীনত্বে মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শনগুলো এ মিউজিয়ামের অন্যান্য সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছি এ বিভাগের মানব সভ্যতার চার হাজার বছর আগেকার নিদর্শন। সেকালের চেয়ার। কাঠ কুঠোর তৈরী জিনিস। ছোট ছেলের পায়ের জুতো আর সবার ওপরে মিশরের মমি। মমি অর্থাৎ সেকালের মিশরীয় রাজরাজড়া, রাজ-কন্যা ও রাজ-রাণীদের সুরক্ষিত মৃতদেহ। সেকালেরই কাপড় চোপড়ে জড়ানো। এমনভাবে ভাঁজে ভাঁজে কাপড়-চোপড় জড়িয়ে রাখা হয়েছে যে, দেখে মনে হবে যেন জীবন্ত মানুষই সটান হাত পা ছড়িয়ে ঘুমের ঘোরে ঢ'লে প'ড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে আমি অনাদি অতীতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি মনে নেই। দেখলাম সেই অনাদি কালের মানব সভ্যতার ধারা যুগে যুগে এক জাতির মানুষের ভেতর দিয়ে আপনাকে রচনা ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। বিস্তারিত ক'রে দিচ্ছে। বতর্মানের মানুষ আমরা অতীত মানুষেরই বংশধর। তাদের সাধনার আর আরাধনার পথ ধ'রে আমরা এগোচ্ছি সামনের দিকে। কিন্তু তাদের থেকে আমরা কতটুকু ভিন্নত্ব লাভ করেছি ? ঐ যে চেয়ারটি দেখছি। ঐ চেয়ারই তো এখন আমার বসবার উপকরণ। তার তুলনায় অধিক আরামপ্রদ আমি এমন কি আবিষ্কার করেছি ? সেই যে ছোট্ট জুতো জোড়া রাজকন্যা কি রাজপুত্রের শোভা বৃদ্ধি করেছিলো আজও তাদেরই বংশধর এ বনি-আদমেরা সেই চামড়ার তৈরী জুতো দিয়েই তাদের পদযুগল শীতাতপ ও কাদামাটি থেকে রক্ষা করছে। এখানে এসে বুঝতে পারছি মূক অতীত পাষাণ কারায় বন্দী হয়ে অব্যক্তবেদনায় আমার সঙ্গে মিতালী পাতাতে চাচ্ছে। অতীত আর বর্তমানের আমি যেন একই মানবীয় অনুভূতিতে একাকার হয়ে গেছি। অতীত যেন মানুষের ফেলে আসা দিন ও বহু জীবনের স্মৃতি বুকে নিয়ে মনে মনে নীরব আবেদন জানাচ্ছে

'কথা কও কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাওনি তুমি সব তুমি তুলে লও।
কথা কও কথা কও
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই
বিস্মৃত যতো নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে রও
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত, কথা কও কথা কও।

* * *

বৃটিশ মিউজিয়ামের পরে নাম করতে হয় 'মাদাম তুসো'র (Madam Tussud)। বিভিন্ন দেশের অতীত সভ্যতাকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে বৃটিশ মিউজিয়ামে। যে হারানো অতীত এখানকার মানুষের চোখে পড়বার নয় তাকেই চোখে চোখে রেখে প্রেরণা পাবার অপরূপ আধার হ'লো বৃটিশ মিউজিয়াম। এখানে ঢুকলেই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলোর

দিকে চেয়ে' যেন কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হ'তে শুনি 'নয়ন তোমাদের পায়না দেখিতে, রয়েছো নয়নে নয়নে।'

মাদাম তুসোর ভাবখানা অনেকটা সে রকমই। তবে তফাৎ এই যে, অন্যান্য মিউজিয়ামের যেখানে সুদূর অতীতই প্রাধান্য লাভ করেছে, মাদাম তুসোতে সেখানে অদূর অতীতই আর পলায়নপর বর্তমান নিয়ে কারবার। মাদাম তুসোর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এখানে চিত্রের বা ভাস্কর্যের ঠাঁই নেই। আছে শুধু মোমের। মাদাম তুসো নাম্নী এক ফরাসী ভদ্রমহিলা এ কারুশিল্পের গোড়া পত্তন করেন। তাঁরই নাম অনুসারে এ প্রদর্শনীটির নামকরণ করা হয়েছে।

এখানে বর্তমান ও অদূর অতীতের ঐতিহাসিকই নায়ক নায়িকাদের মোমের মূর্তি তৈরী ক'রে রাখা হয়েছে। বিস্মিত হ'তে হয় শিল্পীমনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখে। দৈনন্দিন জীবনে যে ভঙ্গী যাঁর সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং বহুল পরিচিত তাঁকে তাঁর বিশিষ্ট ভংগীতে মোমের মাধ্যমে ধ'রে দেওয়া হয়েছে। মাথার চুল, চোখের চাউনি, মুখের ভঙ্গী, পোশাকের বিশিষ্টতা, সব নিয়ে বিশিষ্ট মানুষ স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে শিল্পীর মনোজগতে ধরা প'ড়ে এখানে বন্দী হয়ে গেছেন। অনেক জানা মানুষকে এখানে মোমের মূর্তিতে স্বরূপে রূপায়িত হ'তে দেখে হঠাৎ বিস্মিত হ'তে হয়। মাদাম তুসোর মূর্তিগুলোতে জীবনের লক্ষণ এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে, যাঁকে দেখেছি তিনি যে একটি মূর্তিতে বন্দী হয়ে আছেন সে কথা কিছুতেই মনে পড়ে না। তাঁদের দেখে মনে হয় যেন তাঁরা তাদের কাজ কর্ম করার জন্যে নিজ নিজ জীবনের মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন। কথা বলতে বলতে যেন হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার কি কথা বলতে উদ্যত হয়েছেন। ঠোঁটের কোণে সে কথা যেন ফুটি ফুটি করছে।

একালের বিশ্ববিখ্যাত নেতাদের সকলেই আছেন। ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সকলেরই থাকবার কথা। সে জন্যে তাঁরা তো আছেনই। শুধু অষ্টম এডোয়ার্ড (বর্তমানে ডিউক অব্ উইণ্ডসর) আর তাঁর স্ত্রী (ভূতপূর্ব মিসেস সিম্পসন) রাজপরিবারের বাইরে স্বতন্ত্র স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রাজা পঞ্চম জর্জ। রাণী মেরী। রাজা ষষ্ঠ জর্জ। তাঁর রাণী। রাজকন্যা মার্গারেট। একালের রাণী এলিজাবেথ এবং রাজপরিবারের গণ্যমান্য সকলেই স্ব-মহিমায় আসন পেয়েছেন। হিটলার, মুসোলিনী প্রমুখ নেতাও বাদ যান নি। গান্ধীজিকে দেখছি তাঁর সেই চিরাচরিত 'Naked Fakir of India' র পোশাকে। নেহেরুও বাদ যান নি। দেখলাম আমাদের কায়েদে আযমকে, সেরওয়ানী পরিহিত পাকিস্তানী পোশাকে। তাঁর চেহারায় চিন্তাশীলতার স্বকীয়তা পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে।

এই জায়গায় এসে দেখছি রূপকথার নিদ্রিতা সুন্দরী সেই 'Sleeping Beauty' কে। তনু দেহ মেলে দিয়ে কতকাল ধ'রে ঘুমিয়ে আছেন তিনি, স্বপন পুরীর কোন্ রাজপুত্রের প্রতীক্ষায়। তার ক্ষীণ শরীর ছেয়ে স্নিগ্ধ কোমলতা যেন পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম সরু কাপড়ে তার দেহলতা সুশোভিত। তাকে নিশ্বাস নিতে দেখা যাচ্ছে। তার হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে, শ্বাস-প্রশ্বাস সুচারু যান্ত্রিক আয়োজনের ভিতর দিয়ে। মনে হচ্ছে তার নিশ্বাসে একটা সুমধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। হাত দিয়ে স্পর্শ করতে নিষেধ আছে। চোখ দিয়ে দেখে হৃদয়ে তৃপ্তি পেতে পেতে তাই মন দিয়ে তাঁর চরণ ছুঁয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

মাদাম তুসো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। দরজার সামনে পুলিশের পোশাক-পরা প্রহরী দেখছি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। সে কি সত্যিকার মানুষ না মোমের তৈরী বুঝতে পারছি না। দেখতে দেখতে আমি নিশ্চুপ হয়ে গেছি। এমন সময় দশ বারো বছরের গোটা দুই ইংরেজ মেয়েকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। তারা কিম্ভুতকিমাকার আধাকালো এই আমাকে দেখে মূর্তি ঠাওরে যেই না আমাকে স্পর্শ করছে, অমনি আমি সচকিত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছি। বেচারীদের ভুল ভাঙতেই তারা হতচকিত হয়ে ছুট দিয়েছে। আমি মনে মনে হেসে উঠলাম। সামনে পাহারা-রত মোমের পুলিশটিকে নিয়ে আমার যে দশা, আমাকে নিয়ে ওদেরও সে দশা হয়েছিল। ওদের ভুল ভাঙলো আমাকে ন'ড়ে উঠতে দেখে। আর পুলিশটিকে স্পর্শ ক'রে আমার ভুল ভাঙলে যে, সে মূর্তিই, মানুষ নয়।

* * *

লণ্ডনের Natural History Museum সত্যি মানুষকে মুগ্ধ ক'রে দেবার মতো। প্রাকৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস যেন এ মিউজিয়ামে জীবন্ত রূপ ধরেছে। জীব-জানোয়ার পশুপাখী তার আদিমতম অবস্থা থেকে কিভাবে বর্তমান রূপে এসে দাঁড়িয়েছে, এখানে এক দৃষ্টিতে তার একটা ধারণা পাওয়া যায়। প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকেই রাখা হয়েছে তার জীবনের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নয়, সেই পরিবেশকে যথাযথ সৃষ্টি ক'রে। মানুষ তার বুদ্ধি এবং মনের চর্চায় প্রকৃতিকে হাতের মুঠোয় কি ক'রে বন্দী করতে পারে তার আর একটি বাস্তব নিদর্শন পেলাম এ প্রাকৃতিক ইতিহাস প্রদর্শনীতে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী জন্মায়। তারা এখানে স্থান পেয়েছে তাদের স্বদেশের পরিবেশে। ছোট ছোট প্রাণী থেকে বৃহৎ প্রাণীর কেউ বাদ যায়নি। এক এক রকম 'স্পিশিস' (Species) বা গোত্রভুক্ত প্রাণীর হাড়গোড় তো আছেই, তারপর তাদের মৃতদেহকে স্বকীয় পরিবেশে জীবন্ত করা হয়েছে। তারা যে মৃত, প্রথম দৃষ্টিতে তা সহজে বুঝা যায় না। দেখছি হাতী ঘোড়া হরিণ জিরাফ বাঘ সিংহ শেয়াল বেবুন সবই আছে। জীবজগতের ইতিহাসের বিবর্তন কিভাবে বর্তমান রূপ পেলো, তা বই প'ড়ে শিখবার চাইতে এখানে এসে একবার দেখে ভালো ক'রে জানা যায়। তাতে পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়।

আশ্চর্য হচ্ছি ঘুঘু, পায়রা প্রভৃতি পেয়ারা পাখীগুলোকে দেখে। আপন আপন পরিবেষ্টনীতে যেমন ক'রে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে ব'সে থাকে, এখানেও তেমনি গাছের শুকনো কি সবুজ পাতায়-ভারা ডালে তাদের বসিয়ে রাখা হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় দেখছি কপোত কপোতী পরস্পর চঞ্চু সংলগ্ন হয়ে প্রণয়সম্ভাষণে লিপ্ত হয়েছে। কোন কোনোটার পাখায় গতির লক্ষণ। যেমন উড়ি উড়ি করছে।

এলাম কুকুরের আস্তানায়। কুকুরের জাতের এতো যে বিভিন্নতা আছে, এখানে এদের একত্রে দেখলে তা যেমন বিশ্বাস হয়, বইয়ে প'ড়ে কি শোনা কথায় মন যেন তাতে তেমন ক'রে সায় দিতে চায় না। ইংরেজরা ইতিহাস প্রিয় তা তো জানি, কিন্তু তারা যে এমন কুকুরভক্ত জাত তা এবারে ভালো ক'রে বুঝতে পারছি। ছোট থেকে বড়ো পর্যন্ত কত

জাতের যে কুকুর আছে, তা প্রথম দেখলাম। এক একটা দেখতে এক এক রকম। ছোট বেড়ালের সমান থেকে শুরু ক'রে সিংহের মতো কুকুরও দেখলাম। ইংরেজরা শুধু যে কুকুরভক্ত তাই নয়, কুকুরের 'রেস' ভক্তও বটে। কোন্ কুকুর কবে কোন্ রেস্ জিতেছে, তার পিতা ছিল কে, তার সন্তান কে হ'লো এমনি ক'রে তার আগের ও পরের কয়েক পুরুষের রক্তের অবিমিশ্রণ যেভাবে রক্ষা পেয়েছে, তাও সযত্নে দেখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Science Museumটি কিন্তু ভিন্ন ধাঁচের। এখানে ইতিহাস ও ভূগোল প্রীতি নেই। আছে বিজ্ঞান সাধনার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। এ যুগটাই বিজ্ঞানের যুগ। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। তাতে ইংরেজদের অবদান কম নয়। এ যুগে দুনিয়াতে চলতে গেলে প্রত্যেক মানুষেরই যাতে বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান হয়, এ মিউজিয়ামটি মূলত সেই প্রেরণার সৃষ্টি। আমাদের দেশের মানুষ তো দূরের কথা, যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তাদেরও অনেকে বিজ্ঞানের প্রাথমিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল নয়। দোষ দিইনে তাদের। কারণ বই প'ড়ে শিখতে গিয়ে কোনোটা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, কোনোটা বা মাষ্টারের হাত থেকে ফসকে গেছে। ফলে বিদ্যা হয়েছে কেতাবী, প্রত্যক্ষ জ্ঞানগোচর নয়। প্রাথমিক জ্ঞানে যে প্রত্যেক মানুষেরই একটা সাধারণ অধিকার রয়েছে, তার একটা সুরাহা হয়েছে এখানে। কিসের থেকে কি আবিষ্কার হলো, কোন্ যন্ত্রে কি হয়, যন্ত্রপাতি কি ক'রে ব্যবহার করতে হয়, এখানকার ছোট ছোট ছেলেপুলেরা পর্যন্ত অবসর বিনোদনের জন্য এখানে এতে নেড়ে চেড়ে তা শিখতে পারছে। একজায়গায় দেখছি ছাদ থেকে একটা বিরাট পেণ্ডুলাম ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তার নীচে মেঝেতে এঁকে রাখা হয়েছে একটি বিরাট ঘড়ি। সকালে এসে দেখা যায় পেণ্ডুলামটি হয়তো আটটা বরাবর ঝুলছে। দুপুরে এসে এই পেণ্ডুলামটিকেই ঝুলতে দেখছি বারোটার দাগ বরাবর। পৃথিবী যে অনবরত ঘুরছে, এর চেয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ সাধারণের কাছে আর কি হ'তে পারে?

পনের

লণ্ডনে পাকিস্তানের হাই কমিশনের বেসমেন্টের রেস্তোরাঁয় ব'সে একদিন লাঞ্চ খাচ্ছি। পাকিস্তানী এবং ভারতীয় ছেলেরা মুখের স্বাদ বদল করতে প্রায়ই এখানে খেতে আসে। রেস্তোরাঁর অধিকারী এক বিত্তশালী পাকিস্তানী। পাকিস্তান থেকেই বাবুর্চি আমদানী করা হয়েছে। পরিবেশনকারিণীরা সব কয়টিই ইংরেজ। আমরা কয় বন্ধু মিলে এক টেবিলে ব'সে খাচ্ছি। পাশে বিলেতে নবাগত এক পাঞ্জাবী শ্রেষ্ঠীকে দেখছি খেতে। ভদ্রলোক সিদ্ধ খাবারের দেশ বিলেতে রসনা-পরিতৃপ্তিকর দেশী পোলাও কোরমা পেয়ে গোগ্রাসে গিলছেন। তাঁর কোরমা ফুরিয়ে যাওয়াতে হাতের তুড়ি দিয়ে 'ওয়েট্রেস' এর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন– Waitress, give me a plate of this– কোরমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

পরিবেশকারিণী ইংরেজ তরুণী ভদ্রলোকের সম্ভাষণের ধারা দেখে রীতিমতো চটে গেছে তা বুঝতে পারলাম তার চোখে মুখে বিরক্তির আভাস দেখে। কাজ যখন করতেই হবে, তখন তার কথা না শুনে বেচারী পারেই বা কি ক'রে ? বিরক্তির সঙ্গেই এক প্লেট কোরমা সে ভদ্রলোকটিকে এনে দিল। মেয়েটি ভদ্রলোকটির কাছ থেকে অন্তত একটা মামুলি ধন্যবাদ পাবারও আশা করছিলো। ধন্যবাদ যে দিতে হবে সে জ্ঞানটুকু ভদ্রলোকটি লণ্ডনে এই প্রথম এবং সদ্য-আগত ব'লে হয়তো আয়ত্ত করতে পারে নি। বুঝলাম দেশে বহু চাকর-বাকর খাটিয়ে খান। তাদের কাছ থেকে সেবা আদায় করেন টাকার দাবীর জোরে। তাদেরও যে ব্যক্তিত্ব আছে এবং পারিশ্রমিকের ওপরেও শ্রমের একটা মর্যাদা যে দিতে হবে, আমাদের দেশের আর পাঁচজন বিত্তশালী লোকের মতো তিনিও তা জানেন না। এ ইংরেজ মেয়েটিকে ধন্যবাদ দেওয়া তে দূরের কথা তিনি কোরমা পেয়ে আবারও নির্বিকারভাবে গিলে যেতে লাগলেন। আমরা খাচ্ছি। বন্ধুদের পরস্পরের প্রতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। ভদ্রলোক এবং তরুণীটির পরস্পরের ব্যবহার দেখে মুচকি মুচকি হাসছি। আর ভাবছি, শেষ পর্যন্ত মেয়েটি কি করে।

ভদ্রলোকের দ্বিতীয় প্লেট কোরমাও খাওয়া হ'লো। তিনি আবারও পূর্বের ভঙ্গীতে হাতের তুড়ি মেরে যেই ইংরেজ তরুণীটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গেছেন, অমনি মেয়েটি ক্ষোভে অভিমানে একেবারে হাউইয়ের মতো ফেটে প'ড়ে বললো, Gentleman, don't you know manners? এ রকমের যে কিছু একটা হবে, ওর চোখে মুখে আসন্ন ঝড়ের আভাস দেখে তা বুঝতে পেরেছিলাম। তাই বিস্মিত হইনি। কিন্তু যাকে লক্ষ্য ক'রে এসব কাণ্ড ঘটে গেল, তিনি কিন্তু কি অন্যায় করেছেন তা তখনও বুঝতে পারেননি। এবার মেয়েটিকে দেখলাম। ক্রোধ তার কমে এসেছে। অভিমানে নাকের ও চোখের কোণ-ঘেঁষা কান্না চেষ্টা করেই বেচারী চেপে যাচ্ছে।

এ বিশ্রী কাণ্ডটা আমরা আর এগুতে দিলাম না। উভয় পক্ষকেই সামলে নিলাম। ভাবছি, মেয়েটি এরকম ক্রোধেই বা ফেটে পড়লো কেন ? আর লজ্জায় অভিমানে কান্নাই বা চাপলো কেন। ভদ্রলোকের সম্বোধনের ধারায় মেয়েটির শালীনতাবোধ এবং আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছে। আমাদের দেশের ঝি-চাকরের মতো সে কারো ঝি নয়। সেবাদাসী তো নয়ই। সে ঘন্টা ধ'রে খাটতে এসেছে। সে শ্রম করবে আর তার শ্রমেরই দাম নেমে। কিন্তু শ্রম করবার সময় মানুষ হিসেবে এবং ব্যক্তিবিশেষ হিসেবে তার মর্যাদা, সেও যে Miss অমুক এ বোধ কোন ক্রমেই সে ক্ষুণ্ন হ'তে দিতে চায় না। এরকম ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের আর পাঁচজন নরনারীর মতোই Miss Waitress, would you give me a plate of ইত্যাদি ধরনের একটা সম্বোধন সে আশা করেছিলো। প্রথমত, সে তা পায় নি। দ্বিতীয়ত, পরিবেশন করার পর ভদ্রলোকটির কাছ থেকে সৌজন্যসূচক একটা ধন্যবাদও স্বভাবতই সে পেতে পারতো, তাও পায়নি। আত্মসচেতন মেয়েটির এতে রাগ হবার কারণই বটে। তাই দ্বিতীয় কি তৃতীয় বারে একই জিনিস বারংবার ঘটতে দেখে নিজেকে সামলাতে না পেরে এ অভিমানিনী মেয়েটি রেস্তোঁরা ভরা এতগুলো লোকের মধ্যে একটি নাটকীয় দৃশ্যের নায়িকা রূপে ফুটে উঠেছে।

এ রকম ক্ষেত্রে সব ইংরেজ নারী পুরুষই যে এমন দৃশ্যের অবতারণা করে তা নয়। ইংরেজদের হোটেল রেস্তোরায় বহু বিদেশী নিত্য খানাপিনা করছে। সকলেই যে ইংরেজদের আদব, তরীকা বা etiquette জানে তাও নয়। তবে এ'রকম হ'লে কেউ নিজেকে সামলাতে পারে, কেউ পারে না। কিন্তু একটি কথা সত্য যে, সকলেই এ আচার আচরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করে। তার কারণ, ইংরেজদের তীক্ষ্ণ আত্মসচতেনতা বা আত্মমর্যাদাবোধ। এ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে এখানকার সাধারণ নরনারীও এক একটি ব্যক্তিবিশেষ। তারা এক একটি Individual. তাদের এ বৈশিষ্ট্য-বোধ থেকে অপরে তাদেরকে সম্মান করুক, তাদের মর্যাদা রক্ষা করুক, এও যেমন তারা চায়, তেমনি অপরকেও তারা যথাযোগ্য সম্মান দেয়। এ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই হ'লো ইংরেজদের নাগরিক জীবন বোধের গোড়ার কথা।

অনুভূতি যে তাদেরকে অপরের প্রতি কতো বিবেচনাশীল এবং সহানুভূতিসম্পন্ন ক'রে তুলেছে, তা ব'লে শেষ করা যায় না। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চলাফেরা, ওঠা বসা, কাজকর্ম দিয়ে জাতীয় চরিত্রের বিচার করা যায়। আমি কিছুদিন ধ'রে একটি মধ্যবিত্ত ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে বাস করছি। কর্তা, গিন্নী, দুটি সোমত্ত মেয়ে, একটি স্কুলে পড়ুয়া আর একটি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়গামী ছেলে নিয়ে এই পরিবারটি। মেয়ে দুটির একটি নার্স আর একটি নাচের শিক্ষয়িত্রী। স্থানীয় একটি নাচের স্কুলে সে নাচ শেখায়। এদের বড়ো ভাইয়ের নাম ডেরিক হার্ড। লণ্ডনে আমার সঙ্গে এক হোষ্টেলে থাকে। গরমের ছুটিতে কিছুদিনের জন্যে সকলেই একত্রে বাস করছে। এদের মা বাবা ভাই বোনদের প্রত্যেকের শিক্ষা এবং জীবিকার পথ আলাদা। প্রত্যেকের জন্যই স্বতন্ত্র ঘর। আপন আপন ঘরে প্রত্যেকেরই দেখছি রেডিও সেট রয়েছে। সন্ধ্যার পরে যে যার ঘরে ঢুকে আপন আপন কাজে মনোনিবেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ঘরে রেডিও চলতে লাগলো। কিন্তু এক ঘরের রেডিওর আওয়াজ অন্য ঘরে শোনা গেল না। ডেরিকের বড়ো বোনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এতো ধীরে রেডিও ছেড়েছ কেন?' সে বললে, 'ধীরে কোথায়? এর চেয়েও ধীরে ছাড়লে আমি যদি শুনতে পেতাম তা হ'লে তাই করতাম। আমার রেডিও আমারই রুচি অনুসারে আমারই শোনার জন্যে। অন্য কেউ শোনার জন্যে আমাকে তো অনুরোধ করেনি। জোর ক'রে আমি যদি শোনাতে যাই, তা হ'লে তারা শুনবে তো নাই, বরং মনে মনে বিরক্ত হবে। তাদের অসুবিধে হবে।'

দেখছি, মিস্ হার্ড শুধু তার নিজের কথাই বলছে না, তার জাতের প্রতিনিধি হিসেবেই যেন সে আমার কাছে তার বক্তব্য পেশ করছে। কোন ইংরেজ বাড়ীতে জোর ক'রে অপরের বিরক্তি উৎপাদন ক'রে কোন রেডিও চালাতে কি শোরগোল করতে দেখলাম না।

যা বলছিলাম। উত্তর লণ্ডনের ওয়েষ্টবিয়ার রোডের এক পোলিশ পরিবারের 'পেইং গেস্ট' হিসেবে আমি কিছুদিন বাস করেছি। আমাদের সঙ্গে এই পরিবারে এক ইংরেজও বাস করতেন। ডিনার টেবিলে ব'সে এর সঙ্গে নানা প্রকার খোশগল্প করতাম। এক রাত্রিতে পরীক্ষার দুর্ভাবনায় আমার ঘুম আসছে না। ঘরের মধ্যে আমি পাইচারী করছি। এপ্রিলের রাত্রি। তখন দুটো বাজে। আর ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই ভোর হবে। আকাশ পরিষ্কার আছে

ব'লে হয়তো সূর্যেরও মুখ দেখতে পাবো। শঙ্কা ত্রাস অস্বস্তিতে মন আমার ভ'রে উঠেছে। ঘরে থাকতেও ভালো লাগছে না। বাইরে গিয়েই বা নিষ্কৃতি কোথায়? মনের এই দোলায়মান অবস্থায় আমার ঘরের দরজা খুলতেই দেখি একটা ছায়ার মতো সূক্ষ্ম পদার্থ সন্তর্পণে রেলিং ধ'রে ধ'রে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। মনে খটকা জাগলো। এত রাত্রে এতো চুপিসারে কে এমন গোপন অভিসার ক'রে ফিরছে ? তাকে অনুসরণ করলাম। আস্তে আস্তে উপরে উঠতে দেখি সেই ইংরেজ ভদ্রলোক অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলে তাঁর নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন। আমি আর তাকে বিরক্ত করলাম না। বুঝলাম, এতো রাত্রে বাইরে থেকে এসেছেন ব'লেই এ সতর্কতা। এ না ক'রে ভাড়া দিয়ে এখানে থাকেন ব'লে, অথবা নিজের ঘর ব'লে তাঁর দাবী প্রতিপন্ন করার জন্যে ধমাধম আওয়াজ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে উঠে 'জোরসে' দরজা খুলে আরও বেশী জোরে দরজা লাগিয়ে ধড়াম ক'রে বিছানায় পড়তে পারতেন। কিন্তু তাহলে এ বাড়ীতে যে আরও মানুষ আছে এবং এতো রাত্রে সকলেই যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকতে পারে, এ বিবেচনা তার আছে ব'লে বোঝানো যেতো না। তাই চোরের মতো চুপিসারে তিনি উপরে উঠে গেলেন। ভাগ্যিস চোর ব'লে আমি চেঁচিয়ে উঠে কোন অনাসৃষ্টি কাণ্ড বাধাইনি।

অপরের প্রতি বিবেচনাশীলতা ইংরেজের এমনি মজ্জাগত এবং জীবনধারার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে যে, অনেক সময় তার বাড়াবাড়িও কম দেখিনি। একদিন সেলফরীজ-এ গিয়ে কতকগুলো টুকিটাকি জিনিস কিনলাম। খুচরা পয়সা ছিল না, তাই কাউন্টারের ভদ্রমহিলাটিকে একটি পাউণ্ড দিলাম। তিনি তার পাওনা রেখে চেঞ্জগুলো আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। কয়েকটি শিলিং আর অনেকগুলো পেনি আমার হাতে দিতে গিয়ে একটা ক'রে কয়েন আমাকে দেন, আর বলেন, 'থ্যাঙকিউ' আর একটি দেন, আর বলেন, 'থ্যাঙকিউ'। এ থ্যাংক্স দিতে দিতে ভদ্রমহিলা ক্লান্ত হয়ে শেষে সংক্ষিপ্ত পথ ধরলেন—'কিউ-কিউ-কিউ'।

ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের এ-বৃহত্তম নাগরিক চেতনা প্রতিফলিত হ'তে দেখি তার খুঁটিনাটি আচার আচরণে, Manners এবং etiquette-এ। শোবার ঘরে কি বসার ঘরে থুথু ফেলে এরা দেওয়ালকে চিত্রিত করে না। এমন কি রাস্তাঘাটেও সাধারণত এদের থুথু ফেলতে কি নাক ঝাড়তে দেখা যায় না। প্রয়োজন হ'লে হয় রুমালে ফেলে বাড়ীতে নিয়ে এসে সেটি নিজেই কেচে নয় কিংবা এমন কোন জায়গায় ফেলে যেখান থেকে কোন রকম রোগজীবাণু সংক্রামিত হ'তে না পারে। ঠিক তেমনি ডিনার কি লাঞ্চটেবিলে ব'সে খাবার শেষে আর পাঁচ জনের সামনে দাঁতে লেগে থাকা খাবারের কণা বের করবার জন্যে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কাউকে খেলাল চালাতে দেখলাম না। খেলাল করার প্রয়োজন যে এদের হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা এরা সারে পাশের 'ওয়াশিংরুমে' গিয়ে। কাশি বা হাঁচি যে এদের আসে না তা নয়, কিন্তু মানুষের সামনে হাঁচি দিলে Excuse me ব'লে দোষটা এরা সারিয়ে নেয়। ক্লাশে প্রফেসারের বক্তৃতা শুনতে শুনতে ক্লান্ত ছাত্রছাত্রীকে অনুরূপ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের মতো শিক্ষকের সামনে ব'সে থেকে বোয়াল মাছের মতো হা ক'রে হাই তুলতে কি খাবি খেতে দেখলাম না।

কোনো জায়গায় আলোচনা সভা চলছে কিংবা একের অধিক লোকজন ব'সে কোনো রকম ঘরোয়া আলোচনাই চালাচ্ছে হয়তো। সে রকম ক্ষেত্রে একজন কথা বলা শুরু করলে যতোক্ষণ পর্যন্ত তার কথা শেষ না হয়, ততক্ষণ আর কেউ কথা বলবে না। সকলেই একসঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা ক'রে আসর গরম ক'রে তুলবে না–অবশ্য যদি না কোনো দুষ্টবুদ্ধি প্রাণোদিত হয়ে কেউ আলোচনা সভা ভণ্ডুল ক'রে দিতে চায়। কোনো কমন রুমে কিংবা লোকবহুল কোনো ঘরে আমাদের দেশ থেকে এ পরিবেশ-অনভিজ্ঞ কোনো মানুষকে যদি হঠাৎ এনে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে এতোগুলো লোকের এক সঙ্গে সমাবেশ অথচ চেঁচামেচি না ক'রে তাদের পার্শ্ববর্তী লোকের সঙ্গে পরস্পরকে ফিস্ ফিস্ করতে দেখে তারই বিরুদ্ধে এরা কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে কিনা তা ভেবেই সে হতচকিত হয়ে যাবে। এদের জাতীয় চরিত্রের এ গুণগুলোর কথা যতোই ভাবি, ততোই মুগ্ধ ও বিস্মিত না হয়ে পারি না। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের এ যে মহৎ গুণ সে কথা অস্বীকার করবে কে ?

ষোল

মানুষকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য পথ থেকে একটি কাঁটা সরিয়ে দেওয়া ইসলামে ঈমানের লক্ষণ। অপরের প্রতি বিবেচনা থেকেই এই ধর্মপ্রবণতার জন্ম। ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষের মধ্যে এ গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের বাড়ীর পাশেই ঘরের কোনো জিনিস ফেলে রাখবার উপায় নেই। ঘটি, বাটি, হেঁসে, বটি যা'ই কোনো ঘরের বাইরে ছেলেপুলেরা খেলতে খেলতে ফেলে আসুক না, দ'দণ্ড পরে সেগুলো খুঁজতে গিয়ে কি আর পাওয়া যাবে ? দোতলা, তেতলা থেকে কাপড়-চোপড় যদি বাতাসে প'ড়ে যায়, দু'দণ্ড পরে খোঁজ নিলে সেগুলো কি আমরা আর ফিরে পাই ?

ইংলণ্ডের মানুষ এ ধরনের মানসিক অশান্তি ও আতঙ্ক থেকে মুক্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ডের বাজারের মতো বড়ো বড়ো দোকানগুলোর খোলা মেলা জায়গা থেকে কিছু কিছু জিনিস অবশ্য উধাও হ'তে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অসতর্কতার জন্যে কখন কোন্ জিনিসটা না জানি হারিয়ে যায়, এ আতঙ্কে সব মানুষের মন অস্থির থাকে না। ইংলণ্ড যে বড়ো চুরি এবং বড়ো ডাকাতি থেকে একেবারে মুক্ত তা নয়। সেখানেও সংঘবদ্ধভাবে বড়ো বড়ো চুরি ডাকাতি হয়। তবে সে চোর ডাকাতদের নজরে থাকে 'মারি তো হাতী আর লুট তো ভাণ্ডারে'র দিকে। মাছি মেরে তারা হাত গন্ধ করতে চায় না। ফলে সাধারণ মানুষের মনের স্বস্তিবোধ নষ্ট হয় না। ইদানিং ইংলণ্ডের বড়ো বড়ো শহরগুলোতে নানান জাতির লোক এসে বসবাস করছে। সে জন্যে ছোটখাটো চুরি এবং 'ক্রাইম' কিছু কিছু বাড়ছে। এর জন্যে দায়ী খাস ইংলণ্ডের লোকেরা অবশ্য নয়।

লণ্ডন, ম্যানচেষ্টার এবং ডাণ্ডি প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলগুলোতে আমাদের নোয়াখালি, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের অনেক লোক স্বায়ীভাবে বসবাস করছে। এদের অধিকাংশই এসেছে

জাহাজের খালাসী হয়ে। কিন্তু জীবনের বিচিত্র স্বাদ পাওয়ায় এখান থেকে আর দেশে ফিরে যায় নি। ম্যানচেষ্টারে নোয়াখালির একটি লোকের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তার মাসিক আয় আমাদের হিসাবে শ চারেক টাকা। আমাদের দেশে মাসে সে গোটা পঞ্চাশেক টাকা পেলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতো। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এতো টাকা তুমি কি করে উপায় করো ?' সে বললে, 'জানেন, এখানকার লোকগুলো ভারী বোকা। আর মেম সাহেবগুলো আরও বেশি ; শনি রবিবারে আমি ফুটপাথে 'নাইলন' বিক্রি করি। যে দাম বলি তাতেই কেনে। কোন দর দস্তুর করে না। আমি যে দামে কিনি তার চেয়ে যে অনেক বেশী দাম নিই তার জন্য কিছু একটু বলেও না। বুঝলাম, একে তো খাস ইংরেজরা স্বদেশে কোনো জিনিসের দর করে না, তার ওপর সপ্তাহ শেষে শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা মাইনার কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে আপনার শক্তি মতো দেদার খরচ করে। এরই ফলে এদের শ্রীবৃদ্ধি, কিন্তু আর কতোদিন বাইরের লোকেরা এদেরকে এমন ক'রে ঠকাবে ?

এক লণ্ডন শহরে প্রতিদিন বাসে, ট্রেনে এবং টিউবে যে কতো লোক চলাফেরা করছে, তার সংখ্যা গণনা করা সহজ ব্যাপার নয়। শীতের আর অনিশ্চিত আবহাওয়ার দেশ ইংলণ্ড। সে জন্যে অধিকাংশ মানুষই হাতের গ্লভ্স, বর্ষাতি, ওভারকোট, ছাতা ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে চলাফেরা করে। কতো লোক যে ভুল ক'রে কতো জিনিসপত্র ছেড়ে যাচ্ছে, তা দেখে চোখ স্থির হয়ে যায় লণ্ডন ট্র্যান্সপোর্টের লষ্ট প্রপার্টি অফিসে গেলে। যে যা কিছু ফেলে যাচ্ছে, সব গিয়ে জমা হচ্ছে এ অফিসে। একজন ভুল ক'রে কোন জিনিস ফেলে গেল ব'লে আর একজন হৃষ্টচিত্তে সেটি ঘরে নিয়ে এসে নিজের ব'লে দাবী করবে না, বরং সে সহায়তা করবে জিনিসটি যেন মালিকের কাছে কিংবা লষ্ট প্রপার্টি অফিসে ঠিকমতো পৌছে সে জন্যে। আপন আপন জিনিসের পরিচয় ও বর্ণনা দিয়ে এ অফিস থেকে জিনিসের মালিক তার জিনিস উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসছে। দেশের সাধারণ মানুষ যদি সহায়তা না করে, তাহলে এমন বিহিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজ নয়, সম্ভবও নয়।

এ প্রসঙ্গে আমার নিজের জানা একটি ছোট ঘটনার কথা বলি। একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশন থেকে এক ট্যাক্সি ক'রে কয়েক জায়গা ঘুরে ফিরে বাসায় এলাম। তিনি তাঁর কতকগুলো কাজের জন্যে সেদিন সকালেই তাঁর এ্যাকাউন্ট থেকে পঞ্চাশটি পাউণ্ড তুলে মানিব্যাগে ক'রে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। অন্য কতকগুলো কাজের চাপে প'ড়ে সেদিনের মতো তিনি আর টাকা খরচ করতে পারেন নি। কথা বলতে বলতে আর মানিব্যাগটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কখন যে টাকা শুদ্ধ মানিব্যাগটি টাক্সিতে ফেলে রেখেছেন, তা তিনিও খেয়াল করেন নি, আমিও না। কয়েকটি জায়গা ঘুরে ফিরে আমরা যখন বাসায় পৌছলাম, তখন রাত্রি দশটা হবে। নিশ্চিন্তে রাত্রি কাটিয়ে সকাল বেলায় ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আমরা যখন বাইরে বেরোতে যাচ্ছি, তখন উনি পকেটে হাত দিয়ে দেখেন, টাকাটা শুদ্ধ তাঁর মানিব্যাগ নেই। শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনিও এমন কিছু বড়ো লোক নন। দেশে স্ত্রী পুত্র ফেলে এসেছেন একটা ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে নিজের ক্যারিয়ার ভালো করার জন্যে। হঠাৎ ট্যাক্সিতে এতগুলো টাকা হারানোর বেদনা

তারও চোখে মুখে ফুটে উঠতে দেখলাম। তাঁকে কি ব'লে সান্ত্বনা দেবো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। গতকাল ট্যাক্সিতে হাতে কম্বরে মানিব্যাগ নাচাতে নাচাতে সেখানেই যে অন্যমনস্কভাবে সেটি ফেলে আসা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ রইলো না। কিন্তু এখন সে ট্যাক্সি ড্রাইভারকেই বা পাওয়া যায় কি ক'রে ? তার ট্যাক্সির নাম্বার নেওয়া হয়নি, জানিও না। তাকেও আমরা চিনি না, সেও আমাদের চেনে না। তাছাড়া আমাদের নামিয়ে দেওয়ার পর সে যে অন্য আরোহী নিয়ে চলাফেরা করেনি তারই বা নিশ্চয়তা কি ? সে আরোহীই যে হাতে পেয়ে এমন মুফতের মাল মেরে দেয় নি, তাই বা কি ক'রে বলি ? নানা দুর্ভাবনায় এবং অশান্তিতে আমাদের সেদিনটা কাটলো। পরের দিন সকালে দেখি সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বয়ং আমাদের বাসস্থানে মানিব্যাগ শুদ্ধ এসে হাজির হয়েছে। সে রাত্রে আমাদেরকে আমাদের বাসস্থানে রেখে যাওয়ার পর আরও দু'জন আরোহীকে সে তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেয়। পরদিন সকালে গাড়ী নিয়ে বেরুনোর সময় এ মানিব্যাগ তার নজরে পড়ে। খুলে দেখে তার ভেতরে এ টাকাগুলো রয়েছে। মানিব্যাগেও নাম ঠিকানা কিছু লেখা নেই। কার এ মানিব্যাগ কিছু ঠিক করতে না পেরে সেদিন যত লোক সে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নামিয়েছে, সে সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে সারাদিন খুঁজে কোনো কূলকিনারা না পেয়ে আজ সকালে আসে আমাদের খোঁজে এবং ওটা যে আমাদেরই বিশেষভাবে সে তথ্য জেনে আমাদের হাতে টাকা শুদ্ধ মানিব্যাগটা সঁপে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। যথার্থ মালিকের হাতে এ টাকাগুলো তুলে দিতে পারায় সে যে কি আনন্দ পেয়েছে, তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম।

এ মানুষটির সততা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। দরিদ্র ইংরেজ। ট্যাক্সি চালিয়ে এমন কিইবা সে পায় ? নিশ্চয় আর্থিক স্বচ্ছলতার ভেতরে তার জীবন কাটে না। সুতরাং মুফ্‌ত এ টাকাটি পাওয়াতে তার আনন্দ হবার কথা। তাছাড়া না খেটে দু'চারদিন বেশ আরাম করার কথা। কিন্তু তা না ক'রে সে কিসের জন্যে এ অজানা অচেনা লোকগুলোর পেছনে ধাওয়া ক'রে ফিরেছে। যতোই একথা ভাবছি, ততোই সাধারণ ইংরেজের সততায় এবং মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে উঠেছি।

এ রকম ঘটনা যে আমাদের দেশে কখনও ঘটে না তা নয়। ঢাকায় একবার আমার এক বন্ধুর পকেট থেকে একটা ডায়রি প'ড়ে যায়। তাতে তার নাম ঠিকানা, সাংসারিক আয়ব্যয়ের হিসেব, প্রয়োজনীয় নানা টুকিটাকি টোকা ছিল। আর ছিল গোটা কুড়ি টাকা। বন্ধুটি মনে করেছিলেন, এ টাকা কয়টির জন্যেই তিনি তাঁর নোট বইটি আর ফিরে পাবেন না। নইলে হয়তো ওটা পাওয়া যেত। মৌলবী বাজারের এক দোকানদার সেটা পান এবং মালিকের হাতে টাকা শুদ্ধ ফিরিয়ে দেবার জন্যে তিনি ভয়ানক ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। নোট বইটিতে বন্ধুটির পরিচিত যতো লোকের টেলিফোন নম্বর লেখা ছিল ভদ্রলোক নিজের গাটের পয়সা খরচ ক'রে সব জায়গায় টেলিফোন করেন এবং অবশেষে এক জায়গায় যথার্থ মালিকের খোঁজ পেয়ে তার হারানো ধন তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। এমন লোক যে আমাদের দেশে নিতান্ত বিরল তাও নয়। তবু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে অভাবের তাড়নায় হোক, কি বড়োদের অসততার জন্যেই হোক আমাদের দেশে এর বিপরীত ধরনের ঘটনাই বেশী ঘটছে।

লণ্ডনে আর একদিনের কথা বলি। নতুন এসেছি। পথ ঘাটও তেমন চিনি না। দু'মিনিটের পথ যাই দশ মিনিটে। সাউথ লণ্ডনে কি একটা অফিসেরে খোঁজ ক'রে ফিরছি। রাস্তার এধারে ওধারে তাকাই। খুঁজে পাই না। সাহস ক'রে কাউকে যে জিজ্ঞেস করবো, এমনও ভরসা হয় না। ষাট পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধ পাশের দোকান থেকে অনেকক্ষণ ধ'রে আমার এ অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করছিলো। শেষটায় আমি কি খুঁজছি এবং আমাকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারে কিনা, সে কথা উঠে এসে জিজ্ঞেস করলো। অমুক অফিসে যেতে চাই তাকে বলতেই অফিস খুঁজে বের করবার জন্যে সে চঞ্চল হয়ে উঠল। ওকে একে জিজ্ঞেস ক'রে লোকজন জড়ো ক'রে সে একটা হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে তুললো। ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখে আমি যে কি বিব্রত বোধ করতে লাগলাম, তা আমিই জানি। শেষ পর্যন্ত আমাকে ঠিক মতো অফিসে পৌছে দিয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

ইংলণ্ডে এসে অবধি খবরের কাগজগুলোতে বিদেশীদের এ ধরনের অভিজ্ঞতার কথা হরদম পড়ছি। দেশে থাকতেও বিলেত ফেরতদের কাছ থেকে এ ধরনের কথা অনেক শুনেছি। এ লোকগুলো কিন্তু দেশের চালক নয়। বিদ্বান বুদ্ধিমান এবং রক্ষণশীল ইংরেজও নয়। এরা এ দেশের সাধারণ মানুষ। এরাই দেশের অধিকাংশ। সুতরাং এরাই তো দেশ। যে দেশে এ রকম লোকের সংখ্যা বেশী, সে দেশের অধঃপতন সহজে আসে না এবং মরতে বসেও যে সে দেশ বেঁচে ওঠে, ইংলণ্ড তার নিদর্শন।

সতের

সাধারণ ইংরেজ ছাড়াও আর এক রকমের ইংরেজ আছে, যারা সাধারণের বিপরীত অর্থাৎ অসাধারণ। এরা যে সংখ্যায় খুব বেশী তা নয়, তবু দেশের ভাগ্য নির্ধারণে, রাজ্য পরিচালনায়. সংস্কৃতির সেবায়, শিক্ষার আদর্শ রক্ষায় এবং বুদ্ধির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহে এদের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। দেশ এবং জীবনের সমস্যার দিকে এরা চোখ মেলে দেখে রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগী দিয়ে। এরা যে ইংরেজ সে অহমিকা বোধ এদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও ছেড়ে যায় না। এরা মিথ্যা কথা বলে না। তাই ব'লে সত্য কথাও বলে না। যা বলে তার বিবিধ ব্যাখ্যা হয় আর অন্যলোকে যাকে বলে মিথ্যা, এ ইংরেজরা তাকে বলে 'ডিপ্লোমেসী'। চোখে-মুখে এদের দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাষা দেখা যায়। ব্যবহারে নমনীয়তা এবং কোমলতা থাকলেও তা সহজবোধ্য নয়। এদের ব্যবহার নিতান্ত ফর্মাল। এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলেও তা যেন সহজে গাঢ় হ'তে চায় না। অন্যের আচরণে কোন্‌টি কখন যে এদের কাছে রূঢ় হয়ে দাঁড়ায়, তাও বলা মুস্কিল। এদের ব্যবহারের উপরের এ আবরণ ভেদ ক'রে হৃদয় জয় করা রীতিমত সময়সাপেক্ষ এবং আয়াসসাধ্য ব্যাপার। এরা কারুর প্রতি বিরক্ত হ'লে আমাদের মতো ক্রোধে ফেটে পড়ে না। সম্পূর্ণভাবে মন না খুলে আভাসে-ইঙ্গিতে তা প্রকাশ করে। এসব ইংরেজ স্বদেশে তো এক রকম থাকে, কিন্তু রাজ্যশাসন করতে বিদেশে

বেরোলো তাদের অভ্যাস ও আচরণ সবই বদলে যায়। সুয়েজের এপার পর্যন্ত তারা দেশী আচরণই বজায় রাখে, কিন্তু সুয়েজ পার হলেই তারা যেন খোলস ছেড়ে নতুন ক'রে উগ্র হ'তে থাকে।

বিশ্‌র বলে আমার এক মিশরীয় সহপাঠী বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। ভদ্রঘরের একটি ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে তার প্রণয় হয়। প্রায় বছরখানিক ধ'রে কোর্টশিপ চলার পর তাদের প্রণয় যখন গাঢ় হয়ে উঠলো, তখন পরিণয়ের প্রস্তাব এলো মেয়েটির দিক থেকেই। বিশ্‌র তার মা-বাবাকে লিখে পাঠায়। বিদেশীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে তার মা-বাবা রাজী হন না। এতে মেয়েটি ক্ষুব্ধ হয়ে বিশ্‌রকে বলে,'আমি বিদেশী না তুমি ?' বিশর উত্তর দেয়, 'ইলণ্ডে অবশ্য আমি, কিন্তু মিশ্‌রে—?'

'সেখানেও আমি ইংরেজ, আমি বিদেশী নই'—মেয়েটি উত্তর দেয়।

বিশ্‌রের বন্ধু ব'লে আমিও এ মেয়েটিকে জানতাম। ইনষ্টিটিউট অব্ এড়ুকেশনে সে এম.এ. পড়তো। মেয়েটি একে ভদ্রঘরের তাতে শিক্ষিতা। আঘাত খেয়ে এভাবে সে গোখরো সাপের মত ফণা তুলে ধরেছে, তবু সত্যকে স্বীকার করতে চায়নি।

আঠারো

পোশাকের ভেতর দিয়ে এক এক জাতির জাতীয়তা ফুটে বেরোয়। পোশাকের ব্যাপারে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আঞ্চলিক কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও এরা মোটামুটি আন্তর্জাতিক। পুরুষের সুট আর নারীর স্কার্ট আর ব্লাউজই হলো এদের প্রচলিত পোশাক। সুট যে সব সময়ই পুরোপুরি হয় তা নয়। ওয়েষ্ট লণ্ডনে রাসেল স্কোয়ার, টরিংটন স্কোয়ার, বৃটিশ মিউজিয়াম প্রভৃতি স্থানের কয়েক বর্গ মাইল নিয়ে একটা 'ব্লুমসবেরী' অঞ্চল গ'ড়ে উঠেছে। ভৌগোলিক সীমারেখা কিংবা ডাক বিলির শাসন বিধানের জন্য লণ্ডনের যে আঞ্চলিক বিভাগ আছে, সে বিভাগ মতে 'ব্লুমসবেরির' সন্ধান পাওয়া যাবে না। তথাকথিত এক অদ্ভুত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের খেয়ালের সৃষ্টি ঐ অঞ্চলটি। বহুকাল থেকে এ নামেই পরিচিত। আর এ অঞ্চলের বুদ্ধিজীবীদের সে বিশেষ শ্রেণীটা পরিচিত Bloomsbury Intellectual. সংক্ষেপে B.I নামে। পোশাক পরিচ্ছদে এরা কিম্ভুতকিমাকার। প্যান্ট এক রং এর তো জ্যাকেট অন্য রং এর। জুতো এক রং এর তো টাইএর রং ভিন্ন। সাধারণ ইংরেজের চুলের যে পরিচর্যা দেখা যায় এদের তা থাকে না। চুল হয়তো ক'দিন ধরে ঠিকমতো ব্রাস করা বা আঁচড়ানোই হয়নি। দাড়ি হয়তো প্রতি তিনদিন অন্তর কি সপ্তাহে দুবার শেভ করা হচ্ছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে ভিন্ন রং আর ততোধিক ভিন্ন মাপের ট্রাউজার, জ্যাকেট আর টাই ইত্যাদি পরে B.I-রা পথে বেরোন। পোশাক পরিচ্ছেদে, এ রকম অদ্ভুত প্রকৃতির জীব ইংলণ্ডের অঞ্চলবিশেষে কিছু কিছু পাওয়া যায়। নইলে পুরুষের পোশাকে সর্বত্রই একটা সমতা রয়েছে।

পোশাকের ব্যাপারে ইংরেজদের সংস্কার (কুসংস্কারও বলতে পারি) কম নয়। স্লিপিং সুট প'রে শোবার ঘরের বাইরে বেরোনো যাবে না। ঘরের বাইরে পা রাখতে গেলেই

ড্রেসিং গাউন গায়ে ফেলে বেরোনোর রীতি। ঘরেও স্লিপিং সুট পরিহিত অবস্থায় থাকলে স্ত্রী কি বিবাহ সম্পর্ক অচল এমন নারী ছাড়া অন্য নারীর আনাগোনা রীতি-বহির্ভূত। মনে পড়ছে বেকার স্ট্রীট ষ্টেশনের নিকটবর্তী একটি বোর্ডিং হাউস–২৯নং নাটিংহাম প্লেসের কথা। এক স্কচ ল্যাণ্ডলর্ড আর আইরিশ ল্যাণ্ডলেডি দু'জনে মিলে এটি চালান। উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক রহস্যাচ্ছন্ন। বিদেশী এবং এদেশেরও অনেক নরনারী পেইংগেষ্ট হিসেবে এখানে থাকে। একদিন আমাদেরই এক দেশী বন্ধু তার ঘরে দেশী ভাত তরকারী রান্না ক'রে খাচ্ছে। দূর সম্পর্কের এক চাচাত বোন তার অতিথি। ভালো কাপড় চোপড় নষ্ট হবে ভেবে বেচারী সুট পরে নি। তার কামরা বন্ধ ক'রে বোনের সঙ্গে মিলে সে পাকসাক করছে স্লিপিং-সুট অর ড্রেসিং গাউন প'রে। বিড়াল খুঁজবার ভান ক'রে ল্যাণ্ডলর্ড তার দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকেই চেঁচিয়ে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে তুললো। সে যে নিয়ম ভেঙ্গে শোবার ঘরে পাক ক'রে খাচ্ছে তার জন্য নয় ; সে আছে স্লিপিং সুট পরে। এ অবস্থায় তার কামরায় দিনে-দুপুরে এক তরুণী। এ দেখে তার পিলে চমকে গেছে। সে তো একেবারে পুলিশ ডাকতে উদ্যত। আমরা তাড়াহুড়া ক'রে ছুটে গিয়ে তাকে বুঝিয়ে বললাম আমাদের দেশের রীতির কথা। কিন্তু কে কার কথা শোনে! শেষ পর্যন্ত আমাদের বন্ধুকে দিন কয়েকের মধ্যেই এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হলো।

অদ্ভূত এদের সংস্কার। ড্রেসিং গাউন প'রে খাবার টেবিলে আসা যাবে না, এমন কি ড্রইংরুমেও না। জ্যাকেট দিয়ে ঢাকা না থাকলে ট্রাউজারের ওপরের ব্রেসেস্ কি গ্যালিস প'রে কোনো ভদ্রমহিলার সামনে বেরোনো যাবে না। সী বীচে গিয়ে পরিচিত অপরিচিত নরনারী অর্ধনগ্ন অবস্থায় একই সঙ্গে রোদ পোয়াচ্ছে, সমুদ্র-স্নান করছে। তাতে আপত্তি নেই কিন্তু ড্রইংরুমে স্নানের পোশাক প'রে কোন ভদ্রমহিলার সামনে কোনো পুরুষ যদি হঠাৎ এসে পড়ে, তাহলে তখনই সে মূর্ছা যাবে।

পুরুষের বেলায় পোশাক সম্বন্ধে যে বিধান বা শাসনই থাক না কেনো, মহিলাদের বেলায় তার সাত খুন মাফ। প্রাকৃতিক নির্বাচনের রীতি অনুসারে টিকে থাকার জন্যে, অথবা পুরুষের চিত্ত জয় ক'রে সিংহীর মতো তার বুকে বিরাজ করার জন্যে এরা যেন একে অন্যের সঙ্গে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ইংলণ্ড তথা ইউরোপের পুরুষ প্রকৃতির নির্মমতা থেকে বাঁচবার জন্যে পোশাকের আবরণে নিজেকে করলো গোপন, আর প্রকৃতি ধর্মী নারী তার চোখ জুড়োতে, তাকে মাতিয়ে আর তাতিয়ে তুলতে ভাঁজে ভাঁজে নিজেকে আল্‌গা ক'রে তার মুঠি মুঠি ঐশ্বর্য ছড়িয়ে দিয়ে গেলো।

উনিশ

যদি ইটালীকেই আধুনিক চিত্রশিল্পের লালন ক্ষেত্র ব'লে ধরা হয়, তাহলে অনুকৃত শিল্পের তথা মনোকল্পিত সৃষ্টির সূতিকাগার ধরতে হয় গ্রীসকে। প্রাচীন গ্রীকরা ছিল পেগান অর্থাৎ দেহাত্মবাদী। দেহ পূজা থেকে যেমন বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হলো, পৃথিবী আবাদ হলো, তেমনি মানুষের মনে তার কাম্য ও পূজ্য মানুষকে সুন্দর ক'রে তোলবার জন্য ধীরে ধীরে

জন্য নিল সুন্দরের চর্চা ও সাধনা। দেহকে উপেক্ষা করে নয় বরং সে দেহকেই স্বতন্ত্র মহিমায় ভূষিত করার জন্য, দেহকে পূজার দেবী ক'রে তোলবার জন্য দেহের অধিকারীর মন জয় করার সাধনা চললো যুগ যুগ ধ'রে। বিধাতার সৃষ্টি নরনারী এবং নগ্ন প্রকৃতিকে মানুষ সাজালো তার চিত্তের রং, রূপ, রস ও রেখা দিয়ে। সুন্দর ক'রে প্রতিমা গড়লো প্রিয়জনের। আর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তার প্রিয়জনকে করলো চিত্রে রূপায়িত। কাব্যে সংগীতে সাহিত্যে তার আত্মার আকাঙক্ষা এবং চিত্তের ভাব ও ভাবনাকে শব্দ সম্বলিত করে সুন্দর করে দিয়ে গেল। চিত্তের এ সাধানায় শিল্প সাধক ইউরোপ যে সার্থকতা লাভ করেছে, তা বুঝি এর শিল্পীদের সৃষ্টি -বৈচিত্র্য দেখে আর তাদের জনপ্রিয়তা দেখে।

ইংলণ্ডে এসে অবধি এখানকার জীবনধারার এক একটি দিকের সঙ্গে যতই না পরিচিত হচ্ছি, ততোই নতুন চিন্তাভাবনার পথ মুক্ত হচ্ছে। ইউরোপের অন্যান্য শিল্পের তুলনায় চিত্র শিল্পের সমাদর বোধ হয় বেশী। ইটালী, হল্যাণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের চিত্রশিল্পের বিশেষ সমারোহ দেখা যায়। এর মধ্যে চিত্রশিল্পের দিক থেকে ইটালীর আধিপত্য বেশী। র‍্যাফায়েল, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি প্রমুখ বিশ্ব-বিশ্রুত শিল্পীরা ইটালীর সন্তান। বিশ্বের সাধারণ মানুষও এঁদের নামের সঙ্গে যতটা পরিচিত ততটা আর কারুর সঙ্গে নয়। ইউরোপের দেশগুলোর এক এক নগরীকে কেন্দ্র ক'রে এক এক সময়ে চিত্রশিল্পের এক একটি ধারার সূচনা হয়েছে আর তার প্রভাব পড়েছে অন্যান্য দেশগুলোতে। শুধু ইউরোপের কথাই বা বলি কেন, ললিত কলার পূজারী বিশ্বের অন্যান্য জাতিগুলোও ইউরোপের নগর বিশেষের শিল্প-ধারায় কম প্রভাবান্বিত হয়নি। ফ্লোরেন্স, পিজা, ভেনিস, রোম প্রভৃতি নগরীতে প্রাথমিক রেনেসাঁস যুগের শিল্পকলার বিশেষ চর্চা হয়। ললিতকলার অনুসারী অন্যান্য জাতিগুলো এতে যেমন মুগ্ধ হয়েছে, তেমন সাধনার পথে এগিয়ে যেতে প্রেরণাও কম পায়নি।

ইংরেজরা দেশী বিদেশী ছোট বড়ো সকল শিল্পীর শিল্প-সাধনাকে জনপ্রিয় করবার জন্য যে প্রয়াস পেয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের শিল্পাগারগুলো পরিদর্শন করলে। ন্যাশনাল গ্যালারী, রয়্যাল একাডেমী অব আর্টস গ্যালারী স্টেট গ্যালারী প্রভৃতি স্থায়ী শিল্পাগার তো লণ্ডনে রয়েছেই, তার ওপর খ্যাতনামা শিল্পীদের একটা না একটা শিল্প প্রদর্শনী আজ এখানে কাল সেখানে লেগেই আছে।

আমি শিল্পী নই কিংবা শিল্প-সমালোচকও নই। ললিতকলার একজন সাধারণ ভক্ত হিসাবে আমি এগুলো প্রচার করি। বিশ্ব বিশ্রুত এ শিল্পীদের অঙ্কিত ছবিগুলো দেখে যে কথাটা আমার প্রথম মনে পড়ে তা হচ্ছে সৃষ্টি সম্পর্কে স্রষ্টাদের সুস্পষ্ট ধারণা। প্রাকৃতিক দৃশ্য, পৌরাণিক গাল-গল্প ঐতিহাসিক ঘটনা এবং মানব-জীবনের বিশিষ্ট মুহূর্তগুলো এদের তুলির এবং মনের স্পর্শ পেয়ে নির্বিশেষে হয়ে উঠেছে বাস্তব। নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে এদের মনের সৃষ্টি যেভাবে রূপায়িত হয়েছে সেখানে পরিবর্তন নেই, কালস্রোতও নেই— সৃষ্টি ও স্রষ্টা একাকার হয়ে অমরতা লাভ করেছে। মুগ্ধ হচ্ছি এসব চিত্র-শিল্পের বৈশিষ্ট্য দেখে। শিল্পীমনের ভাবকল্পনা মনের রং তুলির আঁচড়ে এমন ব্যঞ্জনা পেয়েছে যে, এক একটি চিত্রের ভেতর দিয়ে অনির্বচনীয়তা উপচে পড়তে চাইছে। তা শিল্পীর প্রতি দর্শকের

মনকে একদিকে যেমন শ্রদ্ধায় ভ'রে তোলে, অন্যদিকে ছবিগুলোর ওপরের জৌলুস একটা বিস্ময়রসে তার চিত্তকে তেমনি চমৎকৃত ক'রে দেয়।

১৯৫২ সালের শেষের দিকে রয়্যাল একাডেমী অব আর্টস-এ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির পঞ্চশত বার্ষিকী স্মরণোৎসব উপলক্ষে তাঁর শিল্পকৃতির একটি প্রদর্শনী হচ্ছিল। এখানে তাঁর আঁকা নরনারী জীবজানোয়ার এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির কিছু স্কেচ দেখার সুযোগ পেলাম। মানব এবং জীবদেহ সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান, তাদের আবয়বিক পরিমিতি এবং স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য এসব ড্রইং-এর ভেতর দিয়ে যে কিভাবে ফুটে উঠেছে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

শুধু লণ্ডনই নয়, ফ্লোরেন্স রোম ভার্সাই পারী প্রভৃতি ইউরোপের নামকরা শহরগুলোর সর্বত্রই চিত্রশিল্পের সমাদর দেখা যায়। সৃষ্টি সার্থকতা স্রষ্টার নিজের মনে। কিন্তু সে সৃষ্টির যদি কদর না হয় যদি তার সমঝদার খুঁজে না পাওয়া যায়, দেশ বিদেশের লোকে যদি তার সৃষ্টির রস ও গুণ গ্রহণ না করে, তাহলে সৃষ্টি হয় ব্যর্থ, স্রষ্টার হয় অপমৃত্যু। ইউরোপে চিত্রশিল্পের যথারীতি সমাদর হয় বলেই এ শিল্পও স্বাভাবিকভাবেই স্বতংস্ফূর্ত হয়ে পড়েছে। বড় লোকেরা করেছে এর পৃষ্ঠপোষকতা আর সাধারণ মানুষ করেছে এর গুণ গ্রহণ। বিশেষ বিশেষ চিত্রশিল্প প্রদর্শনীতেই যে শুধু সাধারণ মানুষ প্রতিদিন ভীড় করছে তা নয়, স্থায়ী চিত্র গ্যালারীগুলোতেই দেখছি সাধারণ নরনারীর নিত্য আনাগোনা এরাই এদের শিল্পের সমঝদার, গুণগ্রাহী আর রসবেত্তা। সকল মানুষের চিত্ত জয় করতে পেরেছে বলেই ইউরোপে রাস্তার পেভমেন্ট থেকে ঘরের দেয়াল আর ছাদের নীচের তলায় চিত্রশিল্প এমনি ক'রে ছড়িয়ে গেছে।

এর তুলনায় আমরা কোথায় ? আমাদের দেশের সেরা শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনীতেই বা ক'জন লোক আসে ? ক'জন বা তাদের সমঝদার ? দু'চারজন এলেও ক'জন তাদের চিত্র পয়সা দিয়ে কেনে। নিজের ঘরে টাঙিয়ে রেখে চিত্তের পরিচর্যা করে ? রুচির পরিচয় দেয় ? শিল্পীর মন থেকে সৃষ্টি স্বতঃউৎসারিত হয়ে দেশের সাধারণ মানুষের মনে বাসা না বাঁধতে পারলে শিল্প কোথা থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করবে। কি করে বাঁচবে ?

ইংলণ্ডের সাধরণ মানুষ শুধু চিত্র শিল্পেরই সমঝদার আর ভক্ত ? তাতো নয়। অপেরা, রেভ্যূ সিনেমা, থিয়েটার, ব্যালে, প্যান্টোমাইম প্রভৃতি অবসর-বিনোদন ও চিত্তরঞ্জনের যে প্রভূত আয়োজন দেখি, তাতে এক রকম সব মানুষই ভেঙে পড়ে। কিন্তু কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত, বিশেষ ক'রে দ্বিতীয়টি সাধারণ মানুষেরও যে এত প্রিয় হ'তে পারে, তা এ দেশে না এলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। এলবার্ট হলে কি রয়্যাল ফেষ্টিভ্যাল হল-এ কোনো অর্কেষ্ট্রা থাকলে অগ্রিম টিকিট না করলে সিট পাওয়াই মুস্কিল। অনেক সময় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। বেটোফেন কি মোজার্ট এর Symphony যে কি আকর্ষণীয় তা কি করে বোঝাবো ? কবিরা বলেন, 'From harmony to heavenly harmony this Universal frame began': আমার মনে হয় এ কথার মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহলে তার উল্টোটাও অর্থাৎ 'From harmony to harmony this world will come to its end' এ কথাও সত্য হ'তে বাধ্য। তার কারণ এ Symphony গুলোতে

সুরের যে ইন্দ্রজাল রচনা করা হয়েছে আর এর আরোহ ও অবরোহে যে শক্তি নিহিত আছে, তাই মানুষকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার আর তার মন হরণ করবার জন্য যথেষ্ট। সুর যখন চড়াই-এ উঠে, তখন ধাপে ধাপে শ্রোতার মনও শূন্য হ'তে মহাশূন্যে উঠে যায়। আর সুর যখন নীচে নামতে নামতে সূক্ষ্মতর হ'তে হ'তে কাঁপতে কাঁপতে একেবারে বিলীয়মান হয়ে আসে, তখন মনে হয় যেন সমস্ত চেতনা স্তব্ধ হয়ে আসছে। 'সমগ্র শ্রুতিকে আচ্ছন্ন ক'রে কি আশ্চর্য সংগীত আর নিঃশব্দতার ঐক্যজাল, তার পেছনে কি কঠিন সৃষ্টি কৌশল এবং আত্মবিলীনতার শক্তি।'

বিশ

আমাদের দেশে বারো মাসে তেরো পার্বন লেগেই আছে। আজ মুসলমানদের ঈদ, কাল মোহররম, পরশু নবী-দিবস, তার পরের দিন শবেবরাত, শবে কদর। আর হিন্দুর দোল, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা। বৌদ্ধদের বৈশাখী পূর্ণিমা। ব্রাহ্মদের মাঘোৎসব। এর যেন আর বিরাম নেই। আবার খৃষ্টানদের যে কিছু নেই তা নয়। তাদের গুডফ্রাইডে, ইষ্টার মনডে, কৃসমাস এ সব আছে। বছরের ক্যালেণ্ডার ধ'রে এ সবের জন্য নির্দিষ্ট দিনে স্কুল-কলেজ আমাদের বন্ধ রাখতে হয়। এর ওপরে প্রকৃতির বিধান অনুসারে এতোদিন আমরা গ্রীষ্ম ও হৈমন্তিক অবকাশ ভোগ কম্বরে এসেছি। এখন আবার শুধু বিধানই নয়, তার শাসন চলছে আমাদের ওপরে। যার জন্য এতোকাল প্রকৃতিকে খেয়ালী বলা হয়েছে, তার সে খেয়াল এখন নিত্য নিয়মে পরিণত হলো। আজ বন্যা, কাল ঝড়-এও যেন নিয়মিত হয়ে এলো। ঘাড়ে যখন এগুলো চেপে পড়ে তখন এরও জন্যে স্বতন্ত্র অবকাশ নিতে হয়। এ ছাড়া আছে আজ অমুক মারা গেছেন দাও ছুটি। কাল কোন নেতা মারা গেছেন, দাও ছুটি। পরশু দিন দেশের কোন নাম করা লোক মারা গেছেন– সাহিত্যিক, দার্শনিক কি অন্য কেউ, অমনি দাও ছুটি। কোন মাননীয় ব্যক্তি স্কুল-কলেজ পরিদর্শন করতে এসেছেন, দাও ছুটি। বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খেলাধূলায় কোন ট্রফি জিতেছে, ছাত্রেরা শতকরা হার ভালো রেখে পরীক্ষা পাশ করেছে, কোন ছাত্র বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নাম করে পাশ করেছে, তাতেও ছুটি চাই– অন্ততঃ সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি।

এর ওপরে আছে ছেলেদের প্রয়োজন ও ইচ্ছে মতো ছুটি ঘোষণা করার অধিকার। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব। তাদের দাবী না মানলে তারা ধর্মঘট করবে। ক্লাশে আসবে না, পড়াশোনা শিকেয় তোলা রইলো। এ ছাড়াও আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন দেখি আমাদের ছাত্রদের মধ্যে। ধরুন আমাদের আড্ডা দেওয়ার অভ্যাসের কথা। পড়ার সময় হোক কি খেলার সময় হোক, অকাজে হোক কি কাজ ভুলে হোক, পরিচিত হোক কি স্বল্প-পরিচিত হোক, দু'জন আমরা এক জায়গাতে হলেই এঁড়ে তর্কে হাট লাগাই। চেঁচিয়ে একাকার করি। সময় অসময় জ্ঞান নেই, কাজ ক্ষতি ক'রে পড়াশোনা ক্ষতি ক'রে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাই। তারপর পরীক্ষার সময় রাত জেগে দিনরাত্রি খেটে স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করি,

সঙ্গে সঙ্গে নিজের লেখাপড়ারও। অবস্থা দাঁড়াল—হয় লেখাপড়াই ছাড়ি না হয় লেখাপড়াই আমাদের ছেড়ে যায়। এ অবস্থায় আমাদের দেশের ছাত্রেরা যে কতটুকু পড়াশোনা করে আর কি ক'রে যে তাদের ছাত্রধর্ম তারা পালন করে, আমি তাই ভেবে বিস্মিত হ'য়ে যাই। আরও বিস্মিত হই যে এর ভিতর দিয়েও যথার্থ মানুষ হোক বা না হোক লেখাপড়া করুক বা না করুক, পরীক্ষা পাশ ক'রে কিছু কিছু ছেলে বেরুচ্ছে।

এখানে এসে দেখি মানুষের অভ্যাসের মধ্যে সর্বত্রই একটা শৃঙ্খলা। এরাও আমোদ-প্রমোদ করে। এরাও হাসে-খেলে। এরাও আড্ডা দেয় (ছাত্রদের অবশ্য ধর্মঘট করতে দেখিনি, রাজনীতিতে বাস্তব অংশ গ্রহণ করতে তো নয়ই—হয়তো এদের প্রয়োজন হয় না বলেই) কিন্তু সবই যেন সময় ধ'রে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে। কোথাও যেন অনিশ্চিয়তা নেই। এক একটা প্রতিষ্ঠান থেকেই যেন মনে হচ্ছে সমগ্র জাতীয় জীবনটা ঘড়ির কাঁটা ধ'রে যখনকার যেটা ঠিক সেই মতে এগিয়ে চলেছে।

এদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা শিক্ষা বৎসরে তিনটে টার্ম। অক্টোবর থেকেই সাধারণতঃ শিক্ষা বৎসর শুরু। অক্টোবর থেকে বড়ো দিনের বন্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম টার্ম। জানুয়ারীর প্রথম কি দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু করে মার্চের শেষ কি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দ্বিতীয় টার্ম। মাঝখানে হপ্তা দুয়েকের অবকাশ। আর তৃতীয় বা শেষ টার্ম এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুন পর্যন্ত। এরপরে জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বর–দীর্ঘ তিন মস ধ'রে গ্রীষ্মের বন্ধ। টার্ম চলতে থাকাকালীন আর কোনো ছুটি নেই। একটি দিনের জন্যও নয়। ধর্মের জন্যও নয়, কোনো গৌরবজনক কর্মের জন্যও নয়। এমন কি কারুর মৃত্যুর জন্যও নয়। বার্নার্ডশ মারা গেলেন, খবরে কাগজগুলোতে বড়ো বড়ো ক'রে হেড্ লাইন বেরোলে, 'A genious passes away'– ব্যাস এ পর্যন্তই। সাহিত্যের ছাত্রেরা তাদের স্বতন্ত্র ক্লাব বা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাঁর জন্যে শোকসভা করলো। তাঁর সাহিত্য ও সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করলো ; তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁর বাসগৃহ এক স্থায়ী জাতীয় পরিদর্শনীতে পরিণত হলো। কিন্তু স্কুল-কলেজের ছুটিছাটা সে কোথায় ? অথচ খবর পেলাম আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ও বার্নার্ড শ'র প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য বন্ধ দেওয়া হয়েছিল। একটি ইংরেজ ছেলের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বললাম। আমাদের দেশে এ জন্যে স্কুল কলেজ বন্ধ দেওয়া হয়েছে শুনে সে তো অবাক। আমি বললাম, 'দেখ, আমরা কি রকম উদার । অপর দেশের মনীষীর প্রতিও আমরা কি রকম শ্রদ্ধাশীল। সে বললে, ' তোমরা অলস বলেই একটা লোকের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাও কাজ পালানোর অবসর খুঁজ। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাই তাঁর কথা মতো কাজ ক'রে। একটি দিনের জন্যেও কাজ বন্ধ ক'রে নয়।'

কিছুদিন যেতে না যেতে রাজা ষষ্ঠ জর্জও মারা গেলেন। এক সকালে জেগে উঠে দেখলাম, যে কাগজই খুলি সে কাগজেই প্রথম পৃষ্ঠায় বড়ো বড়ো ব্যানারে হেড লাইন দিয়ে লেখা, 'The king is dead.' ভাবলাম স্কুল-কলেজ থেকে আপিস-আদালত আজ বুঝি সব বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় ? কোথাও কিছু হয়েছে ব'লে তো মনে হলো না। স্কুল-কলেজ যেমন চলছিল ঠিক তেমনি চলতে লাগলো। ক্লাশে বক্তৃতা তেমনি হলো। ছাত্র-

ছাত্রীরা ক্লাশ করলো। রিফেক্টরীতে (খাবার ঘর) গেলো। সময় মতো কমনরুমে আলাপ-আলোচনা করলো। চা খেলো। আবার যে যার পড়া শুনা করতে লাইব্রেরীতে ঢুকলো! এদের কাছে ব্যক্তি নয়, জাতিই যে বড়ো পদে পদে তার প্রমাণ পাচ্ছি। ব্যক্তি তার নিজের কাজ শেষ ক'রে পরপারে পাড়ি দিলো। জাতিকে এখন এগিয়ে যেতে হবে। অবসর রচনা ক'রে কারো স্মৃতিভার বুকে পুষে, এমনকি একদিনের জন্যে ব'সে থাকতে গেলেও জাতীয় জীবনের শক্তি ও সাধনার যে কী অপচয় হয়, তার হিসেব করলে শুধু তাদের কেন, আমাদেরও চোখ স্থির হয়ে আসবে। কৃষি প্রধান দেশ আমাদের। হিউমিডিটি ভরা আবহাওয়ায় ব'সে ব'সে আমরা ঝিমুতে ভালবাসি। বাণিজ্যিক লাভ ক্ষতির হিসেব ক'রে জীবনকে যাচাই ক'রে দেখি না। সে দৃষ্টিভংগী থেকে জীবনকে গড়েও তুলি না।

'টার্ম টাইমে' কোনো ছোট-খাটো ছুটি নেই ব'লে পড়ার সময়ে ছাত্রেরা যথারীতি পড়াশোনা করে। এ পড়াশোনার নাম জ্ঞান-সাধনা, শুধু পরীক্ষায় পাশের আয়োজন নয়। সকাল সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার ভেতর প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে পেটপুরে নাস্তা ক'রে ছুটছে সব লাইব্রেরীর দিকে। আটটা থেকে দশটা দু'ঘন্টা লাইব্রেরীতে বেশ পড়াশোনা করা গেলো। তারপর ক্লাশ শুরু হলো। যে যার ক্লাশে গেলো। মাঝখানে একটার সময় লাঞ্চের জন্যে একটা বড়ো রকমের ব্রেক। আপন আপন স্কুলের রিফেক্টরীতে ছেলেমেয়েরা দলে দলে মিলেমিশে একই সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছে। খেতে খেতে গল্প করছে। খাওয়া শেষেও বন্ধু বন্ধুতে, বন্ধু ও বান্ধবীতে মিলে মিষ্টি আলাপ-প্রলাপে বেশ জিরিয়ে নিচ্ছে।

সে যাক। লাঞ্চের পর আবার চারটে পর্যন্ত যথারীতি পড়াশোনা। হয় ক্লাশ, না হয় লাইব্রেরী। তারপর সামান্য কিছুক্ষণের জন্য চায়ের ব্রেক। এ সময় চা খাওয়া উপলক্ষে কমনরুমে গিয়ে ছেলেমেয়েরা আড্ডা দিচ্ছে। গল্পগুজব করছে। করছে খেলাধূলা। তারপর আবার পড়াশোনা। এবার ক্লাশ ততটা নয় যতটা নিজেদের লাইব্রেরীতে পড়া। রাত্রি-আট-নয়টা পর্যন্ত লাইব্রেরী খোলা থাকে। পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা তার যথারীতি সদ্ব্যবহার করতে পারে। করবেই বা না কেন ? কোনো কোনো ব্যাধি যেমন সংক্রামক, তেমনি কোনো কোনো ভাল কাজের মধ্যেও সংক্রামক বীজ রয়েছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট লাইব্রেরীতে ঢুকলেই মনে হয় অনাদিকাল ধ'রে প্রবাহিত বিশ্বের যত জ্ঞান এখানে যেন বন্দী হয়ে আছে। আর সেখান থেকে জ্ঞানের নানা মণিমাণিক্য কুড়িয়ে তোলবার কাজে জ্ঞান সাধকেরা ব্যাপৃত রয়েছে। এ দেখে বাড়ীতে ফিরতে ইচ্ছে করে না, ইচ্ছে করে দুনিয়া ভুলে শুধু জ্ঞানের তপস্যা করতে।

একদিন গেলাম অক্সফোর্ড বেড়াতে। ইউনিভার্সিটি টাউন অক্সফোর্ড কলেজগুলোর দালান বাইরে থেকে ভারী কালো কালো ঠেকলো। ইংরেজ জাত যে ট্র্যাডিশন প্রিয় তার কমপক্ষে একটা পরিচয় পাওয়া যায় দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে এদের প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীটা দেখলে, আর অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে কলেজগুলোর দালানগুলো দেখলে। দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর চিহ্ন ধ'রে তারা ধীরে ধীরে রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ইংরেজরা এদের কালো রূপের তাই পরিবর্তন করে না, ভাঙলে চুরলেও না। মেরামত করতে হলেও রূপের কোন বদল করা হয় না। ফলে প্রাচীনতার ছাপ থাকে তেমনি অক্ষুণ্ন।

ইউনিভার্সিটির মিউজিয়াম, শেল্ডোনিয়ান থিয়েটার লাইব্রেরী, সেনেট, বড্‌লিন কলেজ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এখানকার ছাত্র-শিক্ষকদের হুড্‌ গাউন ইত্যাদি একাডেমিক পোশাক পম্বরে ক্লাশ করা বেশ আকর্ষণীয়। বাইরে বেরোলেও এখানকার ছাত্ররা সপরিচয়ে বেরোয়। তা দেখে চোখ জুড়োয়, মন প্রফুল্ল হয়।

এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রণালী আর আনন্দোপভোগের উৎস দেখলাম! মিষ্টি সবুজ ঘাস। বড়ো মিষ্টি রোদ। ভেজা ভাবের কোথায়ও কোনো নাম গন্ধ নেই। সব শুকনো। ছেলেমেয়েরা ঘাসের উপর পাশাপাশি শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। বছর বিশ বাইশের কতকগুলো ছেলেকে দেখছি তাদের সমবয়সী একটি মেয়ের পা রুমাল দিয়ে নিজের পায়ের সঙ্গে বেঁধে কয়েক দলে ভাগ হয়ে রেস খেলছে। কোন দল ফার্ষ্ট হচ্ছে। কোন দল আছাড় খাচ্ছে। একে অপরের গায়ে প'ড়ে লুটোপুটিও করছে। আর হাসির হররায় চারদিক যেন ফেটে পড়তে চাইছে। পাশে কৃত্রিম লেক। ছেলেমেয়েরা মিলে মিশে নৌকা বাইচ খেলছে। এরপর পানি ছিটাচ্ছে। এক দল সুযোগ বুঝে আড়াল খুঁজে অন্য দলের চোখ এড়াচ্ছে।

মাঝে মাঝে কেমব্রিজ আসি বেড়াতে। কেম্‌ব্রিজও ইউনিভার্সিটি টাউন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেও অনেক অনেক কলেজ। এক এক কলেজ এখানে অন্য কলেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে। কে কেতো মনীষী তৈরী করেছে তা নিয়ে। ক্রাইষ্ট কলেজের ছাত্র ছিলেন মিল্টন আর ডারউইন। ট্রিনিক কলেজই কেম্‌ব্রিজের সবচেয়ে বড়ো এবং বিখ্যাত। নিউটন, টেনিসন, বাইরন এবং পণ্ডিত নহেরু এ কলেজেরই ছাত্র। আর সেন্ট জনস কলেজের ছাত্র ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তারা যেখানে থাকতেন, সেখানে এঁদের নাম খোদাই করে দেয়া হয়েছে। কারুর ছবিও রাখা হয়েছে। এ মনীষীদের স্মৃতি এখানকার বর্তমান ছাত্রদের যথেষ্ট প্রেরণা দেয়, আর এ সব কলেজে পড়াশোনা করলে গর্বেও যেমন বুক ভ'রে উঠে, নিজেকে তৈরী করবার জন্য মনে মনে প্রস্তুতিও চলে তেমনি।

টার্মটাইমে সোম থেকে শুক্রের শেষ কি শনির অর্ধেক দিন পর্যন্ত নিয়ম শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে পড়ুয়াদের জীবন কাটে। সপ্তাহের বাকী দেড় দিন এদের নিজের। তখন এরা বিশ্রাম করছে নাচ গান করছে। আমোদ-প্রমোদ করছে। বেড়াতে বেরোচ্ছে। পার্কে না হয় বিচে না হয় বাইরে কাউন্টিগুলোর দিকে কোথাও। এ ছাড়া আছে টার্ম শেষের বল নাচ আর নানা রকমের সামাজিকতা।

একুশ

পড়াশুনার অভ্যাস কিংবা অনভ্যাসের সাহায্যে পরিচয় পাওয়া যায় একটা মানুষ কিংবা একটা জাতির মন এবং বুদ্ধিবৃত্তির। কেউ যদি কোন কিছু পড়াশুনা করে এবং কিছু জানার আগ্রহও তার না থাকে তাহলে মানুষ হলেও তাকে কোন পর্যায়ের মানুষ বলবো ? আর পড়াশুনা করলে যে যা পড়ে বা যে ধরনের খবরাখবর রাখে, তার দ্বারা তার মনের

কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায়। তার ভবিষ্যৎ মানসের উন্নতি বিধানের পথও তার সাহায্যে গ'ড়ে উঠে।

এখানকার ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের কথা বলছি না, কারণ পড়াই তাদের ধর্ম। কিন্তু জীবন ধারণের যে কোন পথই এরা বেছে নিক না কেন, এখানকার সাধারণ নরনারীরও পড়াশুনার প্রতি বেশ ঝোঁক আছে। একুশ বছরের ওপরে যাদের বয়স, তাদের মধ্যে একেবারে অক্ষরজ্ঞান-বর্জিত লোক সারা গ্রেটব্রিটেনে শতকরা দু'জনের বেশী নেই। এদের সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমে আসছে। আর একুশ বছরের নীচে যারা ; তারা তো এ হাল আমলের মানুষ। কমপক্ষে লিখতে ও পড়তে শেখা এদের কর্তব্য।

এদেশের লোক অবসর সময় কাটানোর জন্যে যে পড়তে ভালোবাসে তার নজীর তো দেখছি প্রতি পদে পদে। টিউবে, বাসে, ট্রেনে তাদের দেখছি নেহাত সামনের স্টপে নামবার আতঙ্ক না পেয়ে বসলে, হয় খবরের কাগজটা না হয় রুচি অনুসারে একটা না একটা বই খুলে পড়তে শুরু করেছে। যেটা পড়ছে সেটা বই কি খবরের কাগজ যাই হোক না কেন, অন্ততঃ সে মুহূর্তের জন্যে তার নিজেরই। আমাদের দেশের মতো তার সহযাত্রী কি যাত্রিনীর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া নয়।

ইংলণ্ডে ছোট বড়ো ভেদে দৈনিক, সান্ধ্য ও রবিবারের কাগজগুলো নিয়ে প্রায় শ দেড়েক খবরের কাগজ আছে। এদের মধ্যে অবশ্য গুটিকতক খুব বেশী চলে। এগুলো হচ্ছে জাতীয় দৈনিক কাগজ, রবিবারের প্রধান প্রধান কাগজ আর ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের মতো কয়েকটি বিখ্যাত আঞ্চলিক কাগজ।

রবিবারের কাগজগুলোর মধ্যে News of the worldই সব চেয়ে জনপ্রিয় এবং তার চাহিদাও সে অনুপাতে খুব বেশী। প্রাপ্ত-বয়স্কদের মধ্যে প্রায় দু'কোটি লোক এ কাগজ প'ড়ে থাকে। ইংলণ্ডের প্রায় পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে এক রকম অর্ধেক লোকেরই চাহিদা মেটায় এ কাগজটি। পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই আবার এ কাগজটি বেশী ক'রে পড়ে। এতে খেলাধূলার সংবাদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা কিছু কিছু থাকে, কমপক্ষে দু'জন নামজাদা লেখকের দু'টো নামকরা লেখা থাকে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী থাকে মুখরোচক সংবাদ।

News of the world-এর পরে রবিবারের কাগজগুলোর মধ্যে নাম করতে হয় People এবং Sunday Pictorial-এর। People-এর পাঠক সংখ্যা এক কোটি সাড়ে কুড়ি লাখের মতো আর Sunday Pictorial পড়ে থাকে প্রায় এক কোটি পনের লাখ লোক। এ ক'টা কাগজ অবশ্য খুব হালকা এবং সাধারণ মানুষের রুচির অনুগামী। মার্জিত রুচি বিশিষ্ট ও শিক্ষিত লোকদের কাছে এগুলোর আবেদন তেমন নয় যেমন Observer কিংবা Sunday Times-এর। অথচ এগুলোর পাঠকসংখ্যা আগেরগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবেই কম। Observer পড়ে প্রায় তের লাখ লোক, আর Sunday Times যারা পড়ে তাদের সংখ্যা ষোল লাখের বেশী নয়।

দৈনিক কাগজগুলোর মধ্যে Daily Express-এর পাঠক সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, প্রায় কোটি খানিক। Daily Mirror-এর চুরানব্বই লাখের মতো। Daily Mail-এর চুয়ান্ন

লাখ। Daliy Herald-এর একচল্লিশ লাখ। News Chronicle-এর পঁয়ত্রিশ লাখ। Daily Telegraph-এর সাতাশ লাখ। অথচ সবচেয়ে উন্নতমানের কাগজ যেটি সেই Time-এর পাঠক সংখ্যা সবচেয়ে কম—আনুমানিক সাত লাখের মতো।

Daily Express যে এতো প্রিয়, তার কারণ News of the World-এর মতোই এ দৈনিকটির মান নীচে। বড়ো হেড লাইন দিয়ে কাগজটি মুখরোচক এবং লোমহর্ষক সংবাদ ছাপে। মনে পড়ে, একদিন সকালে উঠে কাগজটি হাতে নিতেই চোখে পড়লো বড়ো করে হেড লাইন দিয়ে ছাপা For them he lived. for them he died. নীচে চোখ বুলোতেই দেখি বস্তী অঞ্চলের একটি ঘরে আগুন লাগে। সে বেড়ে আগুনে তার স্ত্রী ও পাঁচ ছেলে-মেয়ে একই সঙ্গে মারা যায়, আর সেও প্রাণপণ চেষ্টায় তাদের উদ্ধার করতে গিয়ে মারা পড়ে। এ ধরনের সহজে পড়া যায় আর সহজেই ভোলা যায় এমন সব সংবাদ এ কাগজটিতে ছাপা হয় বলেই এ কাগজটি জনপ্রিয়।

সান্ধ্য কাগজগুলোর অধিকাংশ আরও মুখরোচক এবং আরও মজার। পথের ক্লান্তি এবং নিঃসঙ্গতা যাতে দূর হয় এবং কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ বাইরের জগৎ ভুলে ওর মধ্যে মনটাকে একটু সহজভাবেই ধ'রে রাখা যায়, এমন খবর ছাপে এ কাগজগুলো। কুকুরের রেস, ঘোড়ার রেস, ফুটবল পুল, অন্যান্য জুয়োখেলার ফলাফল, নারীঘটিত খবর, সিনেমা, থিয়েটার, ব্যালে, প্যানটোমাইম, কনসার্ট ইত্যাদির খবর এ সব কাগজের মূল অবলম্বন। কিছুটা প্রয়োজন আর অনেকটাই কিছু একটাতে ক্ষণিকের জন্যে মন আর চোখ দুটোকে আটকে রাখার ব্যবস্থার জন্যে অধিকাংশ সান্ধ্য কাগজই বেশ কাজে লাগে। মনে আছে, পাকিস্তানের কোন এক প্রধান মন্ত্রী আমেরিকার পথে সস্ত্রীক লণ্ডনে অবস্থান করছেন। তাঁর স্ত্রী কোন এক নারী-মজলিসে কি একটা প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'আমি ঠিক মনে করে বলতে পারছি নে, আমার কতোটা চাকর-চাকরানী আছে।' তারপর তিনি গুণ্‌বার ভান করলেন, 'এক দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, শেষে বললেন, ' হবে বোধ হয় গোটা চল্লিশেক।' তারপর তিনি বললেন, 'তাকে কোনো কাজ করতে হয় না, তবে ফুলটুল তোলেন আর সাজান।' এ সংবাদ কয়েকটি সান্ধ্যকাগজে ফলাও ক'রে ছাপা হলো 'She has forty servants, still she does the flowers.'

সাময়িক কাগজগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় The Listener-এর। এটি সাপ্তাহিক কাগজ। বি.বি.সি. থেকে যে সব কথিকা প্রচার করা হয় তার সেরা কথিকাগুলো Listener-এ ছাপা হয়। মাত্র তিন পেনি দাম এ কাগজটির। বিষয়বস্তুর মূল্যমান বিচারে অবিশ্বাস্যভাবে সস্তা। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'রেইথ্ লেক্‌চার্স,' ফ্রেড হয়লির 'Nature of Universe' সম্পর্কে বক্তৃতা, অধ্যাপক লাসকি, অধ্যাপক হিত্তি প্রমুখ খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞের বক্তৃতা একবার শুনে তার মর্ম গ্রহণ করা সহজ নয়। Listener এমন সব বক্তৃতা ছেপে সস্তায় পরিবেশন করে দেখে বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান-সাধনা থেকে সাধারণ মানুষও বেশ উপকৃত হয়।

খবরের কাগজের পর বই পুস্তকের কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রতি বছর ইংলণ্ডে অন্তত হাজার পনের নতুন বই বেরোয়। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই লেখা হয়। প্রতি বছর যত বই

বেরোয়, তার সবগুলোই যে সমান বিক্রি হয় তা নয়, তবু বই কেনাবেচার হিসেব থেকে দেখা যায় যে, লাখে লাখে বই কাটছে। আবার যে পরিমাণ বই কেনা হয়, পড়া হয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশী পরিমাণে। তার কারণ, প্রত্যেক বছরে যতো বই বেরোচ্ছে, তার শতকরা আশি ভাগ বইই কিনছে পাবলিক লাইব্রেরীগুলো।

ইংলণ্ডের মতো পাবলিক লাইব্রেরী, সংখ্যা এবং সুব্যবস্থার দিক থেকে দুনিয়াতে খুব বেশী নেই। সুব্যবস্থার দিক থেকে দুনিয়াতে ইংলণ্ডের লাইব্রেরীগুলোর খ্যাতি আছে। গ্রেটব্রিটেন এবং উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের মাত্র হাজার বাষট্টি লোক এমন অঞ্চলে বাস করে যেখানে কিছুদিন আগে পর্যন্ত দেখা গেছে যে, তাদের জন্যে লাইব্রেরীর কোনো বন্দোবস্ত করা হয় নি। সমগ্র লোকসংখ্যার তুলনায় এ আর ক'জন ? এ হিসেব মতে দেখা যাবে শতকরা একজনের আটভাগের এক ভাগ লোকের জন্যই লাইব্রেরীর ব্যবস্থা নেই। সমগ্র জনসংখ্যার বাকী স্ত্রীপুরুষ, ছেলেবুড়ো নির্বিশেষে সকলেরই জন্যে লাইব্রেরীর ব্যবস্থা আছে এবং প্রত্যেক মহল্লায় বই নেওয়া দেওয়া এবং পড়ারও আশাতীত সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। ফলে পড়ার এমন সুযোগ থাকার জন্যে পড়ার ইচ্ছে না থাকলেও সব শ্রেণীর নরনারীই আপন রুচি অনুসারে বই পড়ে। তাতে তাদের মন প্রফুল্ল থাকে, আর সাংস্কৃতিক জীবনের মানও উঁচু হয়ে উঠে। সাধারণ মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে। ট্যাক্স দিতে তাদের কষ্ট হলেও তার প্রতিদানে তারা যা পায়, ট্যাক্সের তুলনায় নানাদিক থেকে তার মূল্য অনেক বেশী। 'ট্যাক্স পেয়ার'দের ট্যাক্স থেকেই অন্যান্য জিনিসের মতো তাদের সাংস্কৃতিক এবং মনোজীবনের মান উন্নত করবার জন্যে সরকার এ ধরনের লাইব্রেরী করে দিয়েছে। ব্যক্তি বিশেষ বই কিনছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী পরিমাণে বই কিনছে এ লাইব্রেরীগুলো। ফলে নানা বিষয়ে প্রতি বছর হাজার হাজার বই বেরোচ্ছে। লেখকদের বুদ্ধিবৃত্তি খুলছে। লেখাটাকে পেশা হিসেবে তারা গ্রহণ করতে পারছে। সে পেশায় মানোন্নয়ন করার জন্য তাদের মনপ্রাণ তারা ঢেলে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে শত শত প্রকাশকও বই-এর ব্যবসায় বিত্তশালী হচ্ছে।

এ সব দেখে শুনে মনে হয়, আমরা কোথায় ? আমাদের দেশে স্কুলপাঠ্য বই ছাড়া অন্য বই বেরোয় না। লেখকেরা লিখলেও প্রকাশক নেই ছাপাবার, ফলে যা হবার তা হচ্ছে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের কোন পরিচয় আমরা পাচ্ছি না। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধিত হচ্ছে না। চিন্তা ও মননশীলতার জগতে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। আমরা নামে মাত্র আজাদী পেলাম, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য স্যা জাতিগুলোর তুলনায় মানুষ হিসেবে জাতি হিসেবে যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেলাম।

বাইশ

ইংরেজদের মত খেলাধূলা প্রিয় জাত দুনিয়াতে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। খেলাধূলার ভেতর দিয়ে একটা জাত যে কিভাবে গ'ড়ে উঠতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইংরেজরা।

খেলা যে শুধু আমোদ-প্রমোদের জন্যে, কি কাজকর্মের চাপ থেকে নিজেকে একটু

দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফাঁকা মাঠে কি খেলার জন্যে নির্ধারিত ঘরের ভিতরেই জীবনের গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে, তা নয়। খেলাতে মন প্রফুল্ল হয়, স্বাস্থ্য গ'ড়ে উঠে, আর সব চেয়ে বেশী ক'রে গ'ড়ে উঠে মানুষের খেলোয়াড়োচিত মনোবৃত্তি, তার ব্যক্তি এবং জাতীয় চরিত্র। খেলার এক একটা টিমে যে কয়জন মানুষ থাকে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার দরকার হয়। একে অন্যেকে বুঝতে গেলে প্রথমেই আসে স্বার্থত্যাগের কথা। টিম এবং জাতির জন্যে না খেলে শুধু নিজের জন্যে খেলতে গেলেই পরাজয় অনিবার্য। এক একজন লোক যত বড়ো খেলোয়াড়ই হোক না কেন, টিমকে অবহেলা ক'রে কৃতিত্ব জাহির করতে যেই এগিয়েছে, অমনি দেখা গেছে তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা শেষ হয়ে আসছে। অথচ নিজে একা নাম কেনার লোভ না ক'রে টিম এবং দেশের নামের জন্যে খেলতে গেলেই দেখা যাবে হয় সকলে এক সঙ্গেই জয়ী হচ্ছে, না হয় টিম হিসেবেই একত্রে বিজিত হচ্ছে। এতে মিলেমিশে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে খেলোয়াড়দের মন তৈরী হয়। তাছাড়া নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলা সম্পর্কে জ্ঞানও খেলার ভেতর দিয়ে ছেলেবেলা থেকে মানুষের মনে যেমন ক'রে গেঁথে যায়, এমন আর কিছুতে সম্ভব নয়। এতে আরও আছে, খেলাকে খেলা বলে ধ'রে নিয়ে জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করার শিক্ষা। অতি জয়ে উল্লাস খেলার মধ্যেই স্বাভাবিক। সে জয়কে ভবিষ্যৎ জয়ের পথে প্রেরণা দেবার উপক্রম হিসেবে যতোটা গ্রহণ করা যায়, ব'সে ব'সে তার স্মৃতি রোমন্থন করার দিক থেকে সে পরিমাণে ততোটা সমর্থন করা যায় না। আবার পরাজিত হলেও হা-হুতাশ ক'রে সময় ক্ষেপণ করা খেলার কোনো বিধানেই নেই। খেলার অর্থ সুস্থ প্রতিযোগিতা, জীবন ও প্রতিবেশকে সহজভাবে গ্রহণ ও বর্জনের শিক্ষা। জীবনের প্রতি এ দৃষ্টিভংগী গ'ড়ে তুলতে খেলা মানুষকে প্রেরণা যোগায়। খেলার মাধ্যমেই ইংরেজ এ দৃষ্টিভংগীর অধিকারী।

দেশীয় প্রকৃতি আর ভৌগোলিক পরিবেশ ইংরেজদের জীবনের গতি নির্ধারণ করেছে। আর সে জীবন বিকাশের পরিপোষক খেলাধূলারও সৃষ্টি করেছে এরাই। ইংরেজদের প্রিয় খেলাগুলো ক্রিকেট, ফুটবল, রাগবী, টেনিস আর নৌকা বাইচ। এক একটি খেলাকে অবলম্বন ক'রে এদের কতো ক্লাব আর কতো-না প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে, আর একটা খেলার জন্যে এক অঞ্চল অন্য অঞ্চলের সঙ্গে বুনো বেড়ালের মতো কি ভাবেই না প্রতিযোগিতা করে, তা না দেখলে বা ভেতরে ওর না ঢুকলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

একদিন দেখছি লণ্ডন শহরের পশ্চিমাঞ্চল বিচিত্র এক ধরনের কোচে ভ'রে উঠলো। তার ভেতর বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত নরনারী দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এরা ইংলণ্ডের অধিবাসী নয়। লণ্ডনের তো নয়ই। শুনলাম ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। তা দেখবার জন্যে আর স্কটল্যান্ডের সমর্থন করার জন্যে হাজার হাজার স্কচ নরনারী এসেছে লণ্ডনে। সে জন্যেই এত কোচের আমদানী। পরে শুনলাম স্কচেরা দু'গোলে ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিয়েছে। স্কচদের বিজয়োল্লাস দেখে কে? হাতে এক ধরনের ডুগডুগী নিয়ে লণ্ডনার্সদের নাক বরাবর বাজাতে বাজাতে তারা তাদের বিজয়-গৌরব ঘোষণা ক'রে যাচ্ছে। সে যে কি উল্লাস, তা কি ব'লে বুঝাবো।

লণ্ডনের এফ. এ. কাপ প্রতিযোগিতা সে তো এক বিখ্যাত ব্যাপার। এফ. এ. কাপের ফাইনাল খেলা দেখবার জন্যে কত লোক যে বছরের পর বছর প্রতীক্ষা করছে তার ইয়ত্তা নেই। ইংলণ্ডের সেরা 'সকা' (Soccer) প্রতিযোগিতা এটি। এ্যাষ্টনভিলা, আরসেনাল ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড, নিউক্যাসল্ ইউনাইটেড প্রভৃতি বিখ্যাত 'সকা' (ফুটবল) ক্লাবগুলোর মধ্যে এফ. এ. কাপ খেলার যে প্রতিযোগিতা হয়, প্রথম বিভাগ লীগের খেলায়ও ততটা নয়। আর এ টিমগুলোর যে কোনোটির খেলাই দেখবার মতো। দেখে জীবনব্যাপী স্মরণ রাখার মতো। অবিভক্ত ভারতের কলকাতার বিখ্যাত ও দুর্ধর্ষ মোহামেডান দলই এদের কোনো কোনোটির ধারে কাছে আসার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এখনকার পাক-ভারতের টিমগুলোর কথা নাইবা বললাম।

ফুটবল এদের জাতীয় খেলা। তেমনি জাতীয় খেলা রাগা(রাগবী) আর ক্রিকেট। ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা অবশ্য ইংলণ্ডের এখন একচেটিয়া নেই। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান এবং ভারতেও ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট। অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের কাছে যতবার টেষ্টে হেরেছে, ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে তারও চেয়ে বেশী ক'রে। বহুদিন ধ'রে হারতে হারতে দীর্ঘদিন পর এই তো সম্প্রতি ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে এ্যাসেজ উদ্ধার করলো। তবু ক্রিকেটের জন্মভূমি হিসেবে আজও ইংল্যণ্ডের গৌরব অক্ষুণ্ন এবং ক্রিকেটের জন্মদিন থেকে, বলতে কি, ইংলণ্ডই এক রকম একে লালন পালন ক'রে আসছে। ভাঙা গড়ার ভেতর দিয়ে স্বনামখ্যাত এম. সি. সি (মার্লিবোন ক্রিকেট ক্লাব) এখনও সমানভাবেই টিকে আছে। ক্রিকেট ভক্ত, কি ক্রিকেট ফ্যান নরনারীর সংখ্যা এখানে প্রতি দশজনে একজন কি তার চেয়েও বেশী বেড়ে চলেছে। আমার এক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে একদিন ওদের জাতীয় খেলা-ধূলা নিয়ে আলাপ করছি। কথায় কথায় সে বললে, 'ভারত আমরা ছেড়ে এসেছি তাতে দুঃখ নেই; পাক-ভারত আমাদেরকে তাড়িয়েছে তাও সত্যি, কিন্তু ওরা আমাদের ক্রিকেটকে যে আঁকড়ে ধরেছে তাতেই আমি খুশী।'

ইংলণ্ড চারিদিকে সাগর পরিবেষ্টিত বলে বাইরের জগতে বেরোতে হলেই সমুদ্র ছাড়া ইংরেজদের আর গতি নেই। সেজন্য সমুদ্রকে এরা ভয় করে না, তাকে জয় করবার সাধনা এদের ছেলেবেলা থেকে। পার্কে মাঠে ঘাটে কৃত্রিম লেক কি নদী নালা তৈরী ক'রে হাঁটি হাঁটি পা পা টলি টলি গা'র বয়সের শিশুদের ধরে এরা নৌকা চালানো শেখায়। নদী নালার সঙ্গে তাদের পরিচিত ক'রে তোলে। তারপর বয়স হ'তে না হতেই সাগরের সঙ্গে মুখোমুখি করিয়ে দেওয়া হয়। সাগরের কথা বলতেই ইংরেজরা তার সঙ্গে কেমন যেন এক প্রীতির সম্পর্কে গদগদ হয়ে উঠে। এ কারণেই বোধ হয় নৌকা বাইচও এদের জাতীয় খেলাগুলোর অন্যতম। প্রতি বছরের অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় সারা ইংলণ্ডে একটা অপরূপ স্পন্দন অনুভূত হয়। বছরের একটি দিনের অল্প কয়েক মিনিটেই যে খেলার পরিসমাপ্তি, তার জন্যে সারা বছর ধ'রে এ বিশ্ববিদ্যালয় দু'টির ছেলেরা প্রস্তুতি চালায়। কতো তার আয়োজন! প্রথমতঃ নয় নয়টি সক্ষম প্রতিযোগী খুঁজে

বের করা হয়। তারপর উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে চলে বছর ধ'রে ওদের শরীর চর্চা ও নিয়ম পালন। শরীরের ওজন বাড়ছে কি কমছে, শরীর হালকা হচ্ছে, না ভারী হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে রাখতে হয় এদের বিশেষ দৃষ্টি। এ কঠিন নিয়ম ও সংযমশাসনের ভেতর দিয়ে প্রতীক্ষিত প্রতিযোগিতার জন্যে এদের তৈরী করা হয়। অবশেষে আসে রেসের দিন। সেদিন দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের নয় দু'গুণে আঠারটি ক্রুর শুধু যে নামধামই ওদের আপন আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে গ্রথিত হয় তা নয়, ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে অল্প কিছুক্ষণের সংগ্রামের ভেতর নিয়ে যারা আর একটি পাতা যোজনা ক'রে দিচ্ছে তাদের প্রত্যেকের হাত পা প্রভৃতি শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপও লেখা হয়ে যায়। ওদের শরীরের উক্ত বর্ণনা থেকে দু'চার দশ বছর অথবা ওদের মৃত্যুর পরেও যে কোন সুদক্ষ ভাস্কর ওদের প্রস্তরমূর্তি গড়ে দিতে পারে। টেম্‌স নদীতে পাটনী ব্রিজের কাছে রেস আরম্ভ হয়। নেহায়েত খারাপ আবহাওয়ার জন্যে রেস যদি বাতিল না হয়ে যায়, তা'হলে রেস দেখার জন্য পাটনী থেকে মোটলেক পর্যন্ত টেম্‌সের পাঁচ মাইল ব্যাপী এ ঘুরপাক খাওয়া দুস্বতীর ঘিরে মেঘবৃষ্টি মাথায় ক'রে হোক, কি স্বচ্ছ পরিষ্কার আকাশের নীচেই হোক, সমগ্র ইংলণ্ডই একরকম ভেঙ্গে পড়ে।

১৯৫১ সালে অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের রেস দেখলাম। রেসের দিন মনে হলো ইংলণ্ডের সব নরনারীই, ছেলে বুড়ো সকলেই যেন টেমসের দু'পারের পাঁচ মাইল কম্বরে দশ মাইল ঘিরে ভেঙ্গে পড়েছে। কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। কেউ কেম্‌ব্রিজের পক্ষ নিয়েছে। কেউ নিয়েছে অক্সফোর্ডের। নদীর দু'পাশে গগন-বিদারী চীৎকার আর উল্লাস। আর নদীর মধ্যে উভয় দলের প্রতিযোগীদের মধ্যে সে কি প্রাণপণ প্রতিযোগিতা। অক্সফোর্ডের নৌকার মুখ একটু আগে বাড়ে তো কেম্‌ব্রিজ মরিয়া হয়ে তার আগে বেরোয়; আবার অক্সফোর্ড মরণমুখী টান টানে। নৌকার এ টান তো নয়, জাতীয় জীবন সংগ্রামেই অমর হয়ে বাঁচবার জন্যে আঠারো জন ইংরেজ সন্তানের সে কি দুঃসাহসিক অভিযান। এদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এদের মাথার উপরে আকাশে উড়ছে রয়াল এয়ার ফোর্সের এ্যারোপ্লেন। পেছনে এদেরকে অনুসরণ করছে নেভির ছোট একটি বহর। সঙ্গে দুর্ঘটনা মোকাবেলা করার আয়োজন। ব্রড্‌কাষ্টিং এবং টেলিভিশনের সুচারু ব্যবস্থা। কেম্‌ব্রিজ জিতলো বারো নৌকার ব্যবধানে।

খেলাধূলায় প্রতিযোগিতা তো সর্বত্রই হয়। সে প্রতিযোগিতার মধ্যে নির্মল সুস্থ ভাবও অনেক জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। সেখানে এদের যে খুব বৈশিষ্ট্য আছে তা মনে করি না, কিন্তু এ সব খেলাধূলা বিশেষ ক'রে এ নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের পেছনে সমগ্র দেশের এমন গণসমর্থন সহসা চোখে পড়ে না। এ বোট রেস শুধু যে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছেলের তা নয়, সমগ্র জাতিরই। সমগ্র জাতিই তাদের জয়-পরাজয়ে সমানভাবে তাদের বেদনার বা আনন্দের অংশীদার হয়ে ওঠে।

তেইশ

পয়লা জেমস তখন ইংলণ্ডের রাজা। সেকালের ইংলণ্ডে প্রটেষ্টান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকতো। পার্লামেন্টেও প্রটেষ্টান্টদের একচেটিয়া অধিকার। গাই ফক্স ছিলেন ক্যাথলিক। তিনি সাধারণ মানুষেরই একজন। মনে মনে বুদ্ধি আঁটলেন পার্লামেন্ট হাউসটাই একেবারে উড়িয়ে দিতে হবে। দিনটা ছিল পাঁচই নভেম্বর। পার্লামেন্টহাউসে বারুদ দিয়ে আগুন দিতে যাবেন, এমন সময় তাঁর পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ধরা প'ড়ে গেলেন। সেদিন থেকে প্রতি পাঁচই নভেম্বর রাত্রে ইংলণ্ড গাই ফক্সের উৎসব উদ্‌যাপন করছে। এ উৎসব অবশ্য গাই ফক্সের স্মৃতি রক্ষার জন্যে নয়, বরঞ্চ পার্লামেন্ট যে বেঁচে গেলো তার আনন্দোৎসব পালন করার জন্যে।

এটা 'ইয়ুথ ফেষ্টভ্যাল'। ছেলেমেয়ে আর যুবক যুবতীদের উৎসব। দু'এক মাস আগে ছোটো ছেলেমেয়েরা মুখে কালি ঝুলি মেখে তার প্রস্তুতি চালায়। বেকার ষ্ট্রীট ষ্টেশনের কাছে এক সন্ধ্যায় আনমনে ঘুরছি। কয়েকটি দশবারো বছরের ছেলেমেয়ে কালিঝুলি মেখে কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধ'রে 'Penny for a Guy' 'Penny for a Guy' করতে করতে আমার কাছে ছুটে এল। পেনি না পেলে আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না ভাবখানা এ রকম। বুদ্ধিমানের মতো ওদের দু'জনার কৌটায় দুটো পেনি দিয়ে সরে পড়তেই দেখি আর একদল আমার দিকে ছুটে আসছে। আমি দ্রুত পাশ কেটে স'রে পড়লাম।

অবশেষে পাঁচই নভেম্বরের রাত এলো। সবেবরাতের রাতে পটকা ফোটানো দেখেছি। কিন্তু এখানে সে কি পটকা ফোটানো! পটকা আর তুবড়ির আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে গেলো। আগুনের খেলায় দেখছি লণ্ডন শহর যেন মেতে উঠেছে। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরাই এ খেলায় অগ্রণী। গাওয়ার ষ্ট্রীটে ইউনিভার্সিটি কলেজের সামনে এসে দেখি যেন কলেজের দালানেই আগুন লেগে গেছে। আগুনের শিখা যেন গগন স্পর্শ করতে চায়। তার পাশে ছেলেমেয়েরা একত্রে মিলেমিশে নাচছে আর গান গাইছে। হাত তালি দিচ্ছে আর অনেকটা আমাদের সাঁওতালি নাচ নাচছে। একদল নাচতে নাচতে মেতে উঠেছে, অন্যদল তখন তাদের লক্ষ্য ক'রে পটকা কি চড়বড়ি ছুঁড়লো। কারুর জামা কাপড়ের মধ্যে চড়বড়ি ঢুকলো। কেউ হয়তো লাফিয়ে উঠে চিৎকার ক'রে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো।

আমাদের দেশের অনেক জায়গায় যেমন মহররমের মিছিল হয়; এক একটা দল এক জায়গা থেকে বের হয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গা প্রদক্ষিণ করে কিংবা সব দলই এক জায়গায় এসে জামায়েত হয়, তেমনি দেখছি লণ্ডনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসে এ উৎসব মিছিলে যোগ দিয়েছে। তারা নিজেদের এক একটা খোলা বাস নিয়েছে। বাস সাজিয়েছে নানাভাবে। তাতে নানা পোষ্টার। এক একটা পোষ্টারের ভাষা এক এক রকম। কোনটায় লেখা England 49th State of the U.S.A., কোনটায় হয়তো খাদ্য মন্ত্রীর সমালোচনা। কোনোটায় রক্ষণশীলদের প্রতি ব্যঙ্গ, কোনোটায় শুধু আমোদ ও বিভীষিকা

সৃষ্টির জন্যেই বীভৎস সাজসজ্জা। লণ্ডনের আকাশও আলোয় আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে।

সামনে যাচ্ছে এ ধরনের খোলা বাস! তারই পেছনে চলেছে ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছেলেমেয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। ভিড়ের চাপে কেউ হারিয়ে না যায় কিংবা ছিটকে না পড়ে সেজন্যে তারা নিজ নিজ কোমরে দড়ি বেঁধেই নিজ প্রতিষ্ঠানের বাসের অনুগামী হয়ে ছুটছে। ভিড়ের মধ্যে কেউ যে দড়ি বাঁধা অবস্থাতেই ছুটতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে না তা নয়।কিন্তু ও পড়াতেই আর ভিড়ে চাপা খাওয়াতেই তাদের আনন্দ। এতে কেউ আহত হচ্ছে, কাউকে হয়তো হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। কিন্তু হিসেব ক'রে চলতে কাউকে দেখছি না। জীবনের জোয়ার যখন আসে, যৌবনের উচ্ছল আবেগ যখন মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর যৌবনের ভাণ্ডার থেকে অফুরন্ত ঐশ্বর্য ছড়িয়ে যাওয়াতেই বোধ হয় যুবক-যুবতীর চরম আনন্দ।

চব্বিশ

বিলেতে এসে খেয়াল না করলেও প্রথমেই যা বিদেশীদের চোখে পড়ে এ দেশের পুলিশ তার একটি। গলা থেকে পা পর্যন্ত কালো ওভারকোট ঢাকা, মাথায় টোপ পরা দৈর্ঘে প্রস্থে মানানসই মানুষগুলো পথের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাজার হাজার লোকে চলাফেরা করছে, তার মধ্যে এ লোকগুলো সবার আগে চোখ পড়ে তাদের শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্যে। পুলিশের কাজ করার জন্য বাছাই ক'রে লোক নেওয়া হয়। শরীরের নির্দিষ্ট একটা মাপ ছাড়া কেউই পুলিশ হ'তে পারে না।

পুলিশ সম্পর্কে আমাদের দেশে সাধারণ একটা ভয়ই আছে। ইংরেজরা লাল পাগড়ী-পরা পুলিশ দিয়েই আমাদের প্রায় দুশো বছর শাসন করে গেলো। আমাদের দেশের মেয়েরা কোলের বাচ্চাদের শাসন করতে আর কান্না থামাতে যুযুর ভয় দেখিয়ে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশেরও। আমরা যে পরিবেশে মানুষ সে পরিবেশে, বিশেষ করে শতাব্দীর বিশ কি তিরিশ সালের দিকে বুদ্ধি হলেই দেখেছি পুলিশেরা কারণে অকারণে শুধু মানুষ ধরে নিয়ে যেতো। একে মায়ের দেখানো ভয় তার ওপর বুদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশদের লোক ধরার তৎপরতা দেখে মনে মনে যে সংস্কার জন্মে গেছে, বড়ো হয়ে মন যখন বিচারসহ হয়েছে তখনও অজ্ঞাত-সারে পুলিশ সম্বন্ধে কেমন একটা বিরূপ ধারণা আমাদের ভেতরে রয়েই গেছে। এ ধারণা বদ্ধমূল হয় গ্রামাঞ্চলে দারোগা জমাদারদের দুর্বিষহ অত্যাচার আর ঘুষ নেওয়ার জারিজুরি দেখে। এরা যে আমাদের দেশের Essential Service-এর লোক, এদের অনেকের অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখে সে কথা মনেই পড়ে না।

বিলেতে পুলিশগুলোর এ রকম পোশাক-পরিচ্ছদ আর বপু দেখে ভয় যেন আরও ঘন হয়ে উঠে। কিন্তু ভয় ভাঙে একবার এদের সংস্পর্শে এলেই। পথে বেরিয়ে পথ হারিয়ে এদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করে এদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি তা এতো মিষ্টি যে,

তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। লণ্ডনের পথ ঘাট লণ্ডনের খাস অধিবাসীদেরও জানার কথা নয় পুলিশেরা যতো জানে ততো আর কেউ নয়। জানা থাকলে তো কথাই নেই সঙ্গে সঙ্গে এমন নির্দেশ দেবে যে, অন্ধও তার গন্তব্য পথ খুঁজে বের করতে পারবে। আর জানা না থাকলে নিজের নোট বুক কি পুঁথি পাঁজি খুঁজে ফোন করে একটা না একটা তথ্য সে উদ্ধার করে দেবেই। এমন মিষ্টি কথায় সে লোককে তুষ্ট করে দেয় যে তার কথা শুনে মনে হয় সে যেন তার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। বহু দিন আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। ঐ শালপ্রাংশু দেহের মধ্যে এতো মিষ্টি মন যে কারুর থাকতে পারে, এদের সংস্পর্শে না এলে সহসা তা বিশ্বাসই করা যায় না।

ভারী ভালো লাগে ওদের বাচ্চাদের রাস্তা পার করার দৃশ্য দেখতে। বাচ্চারা দলে দলে স্কুলে যাচ্ছে। কি স্কুল থেকে ফিরছে। পথে হয়তো পিঁপড়ের সারি মতো বাস টেক্সির স্রোত চলছে। কয়েক মিনিট অন্তর ক্ষণিকের জন্য গাড়ী যখন থামে, বড়ো মানুষেরা সে ফাঁকে রাস্তা থেকে রাস্তান্তরে পার হয়ে যেতে পারে। বাচ্চাদের পক্ষে সব সময় তা সম্ভব নয়। তাছাড়া সময় মতো তাদের স্কুলেও যেতে হবে। তাই পুলিশ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। তারা পথের মোড়ে হুইশেল দিয়ে গাড়ীর বহর থামিয়ে দেয়। বাচ্চারা সে ফাঁকে রাস্তা পার হয়ে যায়। আর পুতুলের মতো ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ওরা কোলে বুকে করে নিজেরাই সুন্দর পার করে দিচ্ছে। পুলিশদের হাতে প'ড়ে ওদের কোলে চড়ে বাচ্চারা যে কতো নিরাপদ বোধ করছে তা ফুটে ওঠে ওদের চোখে মুখে।

এছাড়া ইংলণ্ডের স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ড চুরি ধরতে আর দুষ্টের দমন করতে, আর সবার উপরে গোয়েন্দাগিরি করতে দুনিয়া বিখ্যাত। ইংলণ্ডে যে ডিটেকটিভ গালগল্প গল্পোপন্যাস গড়ে উঠেছে, তার সূত্রপাত দেখি স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ডের অদ্ভুত ও দুঃসাহসিক কাজের মধ্যে। ছোটখাটো চুরি যাকে আমরা ছেঁচড়ামি বলি এমন কিছু বিলেতে লাখে একটি হয় কিনা সন্দেহ। যে সব দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর চুরি ডাকাতি হয়, স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ড তার চেয়েও রোমাঞ্চকর পদ্ধতিতে তার মোকাবিলা করে। এতে তাদের বুদ্ধির দীপ্তির পরিচয় পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত হওয়ার মানসিকতা।

বিলেতে পুলিশেরা রুজির পথ হিসেবে এ চাকরি গ্রহণ করলেও শুধু চাকরির জন্যেই যে চাকরি করা ওরা তা করে না। এ চাকরিতে এদের আনন্দ আছে। দেশ এবং মানব সেবার ব্রত নিয়েই ওরা এ করতে আসে। নইলে বিপদে আপদে মানুষ চরম ভরসাস্থল হিসেবে পুলিশের আশ্রয়ে ছুটে আসবে কেন? পুলিশ এ দেশের মানুষের জ্ঞাতি, তাদের বন্ধু। সে জন্যে সমাজও পুলিশদের সুনজরে দেখে। সমাজেও তাদের নাম আছে।

মনে পড়ছে, আমি আর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দুর রীডার ডাক্তার মাসুদ হোসেন একদিন কেম্‌ব্রিজ থেকে ট্রেনে করে লণ্ডনে ফিরছি। আমাদের কামরায় কেম্‌ব্রিজ অঞ্চলের কৃষক পরিবারের একটি সরল শান্ত মেয়ে উঠলো। সেও আসছে লণ্ডনে। Excuse me ব'লে অপরিচয়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে যেই তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলাম, অমনি মেয়েটির গ্রাম্য সরলতা এবং কথাবার্তার অকৃত্রিম আবেদন মন স্পর্শ করলো। প্রথম পরিচয়ে ইংরেজকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে নেই তা জানি। কিন্তু কৌতূহল দমন করতে না পেরে

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার মা বাবা বেঁচে আছে ?' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'বাবা গত যুদ্ধে মারা গেছেন, তবে মা আছেন।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার আর ভাই বোন নেই ?'

সে উত্তর করলে, 'আমার আর দুটি ভাই আছে।'

—'তারা কি করে ?'

—'এক ভাই চাষবাসের কাজ করে সে বাড়ীতেই থাকে। আর এক ভাই পুলি-শ ম্যান।'

'পুলিশম্যান' শব্দটি দ্বিতীয় অক্ষরটির উপরে চাপ দিয়ে তাকে বিশেষ ভাবে দীর্ঘায়িত করে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে সেটি উচ্চারণ করে মেয়েটি যে এক তৃপ্তিভরা সৃষ্টি দিয়ে আমাদের দিকে চাইলো, তাতে পুলিশম্যানের বোন হতে পারার গৌরবে তার বুক যে ভরে উঠেছে, আমাদের কাছে তা আর লুকানো রইল না।

পঁচিশ

মনে হয় জাতিগতভাবে ইংরেজরা আবেগহীন। ভাব-বিহহ্বলতা বোধ হয় ওদের চরিত্রে নেই। দয়ামায়া স্নেহ-মমতা প্রায় মানুষের আছে, সুতরাং ইংরেজদেরও আছে। কিন্তু ইংরেজদের মধ্যে তার প্রকাশ খুব সংযত। কিন্তু জাতিগতভাবে ইংরেজদের একটা সংযত আবেগ বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার Queue-তে। ইংরেজরা আগেও কিউ করতো কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সে কিউ যতো ব্যাপক সুশৃঙ্খল হয়েছে, আগে তেমন ছিল না। ইউরোপে এমন কিউ আর কোথাও দেখিনি।

প্যারিসে দেখলাম সিনেমা কি থিয়েটার হলে কিউ, ঢুকবার জন্যে কিউতে দাঁড়ালেও দরজায় ঢুকবার সময় সে কিউ আর থাকে না, ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। বাসের জন্যে লোক অপেক্ষা করছে। মনে হচ্ছে যেন কিউতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তা নয়, কিউতেও আছে তার আশেপাশে দাঁড়িয়ে ঘোরাফেরা করছে এমন লোকও আছে। বাস এলো। কিউর লোকেরা উঠতে পারলো না। আশেপাশের লোক ঝটপট বাসে উঠে পড়লো। কিন্তু ইংলণ্ডে তা হবার নয়। সেখানকার 'কিউ' তো 'কিউ'ই। এমনও সময় আসে যখন একটা কিউ দু'তিন মাইল লম্বা হয়। একদিন স্থির করলাম 'ফেষ্টিভ্যাল অব ব্রিটেন' উপলক্ষে টেম্‌সের পাশে Pleasure Garden-এর যে মেলা বসেছে. কয়েক বন্ধুতে মিলে তা দেখে আসবো। কেনসিংটন গার্ডেন ষ্টেশন থেকে বাস ধরতে হবে। দেখলাম বাসের প্রতীক্ষায় কিউতে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত নরনারী। বাস ধরতে হ'লে আমাদেরও কিউতে দাঁড়ানো ছাড়া অন্য উপায় দেখি না। কিউতে দাঁড়ানোর জন্যেই হাঁটতে শুরু করলাম। কেনসিংটন ষ্টেশন থেকে প্লেজার গার্ডেনের দূরত্ব মোটামুটি মাইল পাঁচেক। হাঁটতে হাঁটতে আমরা কিউটির শেষ প্রান্তে এসে যখন পৌছলাম, তখন দেখি প্লেজার গার্ডেনে পৌছাতে আর মাইল দুই পথ বাকী। মহা সমস্যায় পড়লাম। বাকী দু'মাইল পথ হেঁটে যাবো, না বাস ধরার জন্যে

কিউতে দাঁড়িয়ে উল্টো পথে আরও তিন মাইল হাঁটবো ? কিউতে দাঁড়ালে অবশ্য হাঁটার কষ্টটা বুঝবো না। সারিতে পিঁপড়ে যেমন সুড় সুড় ক'রে চলে, তেমনি নরনারীর সারি সুড় সুড় করে নিজেদের অজ্ঞাতে এগুচ্ছে। হাঁটার কষ্ট বুঝা না গেলেও কিউ অনভ্যস্ত আমাদের তো আর একটা বড়ো কষ্ট আছে। তা সমস্ত দেহের ভারটা বেচারী পা দু'টোকে দিয়ে বইয়ে নেওয়া। ওরা কতক্ষণই বা তা পারবে ? ক্লান্তি অবশ্য দূর হয় যদি কিউতে দাঁড়ানোর ভার থেকে মন মুক্তি পায়। তেমন ভাগ্যবান ঘন্টার পর ঘন্টা কিউতে দাঁড়িয়েই কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সকলের ভাগ্যেই যে এমন ঘটবে তার নিশ্চয়তা কি ? সুতরাং বুদ্ধিমানের মতো বাকী পথ আমরা পায়ে হেঁটেই রওয়ানা দিলাম।

অধিকাংশ ইংরেজই কিউতে দাঁড়িয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করে। কিউতেই পড়ছে, কিউতেই চিন্তা করছে, কিউতে নতুন সৃষ্টির খোরাক পাচ্ছে। কিউতে খাচ্ছে, আবার কিউতে দাঁড়িয়ে রসিকতাও করছে, এমনকি টুকিটাকি লেখার কাজও করছে কিউতে দাঁড়িয়েই। কেননা কিউ ছাড়া এদের পথ নেই, মুক্তিও নেই। জীবনের সব যে কিউতে ভর্তি। সিনেমা দেখতে যাও লেখা আছে, 'সাড়ে চার শিলিং-এর টিকিটের জন্যে এখানে কিউ কর.' 'এখানে কিউ কর সওয়া নয় শিলিং-এর,' 'এখানে সাড়ে ষোল শিলিং-এর।' সিনেমা, থিয়েটার, আমোদ প্রমোদ ভবনের সবেতেই কিউ। বাস ট্রেন ইত্যাদিতে উঠতে গেলেও সর্বত্রই কিউ। এ কিউ প্রকট হয়ে উঠে উইক্এণ্ডে যেদিন ইংরেজরা দলে দলে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোয়। তাই বাস ষ্টপে কিউ করে, নৌকা বাইচ খেলার জন্যে কিউ করে, চা-এর জন্যে কিউ করে, লায়ন্স-এ খেতে ঢুকে কিউ করে। কিউ করে আইসক্রিমের জন্যেও। কোথাও কিছুর জন্যেও কিউ করার না থাকলে কিউতে দাঁড়ানোর আনন্দের জন্য কিউ করে। সঙ্গী না পেলেও সুশৃঙ্খল ভাবে একাই কিউ ক'রে দাঁড়ায়। সপ্তাহ শেষে যারা ঘরের বাইরে যেতে পারলো না, তারা বাইরে কিউতে দাঁড়াতে না পারার ব্যথা ভোলে কিছুক্ষণের জন্যে ঘরের মধ্যে পরিবার পরিজনদের নিয়ে কিউ করে। সব শেষে মজা হয় তখনই, যখন রাতের বেলা মা বাবাদের ছেড়ে ছোট ছেলেমেয়েরা বিছানায় যাবার জন্যে কিউ করে দাঁড়ায়।

ছাব্বিশ

খাওয়াতে যে তৃপ্তি আছে, বিলাতে এসে অবধি তা ভুলেই গেছি। বিলেতে রওয়ানা হবার আগে দিনকয় ধ'রে কি পোলাও কোরমাই না খেলাম। দেশে থাকতে ও সব খাবারের জন্যে আগ্রহ থাকলেও লালায়িত হইনি। আমাদের মোগলাই খানা সত্যি সে এক এলাহি ব্যাপার। পাঠান ও মোগলেরা মিলে এদেশে এ সব খানা আমদানি করেছিলেন। মোরগ পোলাও, বিরইয়ানি, কোরমা-কবাব, কোফত-কালিয়া, পাক হ'তে থাকলেই দূর থেকে তার ঘ্রাণ বাতাসে ভেসে এসে জিবের পানি ঝরায়। ক্ষুধা না থাকলেও পেটের মধ্যে ক্ষুধার রস ক্ষরণ হ'তে থাকে। মন প্রফুল্ল হয়। আর খেতে ব'সে মনে হয় খোদার দেওয়া নেয়ামত মুখ দিয়ে

কোথায় যেন নেমে যাচ্ছে। খেয়ে তা পেট ভরছেই, সঙ্গে সঙ্গে মনও ভরছে। আত্মাও হচ্ছে তৃপ্ত। পরিতৃপ্ত মন তার অজ্ঞাতসারে আপনা থেকেই অন্নদাতার প্রতি সম্ভ্রমে নুয়ে আসছে। একেই বলে খাওয়ার মতো খাওয়া—একেবারে বনেদী। বাঁচার জন্যে খাওয়া নয়, খাওয়ার জন্যেই বাঁচা। এ খাওয়ার জন্যে বাঁচতে গিয়েই ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে মোগলেরা ভারত সাম্রাজ্য হারালো। সে যাক্ গে। পর্ব পার্বণের কথা নাইবা তুললাম। অতিথি অভ্যাগতের সমাদরেও আমাদের দেশের সাধারণ মুসলমানের বাড়ীতে খাওয়ার যে আয়োজন হয়, তাও কি কম। দিনকাল তো বদলে গেলো। এখন পেটের ক্ষুধা মেটানো দায় হয়ে উঠেছে। তবু বিরইয়ানি, মোরগ পোলাও, টিকিয়া, শিককাবাব আর জরদা ফিরনি, রংবেরঙের মোরব্বা আর হালুয়া আমাদের সাধারণ বাড়ীতে এখনও বিশেষ দিনে খাবার রূপে শোভা পায়।

এখানে এসে অবধি খাওয়ার টেবিলে ব'সে ইংরেজদের খাবার দেখে নাকি-কান্না কাঁদি। সঙ্গে সঙ্গে আট হাজার মাইল দূর থেকে কল্পনায় আমাদের খাবারের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে, তার গন্ধ শুঁকি। সে খাবার পাবার জন্যে মন আঁকুপাকু করে, আর সে কারণে যাও-বা এদের খাবার পেটে যেতো তাও যায় না। মুখে তুলে দিলেও নীচে নামতে চায় না। নাড়ীভুঁড়িগুলো বিদ্রোহ করে সব ঠেলে ফেলতে চায়।

ইংরেজদের খাবার শুধু সিদ্ধই। সকালের ব্রেকফাষ্টটা তবু ভালো, ভরপেট খাবার পাওয়া যায়। খাওয়াও যায়। দুধ, কর্ণফ্লেকস, কি পোরিজ, মাখন টোষ্ট, ডিম আর সময়ে 'স্মোক্ড্ ফিশ্'। সিদ্ধ না করে আধ পোড়া লালচে ধরনের ক'রে একটা ধোঁয়াটে গন্ধ তৈরী করা হয় বলে তবু আমাদের কেউ কেউ মাছের এ পাকটাই খেতে পারে।

লাঞ্চ আর ডিনারের কথা কি বলবো। আমাদের যেমন ভাত, সিদ্ধ করা গুঁড়িয়ে নেওয়া আলু (Mashed Potato) এদেরও তেমন প্রধান খাবার। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মটর সুটি, ছিম কি ছিমের বিচি, মিষ্টি কুমড়ো, বর্বটি ইত্যাদি যাবতীয় শাকসব্জীই এরা পানি দিয়ে পুরো কি আধ সিদ্ধ ক'রে নিয়ে গোল মরিচের গুঁড়ো আর নুন দিয়ে শুধু গিলে। ইংলিশ হোটেল রেস্তোরাঁয়, কি স্কুল কলেজের রিফেক্টারীগুলোতে খেতে যাই। সব রকমের সিদ্ধই তো ধীরে ধীরে সহ্য হয়ে আসছে, কিন্তু আস্ত জড় শুদ্ধ সিদ্ধ করা বাঁধাকপি যখন পাতে ধ'রে দেয়, তখন ঐ আলুনি, আর তার ফ্যাকাসে দৃশ্য দেখে মনটা এমন বিষিয়ে উঠে যে, ক্ষুধা থাকলেও খেতে ইচ্ছে করে না। এতোকাল ধ'রে যে শুনে আসছি ক্ষুধার বড় নাকি চাটনি নেই, প্লেটভর্তি সিদ্ধ বাঁধাকপির এ দৃশ্য দেখলেই প্রবাদ বাক্যটির অসারতা ধরা পড়ে। ক্ষুধা যেন আপনা থেকেই উবে যেতে চায়। গরুর বাচ্চা হবার পর দুধ দোয়া শুরু করার ক'দিন আগে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে দেখেছি লাউ, কলাই, বাঁধাকপি ইত্যাদি সিদ্ধ ক'রে গরুকে খাওয়ানো হয়। এখানে খেতে বসে পাতের এ দৃশ্য দেখলেই আমার কাছে ইংরেজ জাতির কি যে একটা অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এতো সভ্য জাত, জ্ঞানে বিজ্ঞানে এতো উন্নত, এত বছর ধ'রে জগৎ জোড়া সাম্রাজ্য চালালো অথচ খাওয়ার ব্যাপারে এদের রুচি কেন মার্জিত হলো না।

আলু শাকসব্জী সিদ্ধতো তবু খাওয়া যায়। কিছুদিন পরে অভ্যাস হয়ে গেলে মাখন কি দুধ মিশিয়ে একটু সুস্বাদু করার চেষ্টা করলে মন্দ লাগে না। কিন্তু মাছ সিদ্ধ? তা আবার কি

রকম ? কল্পনা করুন তো বাঙলা দেশের রুই, কাতল, মৃগেল, ইলিশ, চিতল, পাঙাস আর কই মাগুর সিং প্রভৃতি নামকরা স্বাদ-গন্ধ-ভরা মাছগুলো শুধু পানি-সিদ্ধ করে কঁৎ কঁৎ করে গিলছেন। তা হ'লে কেমন লাগতে পারে ? এখানে তাজা মাছ কি টাটকা মাংস অমিল। একেতো শুকনো মাছ তার ওপরে তার এই দশা। নইলে এখানকারও হেরিং প্রভৃতি মাছগুলো মন্দ লাগে না। এখানকার দু'একটি বাড়ীতে এ মাছই তো খেয়ে দেখলাম। শুকনো বরফ-সিটা মাছ, কিন্তু আশ্চর্য স্বাদ তো।

তারপর গোশ্‌তের কথা। বীফ্ হ্যাম, পর্ক্ মাটন্ সবই কাটা অবস্থায় একেবারে তৈরী হয়ে আসে ইংলণ্ডের বাইরে থেকে। এতো ভালো গোশত আমাদের দেশে কোথায় পাবো আমরা ? এ মাংসও এরা পাক করে না, পাকের নামে করে সিদ্ধ। সময়ে সময়ে রোষ্ট। হায়রে আমাদের দেশের রোষ্ট মুরগী আর রোষ্ট মাটন্। চোখে দেখছি থালায় কি সুন্দর করে সাজানো। সদ্য ভেজে এনে পরিবেশন করা হচ্ছে। মনে মোহ জাগছে। ইচ্ছে করছে হাত বাড়িয়ে মুখে পুরতে। কিন্তু যা বলছিলাম। একদিন সেল্‌ফরীজে খেতে ঢুকলাম। মেনু দেখে উৎসাহিত হয়ে 'রোষ্ট বীফ'-এর অর্ডার দিলাম। মধ্যবয়সী এক ওয়েট্রেস আমার খাবার দিয়ে গেলো। কাঁটা দিয়ে ধরে টুক্‌রাটার ওপরে যেই ছুরির টান দিয়েছি আর অমনি দেখি কি রকম এক পঁচা রক্তের দাগ ফুটে বেরুচ্ছে। তবু কিছু মনে করিনি। উৎসাহ তখনও দমেনি। মুখে তুলে দিলাম আর একটা ভাপসা গন্ধ আমার নাকে মুখে ঢুকে আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলো। পেটের ভেতরে ঢোকাতো দূরের কথা, পেটে যা ছিল তাও বমি হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। অথচ এতো লোকজনের মধ্যে বমিই বা করি কি করে ? ইংরেজের আবার ম্যানার্‌সের প্রশ্ন আছে। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ওয়াশিং রুমে ছুটে গেলাম। ফিরে এসে বসলাম খাবার টেবিলে। ওয়েট্রেসকে বললাম আমার বিল দিতে। সে বেচারী আমার অবস্থা দেখছিল। বললে 'এদেশে নতুন এসেছো বুঝি ?'

আমি ছোট একটি উত্তর দিলাম 'হ্যাঁ'।

বললে সে, 'কিছুতো খেতে পারলে না, আচ্ছা পয়সা কিছু কম দাও না হয়।' আমি বললাম, 'দোকান তোমার নয়, তোমার মালিকের। তা ছাড়া এ জিনিস তো খারাপ নয়। তোমাদের লোকজন তো বেশ খাচ্ছে। আমি খেতে পারছি না। দোষ তোমার জিনিসের নয়, আমারই। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।' পুরো আড়াই শিলিং মিটিয়ে দিয়ে ক্ষুধায় ও ঘেন্নায় কাতর হয়ে হাঁটা দিলাম।

এখানকার হোটেল রেস্তোরাঁয় স্পাগেটি পাওয়া যায়। লণ্ঠনের ফিতার মতো চওড়া আর কেঁচোর মতো মোটা ধব্‌ধবে এ সাদা জিনিসগুলো পাতে নিয়ে লোকজনকে বড় আরামে খেতে দেখি। লোভে পড়ে তাও কিছুদিন চেষ্টা করলাম। লবণ ঝাল দিয়ে পাক করলে কেমন লাগতো বলা যায় না। কিন্তু ময়দার তৈরী এ জিনিসগুলো মুখের ভেতরে তুলে দিলেই দেখছি ল্যাল প্যাল ল্যাল প্যাল করছে। এও এক কি রকমের অনুভূতি।

অক্সফোর্ড স্ট্রীটের কোণের বিরাট লায়ন্‌স কর্ণার-এ স্কুল পালিয়ে মাঝে মাঝে লাঞ্চ খেতে আসি। লাঞ্চ যা খাই, তাতো জানি। পয়সাও এখানে অন্যান্যগুলোর তুলনায় মন্দ দিইনে, তবু আসি এখানে লাঞ্চের সময় কনসার্টের লোভে। উইক্ এণ্ডে এ হোটেলটিতে

ইংরেজ নরনারীর ভিড় দেখি অন্য কিছুর জন্যে নয়, স্যালাড খাবার জন্যে। শাকসব্জী সিদ্ধ করলে তাতে ভিটামিন তবু কিছু নষ্ট হয়। তাই সাত দিন পরে আস্ত ভিটামিন গিলে খাবার আয়োজন। স্যালাড পাতা, গাজর ফুলকপির টুকরা জাতীয় কিছু টক্—এ সব মিলিয়েজুলিয়ে স্যালাড খাবার ব্যবস্থা। সবই কাঁচা। ইংরেজদের প্রতি উইক্ এণ্ডে সোল্লাসে আর সাগ্রহে স্যালাড খাবার উৎসাহ দেখে একদিন আমি, সাজ্জাদ সাহেব, আর সিদ্দিকী সাহেব (চট্টগ্রামের ধনী ব্যবসায়ী, এ. কে. খানের জামাই) এখানে স্যালাড খেতে এলাম। কিউতে দাঁড়িয়ে নিজ হাতে পছন্দসই লতা পাতা তুলে নিয়ে তো বসবার জায়গায় বসলাম। তারপর আগ্রহের সঙ্গে খাওয়া শুরু হলো। লালচে ধরনের কুচি কুচি পদার্থগুলো আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করায় ওদের তুলনায় আমি ওগুলো কিছু বেশী নিলাম। সাজ্জাদ সাহেব গম্ভীর লোক। অসুবিধা হলেও চুপচাপ থাকেন। এতো ইংরেজী খাবার ভক্ত মানুষ তিনি, তবু মুখে দিয়ে যে নিরুৎসাহ হয়েছেন, তা প্রকাশ না করলেও তাঁর চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারছি। সিদ্দিকী সাহেব মিটিমিটি হাসছেন আর মুখে দিচ্ছেন। সিদ্দিকী সাহেব আমার প্রকৃতি জানতেন, আমি টক্ খেতে পারি না। আমি যেই মুখে দিয়েছি আর অমনি মুখ বিগড়ে লাফিয়ে ওঠার যোগাড়। এতোগুলো ইংরেজদের সামনে নাটকাভিনয় হয়ে যায় নাকি তাই ভয়ে ভয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ ভার ক'রে বসলাম। আমাদের পাশে এক ইংরেজ যুগলকে দেখছি কি তৃপ্তির আর ভরসার সঙ্গে না আস্ত ভিটামিন গিলছে। আমি ভাবছি আমাদের দেশের কোন আস্ত গেঁয়ো মানুষ এতোগুলো লোককে এক সঙ্গে এমনি করে শুধু কাঁচা তরিতরকারী আর লতাপাতা খেতে দেখলে কি ঠাওরাবে ? গরু ছাগলের খাবার বদলে দিয়ে হঠাৎ মানুষের খাবারে পরিণত হলো নাকি। প্রথম দৃষ্টিতে যে তার মনে এ খটকা লাগবে, একথা হলপ করে বলতে পারি।

ভালো লাগে এদের ক্রিস্‌মাস ডিনারগুলো। বিশেষ ক'রে ক্রিস্‌মাস ডিনারের রোষ্ট টার্কি। টার্কি এক রকম মুর্গীই। আমাদের মতো করে রোষ্ট করলে আরও যে কত ভাল লাগতো, তা আঁচ করতে পারি।

খাওয়ার পরে মিষ্টি খাওয়া মুসলমানদের কাছে সুন্নত। ইংরেজরা এ সুন্নত নিয়ম বেঁধে পালন করে। এখানে ভাত তো তেমন পাইনে। স্কুলের রিফেক্টারীগুলোতে সিদ্ধ তরিতরকারীর সঙ্গে চা চামচের দুই চামচ ভাত মাঝে মাঝে পাই। খাবারের পরে কিন্তু রাইস পুডিং পাওয়া যায় তার যা ছিরি। দুধের মধ্যে চাল ফেলে সেদ্ধ করে দেওয়া হয়। ইংরেজরা তাই খায় বড়ো তৃপ্তির সঙ্গে।

ইংরেজরা মিষ্টি খেতে ভালোবাসে। চা কফি এক রকম চিনি ছাড়াই দেশ জোড়া লোক খাচ্ছে। কিন্তু পুডিং, আইসক্রিম, ফ্রুট স্যালাড সবই এতো মিষ্টি যে, কোন দিন মনে হয় না, চিনি ব'লে কোন পদার্থের কোনো কালের জন্যে এদের অভাব ছিল।

ইংরেজদের কোনো খাবারের যদি সত্যিকার প্রশংসা করতে হয় তাহলে তাদের কেকের। এরা সত্যিই উৎকৃষ্ট কেক, পেষ্ট্রি আর বিস্কুট তৈরী করতে পারে। ক্রিসমাস কেক, বার্থডে কেক, ওয়েডিং কেক এবং এ ধরনের আরও বিশেষ কোন দিন বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সব কেক তৈরী করা হয়, সত্যি তার তুলনা হয় না। তার অর্থ, ওরা এ আর্টটিতে সিদ্ধহস্ত আর এটা খেতে জানে। তার স্বাদ বোঝে।

খেতে বসে ইংরেজদের প্রতি অপ্রসন্ন হই, কিন্তু জীবনের প্রতি এদের দৃষ্টিভঙ্গী বিচার

করলে খাওয়া সম্পর্কে ওদের উদাসীনতাকে ক্ষমা না করে পারা যায় না। খাওয়াটা এদের বিলাস নয়, ইউটিলিটি বা বাস্তব দর্শনের দিক থেকে নিতান্ত প্রয়োজন। তাই খেতে গিয়ে তার আয়োজন করতে গিয়ে এতো সময় নষ্ট করে না। আমাদের দেশের হিন্দু বাড়ীতে জামাই বরণ করবার জন্যে শুনি বত্রিশ ব্যঞ্জনের আয়োজন হয়। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মধ্যবিত্ত পরিবারেও একটা ভাজাভুজি, একটা মাছ-মাংসের তরকারী আর ডাল সাধারণ ভাবে হয়েই থাকে। এর আয়োজন করতে গিয়ে গৃহিণীকে সেই যে সকালে পাকের ঘরে ঢুকতে হয়, আর তাঁর বেরোনোর সময় হয় না। যখন বের হন তখন দেখা যায়, বিকেল আর রাতের খাবারের আয়োজনের সময় হয়ে গেছে। আমাদের দেশের গৃহ কর্ত্রীদের রান্না ঘরে এমনিভাবে বন্দী করে আমরা খাওয়া-দাওয়ার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছি, ইংরেজ তা করতে নারাজ। একেতো এখানে অধিকাংশ লোকই খাওয়ার কাজটা সারে হোটেলে রেস্তোরাঁয়, তার ওপরে কর্মব্যস্ত জীবনে খাওয়ার জন্যে এত ব্যয় করার মত সময় তাদের হাতে কোথায় ? তাই চটপট ক'রে সিদ্ধ ক'রে কোন রকমে গলাধঃকরণ ক'রে ও কাজটা শেষ করে দেবার ব্যবস্থা। ওদের খাওয়ায় সে জন্যে পেটও পোরে না, মনও ভরে না। আর খাওয়ার পরে পেটও ভার হলো বলে ঝিমুতেও হয় না। খেতে পারে না বলে পরিমাণে কম খায়, আর ঘুরে ফিরেই খায়। বাকী ক্ষুধাটা মিটায় চা খেয়ে। ভোরে চা, লাঞ্চের পরে চা, চায়ের সময়ে চা, সাপারের পরে চা, শোবার সময়ে চা, আর তা ছাড়াও এর ফাঁকে-ফাঁকে চা।

এতো দুঃখের মধ্যেও ইংলণ্ডের হোটেল রেস্তোরাঁয় খেয়ে সুখ আছে। খাওয়ার জন্যে নয়, তরুণী পরিবেশনকারিণীদের মধুর ব্যবহারে। নানা কারণে পিকাডিলীর সোহ অঞ্চলটির খ্যাতি আছে। পৃথিবীর নামকরা দেশ খুব কমই আছে যাদের বড়ো রেস্তোরাঁ এখানে নেই। ভালো ডিনারের লোভে বিকেলের দিকে এধারে এলেই নানাদেশী খাবারের গন্ধ পাওয়া যায়। ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, চাইনিজ, টার্কিশ আর ইন্দো-পাকিস্তানী রেস্তোরাঁতে এ অঞ্চলটি সমৃদ্ধ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাতেও তাই এলাহি কারখানা। মুখের স্বাদ বদল করতে আর ভিন্ন দেশী খাবারের প্রকৃতি নিরূপণ করতে এখানে বিদেশীদের, আর বিশেষ করে ভারত-ফেরত ইংরেজদের ভিড়ের তুলনা নেই। কন্টিনেন্টের মধ্যে খাবারের চর্চায় ফরাসীদের জুড়ি নেই। পাক-ভারতের মোগলাই খানাও ওদের খাবারের রকমফের, প্রণালী আর স্বাদের কাছে হার মানে। এক মিশর আর আরব জগতের রেস্তোরাঁই বিলেতে তেমন চোখে পড়েনি। অন্যত্র ওদের খাবার যে পেটে যায়নি তা নয়। কিন্তু আরবী মিশরী হোক, কি ইস্তাম্বুলী খাবারই হোক, আমাদের শাহী খাবারের কাছে দাঁড়ায় না। কলা হিসেবে খাবারের চর্চা করেছে ইউরোপে ফ্রান্স, প্রাচ্যে পাক ভারতীয় মুসলমানেরা আর দূর-প্রাচ্যে চীনারা। হংকং রেস্তোরাঁয় চীনাদের খাবার খেতে সেজন্যে ঘুরে-ফিরে আসি। ইংরেজদের ছুরি কাঁটা আয়ত্ত করেছি, কিন্তু ওদের চপষ্টিক নামক কাঠির ব্যবহার আয়ত্তে এলো না। না আসুক, ওদের তেলাপোকা, সাপ, ব্যাং অবশ্য খাইনি, কিন্তু অন্যান্য খাবারের মধ্যে যে স্বাদ আছে তা অস্বীকার করি কি ক'রে ?

সাতাশ

লণ্ডনের একটি মাত্র জায়গায় আমাদের দেশী বাজারগুলোর নমুনা দেখা যায়। লণ্ডনের কোন দোকানেই দরদস্তুর করবার রেওয়াজ নেই। ছোট বড়ো যে দোকানেই হোক না কেন এবং যা-ই কেনা যাক না কেন, সব কিছুরই দাম নির্দিষ্ট রয়েছে। যেখানে নেই সেখানেও সেলস্‌ম্যান কি সেলস্‌গার্লেরা যা বলবে, দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে কিনবার হলে সে দামটি ফেলে দিয়েই জিনিস কিনতে হবে। একে ঠকা জেতা নেই। এটাই এখানকার নিয়ম। বাজার করতে গিয়ে আমাদের দেশে পাঁচ দোকান ঘুরে ফিরে দরদস্তুর করে সুবিধা দামে জিনিসপত্র কেনা যাদের অভ্যাস লণ্ডনে এসে হঠাৎ এ রকম ভাবে জিনিস কিনে তাদের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে।

এ রকম লোক জিনিসপত্র কিনতে যেন পেটিকোট লেনে আসে। দক্ষিণ-পূর্ব লণ্ডনে এ বাজারটি। আল্ডগেট ইষ্ট টিউব ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগুলেই এ বাজার শুরু হ'তে দেখা যায়। এ অঞ্চলটি কলকাতার চীনা বাজারের মতো। একে অপরিষ্কার তার ওপরে মানুষ ও দোকান-পাটগুলো যেন গায়ে গায়ে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানের দরদালান যে নেই তা নয়, তবু দোকানের সামনে ফুটপাথের ওপর হয় চাল খাটিয়ে নয়তো চাঁদোয়া টাঙিয়ে নানারকম হাট বাজার বসানো হয়েছে। এখানে সাধারণতঃ শ্রমিক ও গরীব লোকদেরই নমুনা থেকে দারিদ্র্যের চিহ্ন ফুটে বেরুচ্ছে। এদের অমার্জিত আচার-আচরণ, ককনি ইংরেজি, ছেঁড়া ফাটা পোশাক, আর অগোছালো পরিবেশ সব মিলেমিশে এমনই এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে, যে অঞ্চলটিকে লণ্ডনের অংশবিশেষ ব'লে কিছুতেই মনে হয় না। এক জায়গায় দেখছি পুরানো ও ছেঁড়া কাপড়-চোপড় নীলাম হচ্ছে। নীলামের জন্যে তার আনুষঙ্গিক হাঁকডাক শুরু হয়েছে। লোকও ভিড় করেছে কম নয়। ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে কথা কাটাকাটি এবং রীতিমতো দর কষাকষি শুরু হয়ে গেছে। আর এক জায়গায় দেখছি আমাদের দেশের মুদিখানার মতো বেশ কিছু ছোট ছোট দোকান। তেল নুন ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে।

লণ্ডন শহরের এ পেটিকোট লেনটি যে সব কারণে বিশিষ্ট, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এখানকার জীবন্ত হাঁস মুরগী। যারা জীবন ভ'রে তাজা জীব জানোয়ারের টাটকা গোশ্‌ত খেয়ে অভ্যস্ত, বেশ কিছুদিন লণ্ডনে থেকে বাসি, আধশুকনো ও আধপচা গোশ্‌ত খেয়ে তাদের মন যখন বিষিয়ে ওঠে আর গা বমি বমি করে, তখন চোখের সামনে পেটিকোট লেনের তাজা এবং মোটা এ হাঁস মুরগীগুলো দেখে তাদের মন যে প্রফুল্ল হয়, তা বেশ আঁচ করা যায়।

খাঁচায় বদ্ধ মোটা মোটা মুরগী ও টার্কি দেখে আমরা এক ইহুদীর দোকানে ঢুকে পড়লাম। দরদস্তুর ক'রে আঠারো শিলিঙে সের তিনেক ওজনের একটি মুরগী নিলাম। দোকানদার তার ককনি ইংরেজীতে আমাদের জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ ধর্ম অনুসারে এটা হালাল করে নিতে চাও ? খ্রীষ্ট, ইহুদী, না ইসলাম ?'

ডা. মল্লিক (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ চট্টগ্রাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলার) বললেন, 'ইসলাম ধর্ম মতেই আমরা ওটাকে জবাই করে নিতে চাই। কিন্তু সে জন্য তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, আমরাই পারবো।'

বন্ধুরা মুরগীটা জবাইয়ের ভার দিলেন আমার ওপর। বিলেতে বসে মুরগী হালালের কথা কোনোদিন চিন্তাও করিনি। কিন্তু ভার যখন পড়লোই, তখন আমতা আমতা না করে বীরপুরুষের মতো বিস্‌মিল্লাহে আল্লাহু আকবর ব'লে মুরগীটির গলায় ছুরি চালিয়ে দিলাম। বাকী কাজটা করলো ইহুদী দোকানদার। কেটে কুটে ঠিক ক'রে দিলো। ওটা নিয়ে আমরা দ্রুত রওয়ানা হয়ে গেলাম।

আটাশ

লণ্ডনের হাইড পার্ক নানা কারণে দুনিয়া বিখ্যাত। বাক্ চর্চা আর বাক্ স্বাধীনতার চূড়ান্ত নিদর্শন, দুনিয়াতে যদি কোথাও থাকে, তবে তা এখানেই। কোন্ রসিক যে এ পার্কের কতকগুলো জায়গাকে 'ম্যাড্‌ম্যান্‌স্ কর্ণার' বলে অভিহিত করেছে, তা জানিনে। তবে এ পার্কের নানা ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে ছোট বড়ো মাঝারি, ভালো মন্দ সব রকম লোকের বক্তৃতার বহর দেখে মনে হয় এ বিশেষণ এ পার্কটির জন্যে অতিভাষণ নয়, এর ন্যায্য পাওনা।

আবহাওয়া ভালো থাকলে সারা বছর ধ'রে বিকেল হ'তে না হ'তে এ পার্কটির বিশেষ বিশেষ কোণগুলো সব বয়সের আর সব দেশের নরনারীতে ছেয়ে যায়। কেউ আসে তার শোভা দেখতে। কেউ আসে ভিড় ঠেলতে। কেউ আসে বক্তৃতা শুনতে। কেউ আসে মন জুড়াতে। আর কেউবা কৌতুক করতে। ম্যাড্‌ম্যান্‌স্ কর্ণারগুলো দল উপদলের বক্তৃতার জন্যে বিশেষভাবে খ্যাত। আপন আপন বক্তৃতা মঞ্চ নিয়ে এসে বক্তারা নিজের দলের মুখপাত্র হিসেবে বক্তৃতা শুরু করতে না করতেই শ্রোতারা তাদের চার পাশ ঘিরে ভিড় জমায়। কেউ বক্তৃতা করছে রাজনীতি সম্পর্কে, কেউ সমাজ সংস্কার সম্পর্কে। কেউবা ধর্ম আর কেউবা অন্যকিছু সম্পর্কে। যে সব বিষয়ে বক্তৃতা করে সাধারণ লোকের মন জয় করা যায় আর তাদের জ্ঞান বাড়ানো যায় হাইড পার্কে সাধারণতঃ সে ধরনের জনপ্রিয় বিষয়ের ওপরেই বেশী বক্তৃতা হয় ; বক্তার বিষয়বস্তু মুখরোচক হ'লে এবং বলবার ভঙ্গী ভালো হ'লে সেখানে শ্রোতারও ভিড় জমে বেশী। রাজবংশ এবং বিশেষ ক'রে রাজরাণী ছাড়া প্রধান মন্ত্রী থেকে শুরু ক'রে সাধারণ পদাতিক পর্যন্ত যে কাউকে গালাগালি করার যদি কারুর প্রয়োজন থাকে, তবে হাইড পার্কের এ জায়গাই তার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ ও প্রশস্ত। এক বক্তা একদিন ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র নীতি এবং মন্ত্রিসভাকে গালিগালাজ ক'রে খুব জোর গলায় বক্তৃতা করছে। তার অভিযোগ ইংলণ্ডকে এরা আমেরিকার 'ফর্টিনাইনথ ষ্টেইট' করে তুললো।

সে যা হোক, বক্তা এবং শ্রোতা যখন উভয়েই উভয়ের অপরিচিত হয় তখন শ্রোতার চেয়ে বক্তার লাভ হয় বেশী। তার কোন দায়িত্ব থাকে না। মন্দ, কি ভুলচুকভরা যেমনই হোক না কেন গলাবাজি করে বক্তৃতা দিয়ে বক্তা আত্মপ্রসাদ পেতে পারে এবং বক্তৃতা দেওয়ার শিক্ষানবিসিও সে করতে পারে। এমনি করে এই হাইড পার্ক থেকে বহু খ্যাতনামা বক্তার উদ্ভব হয়েছে। শোনা যায় ভারতের কৃষ্ণ মেননও ছাত্রজীবনে হাইড পার্কের ম্যাড্‌ম্যান্‌স কর্ণারে এককালে বক্তৃতা ক'রে হাত পাকিয়েছিলেন।

ঊনত্রিশ

১৯৫২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী স্যানড্রিংহাম ক্যাসলে সকাল সাড়ে সাতটায় রাজা ষষ্ঠ জর্জ মারা যান। পৌনে এগারোটায় তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা হয়। রাজকন্যা এলিজাবেথ তাঁর স্বামী ডিউক অব এডিনবরার সঙ্গে কেনিয়া ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর আর অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড যাওয়া হলো না। সেদিনই বিকেলে জেট বিমানে তিনি দেশে ফিরলেন। পরদিন সকালে পিতৃশোকার্তা নারীকে রাণী হবার মহড়া দিতে হলো। রাজা মরে, কিন্তু নিয়মের এমনি শাসন যে, সিংহাসন শূন্য থাকতে পারে না। ঘোষক বাহিনী ঐতিহাসিক সাজপোশাক প'রে লণ্ডনের অঞ্চলবিশেষ ঘুরে ঘুরে এলিজাবেথের রাণী হবার সংবাদ ঘোষণা ক'রে গেলো। চেয়ারিংক্রসে গিয়ে রাস্তার দুপাশে অগণিত নর-নারীর ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ ঘোষক বাহিনীকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। ইংলণ্ডের ইতিহাসের পাতায় নতুন অধ্যায় সংযোজিত হচ্ছে। দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আমি তা দেখতে পচ্ছি।

একদিন পরে স্যানড্রিংহাম থেকে রাজার মৃতদেহ লণ্ডনে আনা হয়। তারপর তিন দিন ধরে সজ্জিত শবাধারে করে তাঁর মৃতদেহকে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে শুইয়ে রাখা হয়। এটাই Lying in-State Ceremony. তিন দিন তিন রাত ধরে লাখ তিন চার লোক তাঁর শবাধারের পাশ দিয়ে অতি ধীরে ধীরে চলে তাঁকে শেষ সম্মান দেখিয়ে গেলো। তাদের প্রিয় রাজার মৃত্যুতে ইংরেজরা যে ব্যথিত হয়নি তা নয় কিন্তু দেখে শুনে মনে হচ্ছে ব্যথা প্রকাশ না করে তারা যেন শোক উৎসব করছে। এ মধ্যে কতোটা আছে কর্তব্যবোধ আর কতোটাই বা বেদনার প্রকাশ, তা বলা শক্ত। এ শোকোৎসব দেখার জন্য ল্যাম্বেথ ব্রিজের কাছে কিউতে গিয়ে দাঁড়ালাম। দশবারো জন ক'রে চওড়া এক একটা কিউ। একটু পথ অতিক্রম করে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টা চারেক লেগে গেলো। ঘরের ভিতরে ঢুকতেই দেখি ঘরের এক পাশ ঘিরে কমনওয়েলথ, ইংলণ্ডের অধীনস্থ দেশ এবং অন্যান্য মিত্র দেশের পতাকা টাঙানো রয়েছে। ইংরেজরা তো আছেই, তাছাড়া আমার মতো অগণিত বিদেশীও রাজার শবাধারের পাশ দিয়ে সম্মান দেখিয়ে যাচ্ছে। দেখলাম শবাধারের ওপরে রাণীর দেওয়া একটি ফুলের মালাই শোভা পাচ্ছে, আর চারকোণে চারজন সশস্ত্র প্রহরী পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী উইণ্ডসর ক্যাসলে রাজাকে কবর দেওয়া হ'ল। ওয়েষ্টমিনিষ্টার হল থেকে শব যাত্রার শোভা দেখলাম। প্যাডিংটন ষ্টেশনে উইণ্ডসরের পথে শবদেহ ট্রেনে তুলে দেওয়া হলো। ওয়েষ্টমিনিষ্টার হল থেকে প্যাডিংটন ষ্টেশনের এটুকু পথ আসতে শবযাত্রার লাগলো পুরো তিন ঘণ্টা। খ্যাতির দিক থেকে লণ্ডন-পেজেণ্ট্রির দুনিয়াজোড়া নাম আছে। এ কালেও এ প্রাচীন ইংরেজ জাতের সাজসজ্জায় এবং শোভাযাত্রার ঐশ্বর্যের সমারোহ দেখলাম। শবাধারের আগে আগে চলেছে মাইল খানিক লম্বা সৈন্যসামন্তের বাছাই করা নানা শাখাবাহিনী। প্রথমেই গেলো শোকবাদ্য বাজিয়ে ব্যাণ্ডপার্টি। তারপর ঘোড়সওয়ারেরা, তারপর নানাদেশের সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধিদল। এরপরে এলো মাথায় লম্বা টুপি পরিহিত রাজার খাস দেহরক্ষীরা। তারপর আবার ব্যাণ্ডপার্টি, অশ্বারোহী, পদাতিক বাহিনী, এয়ার ফোর্সের লোকেরা, আর সব শেষে নৌবহরের ব্যাণ্ড। এরই পরে রাজকীয় নৌবহরের একটি শাখা একটি গান ক্যারেজে ক'রে রাজার শোভনীয় শবাধার টেনে নিয়ে গেলো। রাজার শবাধারের পরের গাড়ীগুলোতে গেলেন রাণী, রাণীমা, রাজকুমারী মার্গারেট ও রাজার বোন। রাজ মহিলাদের পরে শুরু হলো দেশের ডিউক থেকে শুরু ক'রে দেশ বিদেশের রাজপুরুষদের শোভাযাত্রা।

রাস্তার দু'ধারে অগণিত নরনারী দাঁড়িয়ে রাজার প্রতি তাঁদের শেষ সম্মান জানাচ্ছে। মাইলব্যাপী এ দীর্ঘ শোভাযাত্রাটি ঘিরে বিরাজ করছে ঐশ্বর্যের গম্ভীর ও পবিত্র দীপ্তি। মৃত্যুতেও রাজার মহিমা রয়েছে অক্ষুণ্ন। সমগ্র শব-শোভাযাত্রার পরিবেশ ঘিরেই বিষাদের রাজসিকতা এবং মৌন মহিমা লক্ষণীয়। এ শব-শোভাযাত্রায় দেখলাম ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ঐশ্বর্যের অপরূপ সমন্বয়। আর দেখলাম এর উপযোগী পরিবেশ–মৌন, মধুর, গম্ভীর। ইংরেজদের মতো এমন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অথচ এমন রাজভক্ত জাত একালের পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

তিরিশ

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশ ইংলণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে যে ভাবে মুগ্ধ হলো, তার দৃষ্টান্ত বড়ো বেশী খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের এ আকর্ষণের হেতু ছিল ইংলণ্ডের সাহিত্য ও সাহিত্যিকেরা। শেকস্‌পীয়ার, মিল্টন, শেলী, কীটস্‌, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এ নামগুলো বাঙালী যুবক সম্প্রদায়ের প্রাতঃস্মরণীয় শুধু নয়, নিত্যস্মরণীয় হয়ে উঠেছিল। মধুসূদন মাইকেল হলেন মিল্টনকে ভালোবেসে, খ্রীষ্টধর্মকে ভালোবেসে নয়। যাঁদের সাহিত্য তাঁর চিত্তকে আলোকিত করেছিল এবং মনের কাঠামো গ'ড়ে তুলেছিলো, তাঁদেরই দেশে তীর্থযাত্রা করার জন্যে তিনি উতলা হয়ে ফিরেছিলেন।

যে ইংলণ্ড আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত লোকের কাছে এখনও অপরিচিত এবং এখনও তাদের মনে মোহে জাগায়, আর যে দেশে যেতে না পারার জন্যে বসে বসে তারা দিবাস্বপ্ন দেখে, আর যাবার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে, সে ইংলণ্ড হচ্ছে তার

সাহিত্যিকদের নিয়ে সাহিত্যজগৎকে ঘিরে। ইংলণ্ডের অপরিবর্তনীয় মর্মবাণী আবহমান কাল ধরে এরাই জগৎ সভায় বিতরণ করে গেলেন। একদিন ইংলণ্ডের সবই যদি চলে যায়, সেদিনও দেখা যাবে এ অমর শব্দশিল্পী ও কথাকুশলীরা এ মর জগতে মানুষের গভীর অনুভূতি ও সাধনালব্ধ অমৃতময় বাণীর অপূর্ব সম্পদ নিয়ে তেমনিই দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

কেউ তাঁদের খোঁজ করুন বা না করুন, এ মনীষীরা এমনিতেই অমর। তবুও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ইংরেজরা এদের মর্ত্য জীবনের দিনগুলোকে নানাভাবে স্মরণীয় করে রাখবার ব্যবস্থা করেছে।

সত্য ও সুন্দরের পূজারী কবি কীটস্ বাস করতেন প্রকৃতির লীলা-নিকেতন হ্যামষ্টেড হীথে। যে বাড়ীতে তিনি বাস করতেন, সেখানে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর নিজের আসবাবপত্র, বই পুস্তক তেমনি আছে আজও সুরক্ষিত। ফ্যানী ব্রাউন নামক একটি মেয়ের তিনি প্রেমে পড়েছিলেন। কবি আর তাঁর প্রেমিকা ফ্যানীর দু'গুচ্ছ চুল সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। কীটস্ও নেই, ফ্যানীও নেই, কিন্তু যে অলকগুচ্ছ মর্ত্য-জীবনে কবি কীট্সের চোখে মুখে পড়ে তার চিত্তকে মোহিত করেছিল, প্রেরণা জাগিয়েছিল তাঁর সৃষ্টির, আশা ও আনন্দে তাঁকে করে তুলেছিল বিহ্বল। ইংরেজ জাত কবিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় এ চুলের অধিকারিণীর কথাও ভুলতে পারেনি। এসব দেখে শুনে মনে হচ্ছে মানুষ মানুষই, যুগে যুগে আর দেশে দেশে তার অনুভূতি আর উপলব্ধির পথ এক বই দুই নয়।

রাসেল স্কোয়ার টিউব ষ্টেশনের কাছেই ঊনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের বাড়ী। একটা চুলও এখান থেকে আজও সরানো হয়নি। ডিকেন্স যে চেয়ারটিতে বসে লিখতেন, এতোদিন পরেও সেটা তাঁর সময়ে যেমন ছিল আজও আছে তেমনি। তাঁর পছন্দসই জিনিসপত্র, ছবি, বই পুস্তক যেখানে যেমন করে রেখে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি আছে এবং তেমনিভাবে রাখার জন্যে লোকও রয়েছে। একটা ঘরে ঢুকলাম। দেওয়ালে নানা রকম ছবি আর ড্রইং ঝুলানো রয়েছে। একটিতে দেখছি ডিকেন্স নিজে একটি আরাম কেদারায় তন্ময় হয়ে বসে আছেন আর তাঁর উপন্যাস সৃষ্ট চরিত্রগুলো তাঁর মাথা থেকে বেরিয়ে তাঁরই সামনে যেন কিল্‌বিল্ ক'রে বেড়াচ্ছে।

নটিংহাম শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে হটিংহাম সায়ারের নিউষ্টেড এ্যাবিতে কবি বাইরণের বাড়ী। নিউষ্টেড এ্যাবির চারিদিক ঘেরা। প্রবেশ পথ থেকে এ্যাবির দূরত্ব আধ মাই।। পাশাপাশি মোটর আর পায়ে চলার পথ। গেট দিয়ে ঢুকে এ পথ ধ'রে এগিয়ে যেতে লাগলে এখানকার রোমান্টিক পরিবেশে মন আবিষ্ট হয়। এ্যাবিটির এক পাশে ইংলিশ ফ্যাসানে আর পেছনে ক্ল্যাসিকাল প্যাটার্নের বাগান। বাইরণকে ঘিরে বহু মুখরোচক গল্প গড়ে উঠেছে। এ বাগান দুটোতে বিচরণ করলে মনে হয় কবির স্মৃতির প্রতি তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা যোগ্য সম্মানই দেখিয়ে ছিলেন। ক্ল্যাসিকাল ঢংয়ের বাগানটিতে ঢুকলে মনে হয় যেন এখানকার আবেশমাখানো পরিবেশ আবেগপ্রিয় মানুষদেরকে হাতছানি দিচ্ছে। এ বাগানটির মধ্যে বাইরণের প্রিয় কুকুর বোসয়েন (Boatswain) এর কবর রয়েছে। কবরের ওপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ, তাতে খোদিত রয়েছে কুকুরটির নাম। বাইরণ যে ঘরে থাকতেন, সেটি পরিণত হয়েছে জাতীয় পরিদর্শনাগারে। তাঁর পড়ার টেবিল, বসবার চেয়ার রয়েছে যথাস্থানেই। এখানে তাঁর কোনো কোনো বই-এর পাণ্ডুলিপি আছে, আর

এখনও সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে তাঁর ব্যবহৃত কিছু কাপড়-চোপড়। রুচিবান এবং সুদর্শন পুরুষ হিসেবে বাইরণের যে খাতি ছিল, এ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার শেকস্‌পীয়ারের বাসাবাড়ী ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড অন এ্যাভনে। লণ্ডন থেকে মাইল সত্তর দূরে অরিকশায়ার কাউন্টিতে এ শহরটি। ইংলণ্ডের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ইডেনের বাড়ী এ কাউন্টিতে। এ্যাভন শহর শুদ্ধ সমগ্র কাউন্টিটাই অত্যন্ত সুন্দর। অদ্বিতীয় মানব-চরিত্র শিল্পী শেকস্‌পীয়ারের বসতি-স্থান ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড অন্ এ্যাভন আজ জগতের তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ। তাঁর স্বদেশীরা তো বটেই, বিদেশীরাও একবার শেকস্‌পীয়ারের আবাসস্থানে আসতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করে। শেকস্‌পীয়ারকে কেন্দ্র ক'রে এ্যাভন নদীর ওপরেই 'শেক্‌সপীয়ার মেমোরিয়াল থিয়েটার' গ'ড়ে তোলা হয়েছে। লণ্ডনের ওল্ডভিকের মতো এ রঙ্গমঞ্চে শেক্‌সপীয়ারেরই নাটক অভিনয় করা হয়। তাঁর ও তাঁর নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে শেক্‌সপীয়ারীআনা নামক এক বিরাট সাহিত্যজগতেই গড়ে উঠেছে। ইংরেজজাত যে ফুলভক্ত, তার একটা পরিচয় পাই এখানে এসে। শেক্‌সপীয়ার তাঁর সমগ্র নাট্যসাহিত্যে যত রকম ফুলের উল্লেখ করেছেন, এখানে সে সব ফুলের বাগান ক'রে রাখা হয়েছে।

বৃটিশ মিউজিয়ামে শেলী, কীট্‌স, বাইরণ, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ প্রায় সকলেরই হাতের লেখার নিদর্শন আছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, হাতের লেখায় মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। একথা যে অনেকাংশে সত্য, তার আর একটা দৃষ্টান্ত দেখলাম কবি শেলীর একটি বই-এর পাণ্ডুলিপিতে। চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে শেলী দিলেন বিপ্লবী। চিত্তে অস্থির। তাঁর অস্থিরমতিত্বের ছাপ পড়েছে হাতের লেখায়। দ্রুত হিজিবিজি কি যেন টেনে গেছেন। মিল্টনের হস্তাক্ষর দেখলাম স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ। তাতে দৃঢ়চেতা মিল্টনের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন যেন ধরা পড়েছে।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবিতে আছে একটি 'পোয়েট্‌স কর্ণার।' কবিদের অনন্ত বিশ্রামের জায়গা। সত্য, সুন্দর ও শান্তির পূজারী কবিদের জন্যে অপরূপ এ পরিবেশটি। মনে হচ্ছে অনন্ত শান্ত সভায় সকলে একত্র মিলিত হয়ে যেন এক মনোরম মধুচক্র রচনা করেছেন।

১৯৫০ সালের দোসরা নভেম্বর তাঁর আয়োট্‌সেন্ট লরেন্সের গ্রামের বাড়ীতে বার্ণার্ড শ মারা যান। মাস তিনেক পরে তাঁর বাড়ীটি জাতীয় পরিদর্শনাগারে পরিণত হয়। ৩১ মার্চ আমরা আয়োট্‌সেন্ট লরেন্স গিয়েছিলাম এই মনীষীর বাসগৃহ দেখতে। তাঁর সেক্রেটারী মিস প্যাচ আমাদের গাইডের কাজ করলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যুবতী বয়েসে তিনি শ'র সেক্রেটারী হয়ে আসেন। তারপর থেকে বছর তিরিশ কেটে গেছে। বার্ধক্যের চিহ্ন তার চোখে মুখে। শ'র মৃত্যুর পরেও তাঁকে তাঁর সেক্রেটারীর কাজ ক'রে যেতে হচ্ছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি আমাদের সব দেখাচ্ছেন। শ'র কথা বলতে বলতে গলা তাঁর ধ'রে আসছে, চোখ সজল হয়ে উঠছে।

শ'র পড়বার কামরাটি সুন্দরভাবে সাজানো। টেবিলে টাইপরাইটার চিঠি লেখার সাজসরঞ্জাম, দোয়াত কলম সব যেন শ'র হাতের স্পর্শ পাবার আশায় আছে। একটা খামে ষ্ট্যাম্প লাগানো হয়েছে শুধু পাঠানো হয়নি। কেম্‌ব্রিজ এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার সেট সবে আনিয়েছিলেন। মৃত্যুর দিন পনর আগে ওগুলো ষ্টাডিতে এসেছে। উনি ব্যবহার করতে পারেন নি।

তাঁর রিসেপসান রুমেও সুন্দরভাবে বই সাজানো আছে। শেক্‌সপীয়ারের গ্রন্থাবলী রয়েছে এ ঘরটিতে। আর রয়েছে তাঁর স্ত্রীর ছবি এবং নোবেল প্রাইজের সার্টিফিকেট। তাঁর এক বন্ধু তাঁকে একটা চাইনিজ গাউন দিয়েছিলেন—গাঢ় নীল সিল্কের গাউনটি। সেটিও আছে এখানে। এ ঘরেই তিনি সিনেমা থিয়েটারে কন্‌ট্রাক্ট সই করতেন। এইখানেই বড়ো বড়ো অভিনেতা অভিনেত্রীদের শুভাগমন হতো আর নাটকের কিছু কিছু মহড়াও দিতেন।

ডাইনিং রুমটিও সুন্দর সাজানো। বেডরুম ছিল দোতলায়। মৃত্যুর ক'দিন পূর্বে এতো কাতর হয়ে পড়েন যে, আর দোতলায় উঠে যেতে পারেন নি। সাময়িক ভাবে তাঁর ডাইনিং রুমটিকে বেডরুমে পরিণত করা হয়। এখানে ম্যান্টেলপিসের ওপরে গান্ধীর, আইনষ্টাইনের আর ষ্ট্যালিনের ছবি রয়েছে।

ছবিতে ফুটে ওঠার মতো চেহারা ছিল শ'র। তিনি নিজেও ছিলেন ভালো ফটোগ্রাফার। তাঁর ষ্টাডিতে চার চারটি ভালো ক্যামেরা রয়েছে। শ'র বাড়ীটা মনে হয় যেন একটি টিলার ওপরে। সব উঁচুতে মূল ঘরগুলো। সামনে ফুলের বাগান আর বাড়ীর পেছনে একটি ছোট খোলা সবুজ মাঠ। ঢালু হয়ে তার নীচে নেমে গেছে পাইন জাতীয় গাছের সারি। সেই ঢালু জায়গায় খানিকটা সমান করে তাতেই একটা ছোট ঘর তৈরী করা হয়েছে। সেখানেও শোবার খাট, পড়াশোনা করার মত টেবিল চেয়ার, লেখার সাজসরঞ্জাম, টেলিফোন ও আগুনের ব্যবস্থা। শান্তি নিকেতনের ছায়াঘন আম্রকুঞ্জের মতো জায়গাটি বড়ো নিরিবিলি। দিনের বেলায় অধিকাংশ সময়েই শ' এখানে থাকতেন। এ ঘরটিতে নামবার জন্যে ঢালু পথে পা বাড়িয়েছিলেন। ঝিপ ঝিপ বৃষ্টিতে পা পিছলে পড়ে যান তিনি। পেছনে ছিল ক্যামেরা ঝুলানো। তাতে ঠেস লেগে তাঁর পেছনের হাড় ভেঙ্গে যায়। তাতেই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হলো।

নীরবতাপ্রিয়, নিরামিষাশী, জড়বাদী সভ্যতার নির্ভীক সমালোচক ও আত্মাভিমানী মানুষটি নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জগৎকে সমালোচনা করতেন। সেজন্যই বোধ হয় জনবহুল লণ্ডন নগরী এবং কৃত্রিম সভ্যতার আবেষ্টনী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে শান্ত নীরব পল্লীতে এসে বাসা বেঁধেছিলেন। ইংলণ্ডের গ্রাম বলেই আয়োটসেন্ট লরেন্সও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। শহরের সুখ-সুবিধা অন্যান্য গ্রামের মতো এখানে পাওয়া যায়, নইলে আমাদের দেশের পাড়াগাঁয়ের চেয়ে বেশী কিছু নয় এ জায়গাটি। তবু শ' এ জায়গাটিকে ভালোবেসেছিলেন। এর উঁচু নীচু উদার মাঠ, আঁকাবাকা পথ, ছায়াঘেরা পল্লীকুঞ্জ, মধ্যযুগীয় সভ্যতার নিদর্শন, ভাঙাচোরা সরাইখানা, বর্তমান যুগের কৃত্রিমতার আওতার বাইরে এর নীরব নিথর রূপ—সব মিলে শ'র মনে মোহ জাগিয়েছিল।

শ'র বাড়ীর অনতিদূরে আমাদের দেশের নওয়াব নাজিরদের গোরস্থানের মতো এ অঞ্চলের বড়লোকদের একটা গোরস্থান দেখলাম। পাশেই মধ্যযুগের ভাঙাচোরা ঘরবাড়ী। সেকালের সভ্যতার নিদর্শন। এ সবই স্কটের লে অব দি লাষ্ট মিনিষ্ট্রেল এর উপকরণ হবার যোগ্য। বহু চারণ কবি হয়তো এগুলোর স্মৃতি গানে গানে মুখরিত ক'রে তুলেছেন। পাশেই একটা আধো-ভাঙা বাড়ী দেখলাম অনেকটা গ্রামের হোটেলের মতো। শীত আর ক্ষুধায় কাতর হয়ে এ বাড়ীতে ঢুকতেই গৃহস্বামী বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। অত্যন্ত দরিদ্র এ পরিবারটি। শীতের কাপড়-চোপড়ও এদের তেমন নেই। ছেঁড়া কাপড়-চোপড় গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করছে। আগুন জ্বালানোর চুল্লী সেও

মধ্যযুগীয়। আমাদেরকে শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে দেখে কিছু কাঠ আর কয়লা টেনে দয়াময়ী গৃহকর্ত্রী চুল্লীতে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরে বছর চৌদ্দ বয়সের একটি কচি মেয়ে চা নিয়ে এসে আমাদের পরিবেশন করলো। মেয়েটিকে দেখে মনে হলো ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'বেচারী' সুসান যেন এ জন্মে এ ঘরে এসে ঠাঁই নিয়েছে। কি ভাসা ভাসা চোখ আর স্নিগ্ধ মধুর সরল দৃষ্টি। তার মুখ থেকে কথা ফুটি ফুটি করেও যেন সলজ্জ কুণ্ঠায় ফুটতে চাইছে না। কি জানি যদি তাদের দারিদ্র্য আর গ্রাম্যতা ধরা প'ড়ে যায়। তার মুখের ঝরে-পড়া কথার চেয়ে গুমরে-মরা না-বলতে-পারা বাণীটুকু চোখে মুখে অপরূপ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। সে যেন স্বর্গীয় পবিত্রতার একটি জীবন্ত প্রতিরূপ। এ গ্রামের এ নির্দোষ সরলতাই কি শ'র জীবনে তাঁর মনে রং ধরিয়েছিল, তাঁর মন ভুলিয়েছিল।

একত্রিশ

বিলেতের মাটিতে যে দিন পা দিলাম, সেদিন সামনের দিকে চেয়ে আতঙ্কে অস্থির হয়েছিলাম। এ আতঙ্কের সবটুকুই ছিলো প্রিয়জনের বিচ্ছেদজনিত। তাই সামনের দিকে চেয়ে চেয়ে যখন ভাবতাম, দু'বছর অচেনা অজানা প্রবাসে কি করে কাটাবো, তখন মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠতাম। অথৈ পানিতে ডুববার সময় মানুষ যেমন আকুপাঁকু করে, আমারও তখন ঠিক তেমন অবস্থা। কিন্তু সময় বসে থাকে না। এক এক করে দিন কেটে যায় আর বিদায় মুহূর্তও একদিন ঘনিয়ে আসে। তখন পেছনের দিকে ফিরে চাইলে কি ক'রে এতটা সময় কেটে গেলো সেটাই আশ্চর্য মনে হয়। চোখের সামনে অতীতের দিনগুলি ভেসে ওঠে, আর কি পেয়েছি কি পাইনি, মনের আনাচ কানাচ ঘিরে তার একটা খসড়া তৈরী হ'তে থাকে। ভবিষ্যতের দুর্জ্ঞেয়তা মনের ওপর ভার হয়ে দাঁড়ায় না ; এক সময়ের ভবিষ্যৎ অতীতের রূপ ধ'রে তার সমূহ সার্থকতা আর ব্যর্থতার ডালা সাজিয়ে মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। তখন পিছনে ফিরে তাকালে শুধুই মনে হয় এতো সেদিনের কথা। মাঝখানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অথবা বছরের পর বছর কাটেনি, কালস্রোতে ভেসে গেছে শুধু ক'টি অমূল্য মুহূর্ত।

আগামীকাল ১৯৫৩ সনের ১৯শে জানুয়ারী। এ দেশ ছেড়ে যাবো। মনে পড়ে দেশের কথা। কচি ছেলে মেয়েদের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে। অদ্ভুত মানুষের জীবন। এক পায় তো আর চায়, যা পায় তা চায় না। এর জন্যেই বোধ হয় বাংলার কবি এত সুন্দর করে বলেছিলেন—

যারে বাঁধি ধ'রে তার মাঝে আর
রাগিণী খুঁজিয়া পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

আমার ত্রিশ বছরের জীবনের পেছনে ফিরে চাইতে আজ যেন স্বতঃই ইচ্ছে করছে। একটি বছর বর্তমান থেকে অতীতে গেলো মিলিয়ে, রেখে দিয়ে গেলো জীবনের পাতায় তার স্বর্ণস্বাক্ষর। ভুলিতে চাইলেও তা ভোলা যায় না। জীবনের কতো বড়ো আকর্ষণ ফিকে

হয়ে গেছে। কতো ছোট শূন্য মুহূর্তগুলো সূক্ষ্ম স্বপ্নের জাল বুনে দিয়ে গেছে চোখের সামনে। দূর বিস্তৃত পেছনের ফেলে আসা দিনগুলোর প্রতি চোখ মেলে যতোই চাইছি, ততোই এ জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-ব্যথায় মন আমার অভিভূত হয়ে পড়ছে। সবটা মিলিয়ে কি সুন্দর লাগছে পেছনে ফিরে যেতে। সুন্দর বলেই বিস্ময়ের অন্ত পাচ্ছিনে।

ছোটবেলা থেকে বিলেতের গল্প শুনতাম। মাটিও নাকি সোনা দিয়ে মোড়া ছিল এখানকার। ইংলণ্ড প্রায় দুই শতাব্দী আমাদের শাসন করলো। তার সম্বন্ধে আমাদের ছেলেমেয়েরা কচি বয়সে যা শোনে, তারও চেয়ে বেশী তার চারপাশে রঙীন করে স্বপ্ন কল্পনা মাখিয়ে তাকে রাঙা ক'রে তোলে। তাই ইংলণ্ড আর ইংরেজ জাত—এক কথায় বিলেত আমাদের মনের চারপাশ ঘিরে এমন একটা মায়াজাল রচনা করে যে, তাতেই আমাদের অনেকেরই বিলেতের সঙ্গে হয় অলক্ষে প্রণয়। এর উপর মোহ ছড়ায় আমাদের দেশ থেকে এর হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান। সুদূরের আকর্ষণ কল্পনাপ্রবণ মানুষের কাছে কম নয়। দূরের মোহ তাই আমাদেরকে কম অশান্ত করেনি।

আমাদের দেশের কবিই ত গেয়েছেন—

"ওগো সুদূর বিপুল সুদূর—তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—

তাই দূরের দেশকে ঘিরে আমাদের মনের আনাচে কানাচে কতো অসম্ভব কথা, কতো আজগুবি কল্পনা যে রাজত্ব করেছে, কেই বা তার ইয়ত্তা করে।

এমনি করেই শিশু বয়সে বিলেতের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। তারপর কেমন ক'রে জানিনা সাহিত্যের ছাত্র হলাম। রবীন্দ্রনাথ যোগালেন কল্পনা। শেলীর কাছ থেকে পেলাম জীবনস্বপ্ন। কীটস্ যোগালেন সৌন্দর্য-পিপাসা। মাইকেল আনলেন শান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে অশান্ত চঞ্চলতা। জীবনকে দেখতে শিখলাম রয়ে সয়ে নয় শুধু ছেড়ে যাবার ফেলে যাবার তাগিদে। নইলে আমার মতো বিত্তহীন মানুষের প্রিয় পরিজন ও কচি ছেলেমেয়ে ফেলে সাত সাগরের দেশ বিলেতে আসা যে সুবিবেচনার হয়নি, তা আমি নিজেও বুঝি। কিন্তু হঠাৎ একদিন ভাগ্য যেন সুপ্রসন্ন হয়ে উঠেলো। সুযোগ এলো স্বপনপুরীর রাজকন্যার ঘোমটা খোলবার। সংশয় ছিল অনিশ্চয়তাও ছিল। তবু তার মধ্যেই মনে মনে তৈরী হয়ে উঠলাম। বিলেতে আসবো ব'লে জাগ্রত চেতনায় কতোদিন কতো কল্পনার জাল বুনেছি। সুরের খেই কখনও হারিয়ে গেছে, কখনও বা আবার ফিরে এসেছে। কতো রৌদ্রদীপ্ত দিনে, কতো বর্ষণ-মুখর শ্রাবণে, কতো বাসন্তী চাঁদিমায়, কতো গভীর অমারজনীতে কল্পনার জাল ছিন্ন হয়ে গেছে, আবার কখন অজ্ঞাতে জোড়া লেগেছে। সকল আয়োজন শেষ ক'রে অবশেষে সেই সাগরপারের বিলেতের পথে বেরোবার সময় আমারই জীবনে একদিন ঘনিয়ে এলো। গৃহিণীর কাছ থেকে, কচি কচি বাচ্চাদের কাছ থেকে বিদায়ের লগ্ন ঘন দুর্যোগের ভিতর দিয়ে নামলো।

তারপর ?

বিলেতের পথে বিমান উড়লো আকাশে। দেশের ছবি ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসতে লাগলো। পেছনে পড়ে রইলো আমার কর্মক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় আর কর্মমুখর ঢাকা নগরী। সবার উপর আমাদের সোনার শ্যামল পূর্ব-বাংলা। আমার দেশ আমাকে হাতছানি দিচ্ছে।

তবু মা এবং মাতৃভূমির স্নেহের ডোর ছিঁড়লাম। পেছনে ফেলে এলাম এতো বছরের জীবনে নিবিড় করে পাওয়া এতোগুলো মুহূর্তকে। কে বলবে আমার অতীত ও তখনকার মুহূর্তগুলো এক সুরে গাঁথা ছিলো? আমারই জীবনের সকল মাধুরী আহরণ ক'রে একে একে যে দিনগুলো আমারই অতীতকে সমৃদ্ধ করলো, তারা তখন আর আমার ছিল কি ?

আর আজ ?

সুখে-দুঃখে প্রবাসের এ দিনগুলো কেমন করে যে এখানে কেটে গেলো তাই ভাবছি। প্রথম প্রথম মনে হতো কোনো রকমে যদি পালাতে পারতাম। আমাদের দলের অনেকেই দেশে স্ত্রী-পুত্র ফেলে এসেছিলেন। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে ? যার সঙ্গে দেখা হতো তারই মুখ দেখতাম ইংলণ্ডের আকাশের চেয়েও গম্ভীর আর বিষণ্ণ। দলের মধ্যে হাসির কথা যদিই বা কিছু হতো, সবার কাছ থেকে আড়াল হয়ে গেলে সব হাসি আর সুখস্মৃতি বেদনার রূপ ধ'রে বুকের উপরে পাষাণের মতো চেপে বসতো। সুখের সময় দেশী বন্ধুদের সঙ্গ কম ভালো লাগতো না। দুঃখের সময় তাদের কাম্য হলেও সকলে এক জায়গায় জুটলে তিল তিল ক'রে সকলের বেদনা যেন জগদ্দল পাথরের মতো ভার হয়ে উঠতো। এখানে এসে প্রথমে যে বাড়ীতে উঠেছিলাম, সেখানে আমার রুমে থাকতেন আমারই এক স্বদেশী এবং সহকর্মী বন্ধু (মিঃ স—বর্তমানে তিনি করাচীতে পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী)। সবে বিয়ে ক'রে বৌয়ের গায়ের হলুদ বাসি না হতেই প্রবাসের পথে পা বাড়িয়েছিলেন তিনি। তাঁর হৃদয়ের ক্ষত ছিল টাট্‌কা। বেদনা ছিল গাঢ়। আশা, হতাশা, আনন্দ ও উদ্বেগ মিলে মিশে তাঁর চোখের সামনে কি যেন এক মায়ার জগৎ রচিত হয়েছিল; তাঁকে দেখে মনে হতো বিরহী যক্ষের কথা। চাতক পাখীর মতন তিনি ডাকের দিকে চেয়ে থাকতেন। তাঁর সদ্য-পরিণীতা বিরহ-বিধূরা স্ত্রীর কাছ থেকে দশ-পনের পৃষ্ঠার চিঠি আসতো তাঁর কাছে। তাঁকে দেখতাম অন্তহীন পিপাসা নিয়ে তাঁর নববধূর পত্র থেকে আকণ্ঠ প্রেমের মাধুরী পান করতে।

দিন যতো এগিয়ে যেতে লাগলো, ধীরে ধীরে বেদনা-বাণ বিদ্ধ দেশী বন্ধুদের আওতা থেকে ততোই দূরে সরে যেতে লাগলাম। জীবন হরণ করা এক শীত কাটিয়ে এখানে প্রকৃতিতে জীবনের জয়গান মুখরিত বসন্তের আবির্ভাব আর লীলা দেখলাম। প্রকৃতির আঁধার দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কুহেলীও ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে গেল। এখানকার মানুষের সঙ্গে মিশলাম। মানুষের মন দিয়েই মানুষকে বুঝবার আর জানবার সুযোগ খুঁজে ফিরতে লাগলাম।

আমি থাকতাম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে। বহুদেশ এবং বহু জাতের মানুষই এখানে বাস করতো। তাদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়ে তাদের মন এবং প্রকৃতি বুঝবার অবকাশ পেলাম। এ হোস্টেলটিই আমার কাছে ছিল মিনিয়েচার লণ্ডন—লণ্ডনের এ কেন্দ্র-বিন্দুটিতে মানব-মহাসিন্ধুকে জানবার সুযোগ পেলাম।

লণ্ডন বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো শহর আর সবচেয়ে জনবহুল। অধিকারের দিক থেকে এ শহর ইংরেজদেরই, কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে এটি দুনিয়ার নার্ভ সেণ্টার ব'লে দুনিয়াতে এমন আন্তর্জাতিক শহর খুব কমই পাওয়া যায়। এখানে মানব-মহাসমুদ্রের মহাসঙ্গম সাধিত হয়েছে। হেন দেশ নেই যেখানকার মানুষ এ শহরে দেখা যায় না। বিশ্বের প্রাণধারা শত ভঙ্গিমায় এ শহরে প্রবাহিত হয়ে গেছে। ধর্ম বর্ণ জাতি তার আশ্চর্য জটিলতা এবং

বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মানুষ যে মানুষই তা দেখবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য হলো এখানেই। পুরুষ এবং স্ত্রী নিয়েই এ মানব মহাজগৎ। সে জগৎ এখানে এসে মিশেছে আশ্চর্য রকমের সহজ স্বাভাবিক ছন্দে। পরস্পরের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই, অনাবশ্যক কোন ব্রীড়া বোধ নেই, সলজ্জ সন্ত্রস্ত ভাব নেই। আমাদের দেশে স্ত্রী-পুরুষের মাঝখানকার সমাজ-বিধান শাসিত অবরোধের কোন দেয়াল নেই। নারী ও পুরুষ–মানব জগতের এই দুই শাখা এখানে মুক্ত জীবনানন্দেই যেন বিকশিত হয়েছে।

দুনিয়াতে মানুষের মন বোধ হয় সবচেয়ে দুর্গম ও দুর্জ্ঞেয়। একটি মানুষের মন জানাই কম দুরূহ ব্যাপার নয়। আমরা নিজেরাই বা নিজের মন কতটুকু জানি। সুতরাং বহু লোকের মন জানতে পেরেছি এ অহঙ্কার কেমন ক'রে বা করি। কিন্তু মন জানাতো পরের কথা, মন জানবার আগে মানুষকে দেখবার সৌভাগ্যও তো কম নয়। তাই বা কার কপালে জোটে ? সে জন্যে নিজের ভাগ্যের কথা নিয়ে যখন চিন্তা করি—কোথাকার মানুষ কোথায় এসেছি যখন এ কথা ভাবি, তখন নিজের ভাগ্যকে আর ধিক্কার দেই না। এ জীবনে কি পাইনি তা নিয়ে তর্ক তুলি না। যা পেয়েছি তাকে সৌভাগ্য ব'লে মানি। শত দুঃখ-বেদনার মধ্যেও প্রবাসের এ দু'টি বছরে আমি যে মরজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছি, সেজন্যে গর্ববোধ করি। আমি মিশে গেছি মানুষের মহৎ মেলার মধ্যে। এ মানুষের কতো জাত, বর্ণ ও ধর্মের লোকের সঙ্গে যে মিলেছি, কতো নরনারীর সঙ্গে কতো কথা বলার যে সুযোগ পেয়েছি, কতো ভাবে যে তাদের অন্তরের মহত্ত্বের পরিচয় পেয়েছি, পেয়েছি তাদের মনের উদারতার কতো যে স্পর্শ ! লণ্ডন আমাকে এ সুযোগ দিয়েছে। তাই লণ্ডন ছেড়ে যাবার আগে লণ্ডনের প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালোবাসা জানিয়ে যাই। কৈশোর ও যৌবনের কতো প্রতীক্ষা নিয়েই যে এখানে এসেছিলাম! প্রথম মিলনে আমার ভীরু হিয়া গুরু ত্রাসে দুরু দুরু ক'রে উঠেছিল, কিন্তু দু'বছর সুখ-দুঃখের পরিচয়ের পরে আজ যখন একে ছেড়ে যাবার প্রশ্ন মনকে জিজ্ঞেস করছি, তখন দেখি আমার অজ্ঞাতে মন বলছে–

'এসেছিনু প্রাণ হরিতে মহা পারাবার পারায়ে
ধরিব কি ধরা দিবে সে 'গেনু' আপনারে হারায়ে।'

টেল্‌বেরি পোর্ট থেকে আগামীকাল আমার জাহাজ ছাড়বে। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের আনন্দে মন অধীর হয়ে উঠেছে। সে আনন্দ কি কম ? কিন্তু যখন ভাবি স্বদেশে আমরা কোথায় পড়ে আছি, দেশ আছে অন্ধকারে, দেশের মানুষের মন আছে মধ্যযুগে, ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় মানুষে মানুষে দেশে এতো বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত কারণে এত রেষারেষি, এতো পেছুলাগা আর এতো হানা-হানি, আত্মীয় বন্ধুতে বিচ্ছেদ, ভাইয়ে ভাইয়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তখন দেশে ফেরার কথা মনে করে ভেতরের সমস্ত উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। দেশে পৌছার পর এখানে কি কোন দিন আর আসতে পারবো ? আবার কি জোটাতে পারবো রাহা খরচ ? যদি জীবনে আর এ সুযোগ না আসে, আর কোনোদিন ইউরোপের পথে যদি পা বাড়াতে না পারি, তবে মানুষের এ মহাজীবনের, তার সঙ্গে এ মহামিলনের আর মনের এ মহামুক্তির স্বাদ কোথায় পাবো ?

পরিশিষ্ট

(ক) পত্র পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত অংশ

১. বিলেতের পথে। মাহেনও, শ্রাবণ (১৯৫১)
২. ইংরেজ জীবন ও চরিত্র। দৈনিক মিল্লাত, ১,৮ ও ১৫ জুন (১৯৫২)
৩. পথ চলতে। দৈনিক সংবাদ, ১৪ আগষ্ট (১৯৫৩)
৪. রিজেন্ট পার্কের চিড়িয়াখানায়। দৈনিক সংবাদ, অগ্রহায়ণ (১৯৫৩)
৫. ওকিং মসজিদে। দৈনিক-সংবাদ, নভেম্বর (১৯৫৩)
৬. বিলেতে বড় দিন। দৈনিক আজাদ, ২৬ ডিসেম্বর (১৯৫৩)
৭. বিলেতের শিশু। দৈনিক আজাদ, ১০ জানুয়ারি (১৯৫৪)
৮. শিশুজগৎ ও বিলেত। দৈনিক আজাদ, ২৬ জানুয়ারি (১৯৫৪)
৯. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিলেত। দৈনিক আজাদ, ৩১ জানুয়ারি (১৯৫৪)
১০. ব্যোমযানে বিলেত। স্পন্দন, চৈত্র (১৯৫৪)
১১. বিলেতের শীত। দৈনিক আজাদ, ১১ এপ্রিল (১৯৫৪)
১২. বিলেতের বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল। দৈনিক আজাদ, এপ্রিল-মে (১৯৫৪)
১৩. বিলেত ও বিলেতের মানুষ। দৈনিক আজাদ, মে (১৯৫৪)

(খ) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি অভিমত

১। জামিল চৌধুরী :

'মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত 'বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন'---বইটি গতানুগতিক ভ্রমণ কাহিনী নয়। আবার নিছক রম্য রচনাও নয়। এ বইটির মধ্যে তথ্যাশ্রিত গল্প আর গল্পাশ্রিত তথ্যের যে অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং এই দুয়ের স্বাদ-ব্যঞ্জনায় বিলেত ও বিলেতবাসীর যে যথার্থ রূপ প্রতিফলিত হয়েছে, তা লেখকের কৃতিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্মদর্শী মনোভাবের পরিচায়ক। বিলেতের পরিচয় তিনি রাজরাজড়া, লর্ড বা ব্যারনদের জমকালো জীবন, প্রাসাদ, দুর্গ, মিউজিয়ম বা ঐশ্বর্য থেকে গ্রহণ করেন নি, করেছেন মধ্যবিত্ত জীবনের বঞ্চিত বাসনা থেকে, বৃটিশদের কূটনৈতিক শঠতা ও বঞ্চনা থেকে, তাদের সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক এমন কি পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিভাস থেকে। তাই বিলেত দেশটি এবং তার মানুষ এত অকৃত্রিমভাবে তাঁর চোখে ধরা পড়েছে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়েই তিনি তা পরিবেশন করেছেন তাঁর পাঠকদের কাছে।

'মুহম্মদ আবদুল হাই পণ্ডিত ব্যক্তি এবং একজন প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক। দেশ চেনা ও জানায় তাঁর এই পাণ্ডিত্য ও ধ্বনিজ্ঞানও যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ...সঙ্গীতের ব্যঞ্জনার মত তাঁর এই কাহিনীর ভাষা।'

(সওগাত, মাঘ ১৩৬৫ : ৫৪-৫৫ পৃ.)

২। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী :

'মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের সাম্প্রতিক বই 'বিলেতে সাড়ে সাত শ' দিন' লেখকের বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে লেখা। লেখক বলেছেন বিলেত সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্য ছেলেবেলার। ....একটা আনন্দিত মনের ছাপ এই বইএর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ...সে আনন্দ শুধু যে নতুনের দেখার তা' নয়, তা' বিশেষ করে নতুনের আলোকে পুরাতনকে দেখার। ...নতুন অভিজ্ঞতাকে তিনি প্রধানত প্রাক্তন ও দেশজ অভিজ্ঞতার আলোকেই বিচার করেছেন। ওদেশের গাইফকসের উৎসবের পাশে আমাদের শবে বরাতের পটকা ফোটানো, ওদেশের পুলিশের পাশে আমাদের পুলিশ, ওদেশের শীতের পাশে আমাদের দেশের শীত, ওদেশের সবুজের পাশে আমাদের সবুজ প্রায় সমান্তরাল রেখার মত উপস্থিত রয়েছে। মেয়েদের স্বাস্থ্য, দু'দেশের ছড়া, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে তুলনামূলক আলোচনাও আছে। ...ঐ সমান্তরাল বৃত্তির কারণটা বোঝা কঠিন নয়। আবদুল হাই মূলতঃ শিক্ষাবিদ ও প্রবন্ধকার, আনন্দের মুহূর্তেও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর মনে থাকে। থাকে হয়তো এই জন্যেই যে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধিটা আন্তরিক।

এ-কারণে এই বইয়ে... লেখকের উদ্দেশ্য যতটা না ভ্রমণের কাহিনী বলা, তার চেয়ে বেশী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করা। লেখকের নিজের কৌতূহলের ছাপ এ বইতে আছে, কিন্তু পাঠকের কৌতূহলকে উৎসাহিত করার চাইতে তার বুদ্ধিবৃত্তির কাছে আবেদন করাকেই তিনি সঙ্গত মনে করেছেন। ...আলডাস হাকস্লীর একটি ভ্রমণ কাহিনী Beyond the Maxique Bay.. বইতে তত্ত্বকথার প্রাচুর্য চোখে পড়ছে। কিন্তু

তত্ত্বকথা এখানে প্রবন্ধধর্মী নয়--একান্তই রম্য-রচনাধর্মী। ...তত্ত্বমূলে প্রায় সমান মূল্যবান কথা হাই সাহেবের বইতে আছে।...এবং হাই সাহেবের বইতেও অবশ্যি এমন জায়গা আছে যেখানে প্রবন্ধের গাম্ভীর্য রম্যরচনার মেজাজে পরিণত হয়েছে। ....এই লেখকের আনন্দবোধ সৌন্দর্যের প্রশংসায় সঙ্কুচিত নয়। সাহিত্য প্রীতির সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য-প্রীতিও বইতে লক্ষণীয়। আমার ত' মনে হয় সৌন্দর্যের বর্ণনাতেই তাঁর ভাষা অধিকতর স্ফূর্তি পেয়েছে।

লেখকের ভাষা সুখপাঠ্য।'

(উত্তরণ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬৫: ১৩২–৩৫ পৃ.)

৩। আবদুল গাফফার চৌধুরী :

'সমারসেট মমের অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'Of Human Bondage' সম্পর্কে বলা হয়, 'It's a happy memory, a song, a benediction...' দুটি বইয়েরই চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। তবু মাফি, ভাটনগর, মাদাম মারী, মিস হার্ড ও ভেরিঙ্কহার্ড, বিশর, পিটার ও গে'বনেলের গল্প পড়তে পড়তে 'বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন' এই নামটি ভুলে যেতে হয়। মনে হয়, নেপথ্যে লেখক ও তাঁর লেখা। আসলে এই চরিত্রগুলিই জীবন্ত ও সত্য। কিন্তু সংক্ষিপ্ততম ও অপরিণত আভাসে মনে অতৃপ্তি থেকে যায়। অথচ আর একটু বললেই এদের প্রায় সমাপ্তিটুকু পাঠক অনায়াসে নিজের কল্পনায় উপভোগ করতে পারতো। বিশেষ করে পিটারের গল্পটি।...তবে পাঠকের উপর অবিচার করনে নি লেখক। ভ্রমণ নয়—স্মৃতিকথা, স্মৃতিকথা নয়—ভ্রমণ, এ দুয়ের সংমিশ্রণে এক আশ্চর্য রস সৃষ্টি করেছেন তিনি; তাতে সঙ্গীতের সম্মোহ সৃষ্টি করেছে ভাষা।...

> 'আর তার আশার দানা-রঙীন গানের উপর আঁকা সাঁজেলিজে যেন একটি মিষ্টি তিলক ফোঁটা। শেষে আর্ক দু'ত্রয়ামফ্। আট দিক থেকে আটটি রাস্তা এসে পায়ে কুর্নিশ করছে।

'বিলেতে সাড়ে সাত শ দিনে'র ভাষা আশ্চর্য সঙ্গীতমুখর। অনুভব ও হৃদয় সংবেদনার মদিরতা মাখা তা স্বীকার করতেই হবে।...লেখক মুহম্মদ আবদুল হাই একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ। তিনি পণ্ডিত এবং সব চাইতে উল্লেখযোগ্য—একজন ভাষাবিজ্ঞানীও। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর এই পাণ্ডিত্য, তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান বইয়ের কোথাও সাহিত্যরস বা ভাষার মাধুর্যের পথে অন্তরায় হয় নি..। বরং মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে দু'একটি কথায় যেখানে তিনি পাঠককে তত্ত্ব বা তথ্য দান করেছেন তা বর্ণনার রসে তেতো ঠেকে নি। আশ্চর্য সমমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর। কখনো সাহিত্য-রসিক, কখনো শিল্প-রসিক, কখনো ভাষাতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ, কখনো কবি বা দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি সমগ্র বইটিতে বিচরণ করেছেন; কিন্তু নেপথ্যে সর্বক্ষণ বিরাজ করেছে একটি গভীর সংবেদনশীল স্রষ্টা-মন।

...বইটি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনে হতে পারে, তিনি বিদেশের ভূ-চরিত্র ও জাতীয় জীবন সম্পর্কে বেশী উচ্ছ্বাসপ্রবণ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কঠোর বিচারক-সুলভ মন্তব্য এ ধারণা দূর করে দেয়। আর এ জন্যেই বইটিকে ইংরেজের সামগ্রিক জীবন

সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য বই হিসেবে গ্রহণ করা চলে। ....অর্থাৎ ভালোমন্দ, আলোয়-আঁধারে মিশে যে সত্যিকারের ইংল্যান্ড তারই চিত্র এঁকেছেন তিনি সমস্ত অনুভূতি দিয়ে। ইংরেজদের জাতীয় জীবন সম্পর্কেও এই একই কথা। ভলোটুকু বলেছেন অকৃত্রিম দরদ দিয়ে, মন্দটুকুও তুলে ধরেছেন বিচারকের নিরাসক্তি নিয়ে। ...অহেতুক জাতিবিদ্বেষ তাঁর দৃষ্টির ঐতিহাসিকতাকে আচ্ছন্ন করে নি।

এমনি সব বর্ণনা, বিবরণ, ('বিস্ময়কর') উপমা ও গল্পের মধ্য দিয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই ইংরেজদের সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান এমন কি ব্যক্তিচরিত্র তুলে ধরেছেন। ...বিচিত্র গল্পরসে সমৃদ্ধ সে সব বিবরণ নিয়ে আলোচনা চলে না। তা পাঠকের একান্তভাবে জানা ও উপভোগের বিষয়।..'

(দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ মাঘ ১৩৬৫/২৫ জানুয়ারি ১৯৫৯ ৪ এবং ৩ পৃ.)

৪। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

'ব্যক্তিক প্রবন্ধ পর্যায়ে ভ্রমণ বা প্রবাসের অভিজ্ঞতা রচনা সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যের এক বিশিষ্ট লক্ষণ।...আধুনা প্রকাশিত 'বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন' এ শ্রেণীর রচনায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

...ধ্বনি বিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যয়ন ব্যাপদেশে তিনি (লেখক) ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত লন্ডনে ছিলেন এবং বিভিন্ন অবকাশে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থান ও পারী ভ্রমণ করেন। এই প্রবাস জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্পদেই গ্রন্থটি পরিপূর্ণ। ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক-ছাত্রের তীক্ষ্ণ সচেতন বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি সর্বদাই অভিজ্ঞতাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে নিতে প্ররোচিত করেছে বলে গ্রন্থটি অপূর্ব তথ্য সমৃদ্ধ।

অপরিচিত আবেষ্টনীকে মনের অভ্যাসের সাথে মিলিয়ে নেবার কালে তার শ্রেষ্ঠত্বের দিকেই দৃষ্টি পড়ে প্রথমে। লেখক তাই বিলেতের নগর ও নাগরিকতা, আচার ও আচরণ, কর্মব্যস্ততা ও অবসর, কর্তব্য ও আনন্দ, শিক্ষা ব্যবস্থা, যানবাহন, পত্র পত্রিকা, মিউজিয়াম, জু, আর্ট একজিবিশন ইত্যাদির তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন জাগ্রত কৌতূহলে। খ্রিস্টমাসের উৎসব মুখর পরিবেশের, এমন কি খ্রিস্টমাস-কার্ড প্রেরণের আনন্দের সঙ্গে বহুজনের জীবিকার সম্পর্কও যে জড়িত তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি।

অথচ এই তীক্ষ্ণ বিচারশীল দৃষ্টির সঙ্গে আছে এক আশ্চর্য সংবেদনশীল মন, যার ফলে তথ্যের গুরুভার কখনো যথার্থ ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে না। বরং ছোট ছোট ঘটনার হৃদয়াবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাসের স্নিগ্ধ চড়াই-উৎরাই পাঠকের কৌতূহলকে জাগ্রত করে রাখে। সঙ্গীহারা শ্যামদেহী যুগলের অসহায় তরুণীটির বিবর্ণ-হাসি, সুইজারল্যান্ড থেকে আগতা বোর্ণমাথের মাফির হোমসিকনেস বা নটিংহামের পিটার সত্যিই মনকে ছুঁয়ে যায়।...

গ্রন্থকারের ভাষায় বাহুল্য বর্জিত চিত্তাকর্ষক সুন্দর সুষ্ঠু ও মোহনীয় আবেশ রয়েছে।...'

(দৈনিক মিল্লাত, ১৪ ভাদ্র ১৩৬৫/৩১ আগস্ট ১৯৫৮: ৪ পৃ:)

(গ) বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী' (১৯৯৪)-তে ড. হুমায়ুন আজাদ গ্রথিত 'বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন'-এর 'গ্রন্থপরিচয়' (অংশ বিশেষ)

'প্রথম সংস্করণ ১৯৫৮; নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪৬ বাংলাবাজার. ঢাকা। পৃষ্ঠা ৪+১৭৬; দাম- তিন টাকা। কলেজ সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪; নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১। পৃষ্ঠা ৪+২০৮; মূল্য-৩.০০। উৎসর্গ আমার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের হাতে। কলেজ সংস্করণ ষষ্ঠ মুদ্রণ আগষ্ট ১৯৬৯: হাসিন জাহান, ২ সেক্রেটারিয়্যাট রোড, ঢাকা। পৃ. ৪+২০৮; মূল্য-৩.০০। কলেজ সংস্করণ সপ্তম মুদ্রণ আগস্ট ১৯৭০; হাসিন জাহান, ২ সেক্রেটারিয়্যাট্ রোড, ঢাকা। পৃ. ৪+২০৮; মূল্য- তিনটাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র। উৎসর্গ: আমার পুত্র ও কন্যাদের হাতে। বইটির নাম প্রথম স্থির করেছিলেন 'বিলেতের কথা'। *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* [প্রেস ১৯৫৪] বইয়ের পেছনের মলাটে এ-নামে ঘোষণাও দেয়া হয়েছিলো। বইটি প্রকাশের পর বইটির একটি কর্কশ অশোভন আলোচনা লিখেছিলেন সাইয়িদ আতীকুল্লাহ [সমকাল ১৩৬৫. ২:৩, ১৯৮-২০৩]। তিনি লেখককে তিরষ্কার করেছিলেন নানাভাবে, এবং একুশ অধ্যায়ে বিভিন্ন পত্রিকার প্রচারের যে পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে, তার ভুল ধরেছিলেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও [উত্তরণ ১৩৬৫, ১:২, ১৩২-১৩৫] একটি আলোচনা লিখেছিলেন বইটির, লেখককে কিছুটা প্রশংসা ক'রে সুখী করার জন্যেই অনেকটা; তবে তিনিও কয়েকটি আপত্তি তুলেছিলেন। বইটির নামই তাঁর কাছে মনে হয়েছে আপত্তিকর, যদিও আমরা আপত্তির কোনো কারণ দেখি না। মুহম্মদ আবদুল হাই বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন-এর প্রথম সংস্করণের একটি কপিতে নিজের হাতে বইটিকে নানাভাবে সংশোধন ক'রে লিখেছিলেন 'Corrected copy for future editions...M.A Hai. ৩০/৮/১৯৬০'। পরবর্তী সংস্করণগুলো তাঁর এ সংশোধন অনুসারেই ছাপা হয়, তবে তাঁর সব সংশোধন অনুসরণ করা হয় নি। সম্ভবতঃ ছাপার সময় তিনি নিজের সংশোধন পুরোটা মানেন নি।'